কলকাতার জল

সাউথ পয়েণ্টের কৌশিকের মৃত্যু

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

“দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?”

“কেন রে ছোটন কি করেছে?”

“দেখ না! লক্ষ্মী ছেলের মত খাচ্ছে না।”

“পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।”

“কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না— আর কালকে বেরোবে কি করে?”

“তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও!”

“জানি! রবিনসন্‌স্ বার্লি।”

“ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসন্‌স্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসন্‌স্ বার্লি খেতে বলেন।”

“আচ্ছা দিদা...”

“আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি?”

“বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসন্‌স্ বার্লি।”

রবিনসন্‌স্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

LINTAS:C. ROB 4 24'6 BG

The Radial that's just right

APOLLO

POLYGLAS

POLYGLAS Radial

* For fitment on AMBASSADORS and some models of Citröen, Peugeot, Volkswagen, Porsche and Volvo.

Right for Indian Roads ! Right for Indian Cars !

The Right Radial

* Doubles your mileage.
* Safeguards your suspension.
* Cuts fuel costs.
* Gives you a cushioned ride.
* Designed for safety — no aqua-planing.
* Repeated retreadability.
* Protects against punctures.

সংসারের হাজার কাজ, বাজার-হাট,
ঘরে বাইরে নানান ব্যস্ততা। এদিক ওদিক খুঁটিনাটি
কত কী। এর মধ্যেও সুস্থ,
সতেজ এই ত্বকের সাথী
বোরোলীন।
ঘরে বাইরের সাথী
বোরোলীনের কোমল যত্ন—শুষ্কতা আর
গা-হাত-পা ফাটা, র‍্যাশ বেরোনো বা
রোদে ঝলসানোর থেকে ত্বককে রক্ষা করে।
বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক ক্ষমতা রোজকার
সাধারণ কাটা-ছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
BOROLINE
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM
ত্বকের সুরক্ষার জন্য সত্যিই
কার্যকরী ক্রীম
GD
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল নিউ আলিপুর কলকাতা ৭০০ ০৮৮
HTC-GDP-5193
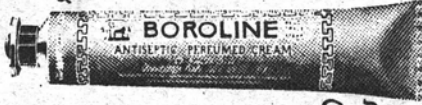
বাংলা ভাষায় সর্বভারতীয় পাক্ষিক
প্রথম বর্ষ একবিংশতি সংখ্যা ২ জুন ১৯৮৪

দেশের বা জাতির কোনো বড় দুর্বিপাকে, প্রবল সংকটকালে আমরা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারি পাক্ষিক কাগজ প্রকাশের সীমাবদ্ধতা। বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গায়, পাঠকের উদ্বেগ এবং অনুসন্ধিৎসার শরীক হয়েও এই পক্ষে আমরা তাঁদের কাছে পৌছে দিতে পারলাম না সরেজমিন, বিস্তৃত কোনো রিপোর্ট। ভারত জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির যোগসাজশে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জীইয়ে রাখা এই উত্তেজনা, বারংবার হিংসার এই বহিঃপ্রকাশের চরিত্র উদঘাটনে আমরা প্রথমাবধি সক্রিয় ছিলাম আমাদের সীমিত সাধ্য নিয়েও। পাঞ্জাবে, হায়দ্রাবাদে, গার্ডেনরীচে। বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রেও এই খামতি আমরা পূরণ করতে চেষ্টা করব আগামী সংখ্যায়—দাঙ্গার পরিকল্পিত পটভূমি এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টে।

উচ্চাশার সোনার হরিণের পেছনে ছুটিয়ে ছুটিয়ে আমরা, অভিভাবকরা সন্তানদের নিয়ে চলেছি কোন্ সর্বনাশের কিনারায়, কিভাবে আমাদেরই প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে একটি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যপাট চালাচ্ছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত সমাজে, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আর একবার সেই মর্মান্তিক সত্য উদঘাটন করল আমাদের সামনে। এই মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শিক্ষার সেই বিশেষ ব্যবস্থার ভূমিকা এবং অভিভাবকদের অবস্থান নিয়ে আমাদের এই পক্ষের অনুসন্ধান।

তাপিত দগ্ধ জ্যৈষ্ঠ দিনে, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ যখন চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় জল যাচ্ঞা করছে, তখন আমরা কলকাতা শহর এবং শহরতলীর জল সংকটকেই এই পথের প্রধান রচনায় উপস্থিত করছি এই কারণে, যে, গোটা পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ নিরম্বু অবস্থা আমরা কিছুটা আঁচ করে নিতে পারব এই কলকাতার দর্পণে। যে কলকাতা একটি প্রথম শ্রেণীর শহর হবার সুবাদে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সর্ববিধ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে এবং যে শহরের ভূগর্ভে আছে অফুরাণ জলসঞ্চয়।

বহুতল বাড়িগুলি কীভাবে শোষণ করে নিচ্ছে কলকাতার জলের সিংহভাগ, কীভাবে জলকে কেন্দ্র করে কলকাতা ভাগ হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক তিনটি শ্রেণীতে, কী ভাবে দূষিত হচ্ছে জলস্তর—সাক্ষাৎকারে, অনুসন্ধানে, পরিসংখ্যানে তারই একটি স্পষ্ট ছবি আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি পাঠকের সামনে।

সম্পাদক স্বপ্না দেব

প্রতিক্ষণ-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত দেব কর্তৃক ৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোন ২৩-০৫৯০ থেকে প্রকাশিত
হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কোম্পানি পি-২৫৩ সি·আই·টি স্কিম ৮-এম কাকুড় গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
পাইকা ফটোসেটার্স, ১১২সি, আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে কম্পিউটার টাইপসেট যন্ত্রে গ্রথিত।
দাম : তিন টাকা। বিমানে অতিরিক্ত ০·২৫ পয়সা
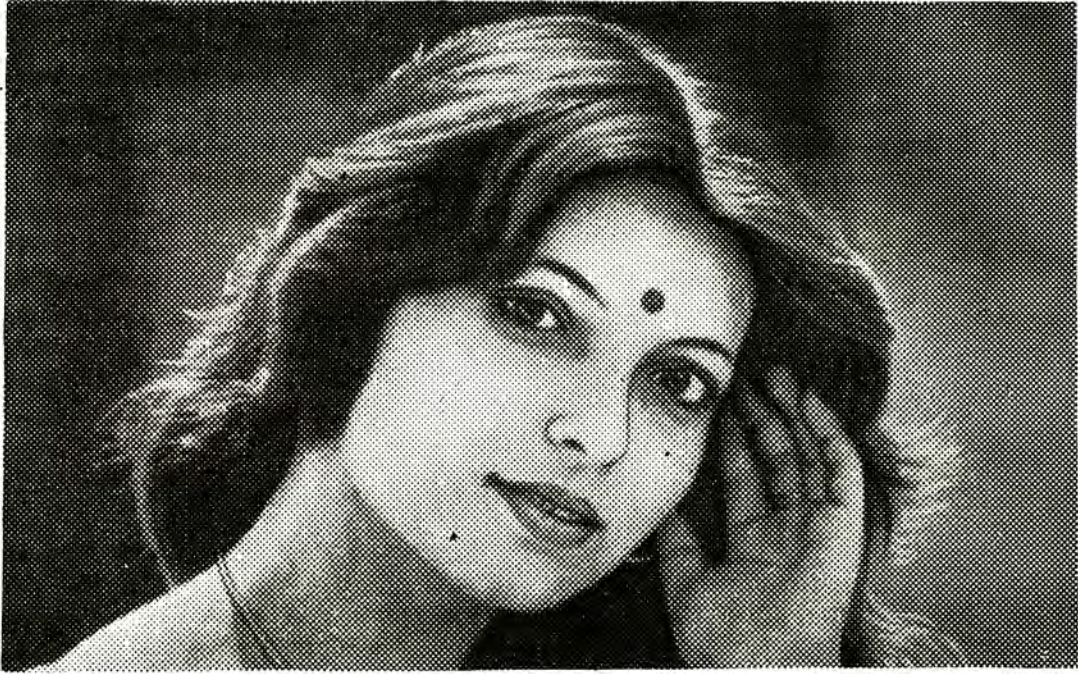
কৌশিকের মৃত্যু

কিভাবে আমাদেরই প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে একটি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যপাট চালাচ্ছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত সমাজে, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কৌশিকের মৃত্যু আর একবার সেই মর্মান্তিক সত্য উদ্‌ঘাটন করল আমাদের সামনে। এই মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা এবং অভিভাবকদের অবস্থান নিয়ে আমাদের এ পক্ষের অনুসন্ধান।

প্রধান রচনা

কলকাতা শহরে ডিপ টিউবওয়েল খুঁড়তে কারো অনুমতির প্রয়োজন হত না। তাই যত্রতত্র আকাশ ছোঁয়া বাড়ি উঠেছে আর পাতাল ফুঁড়ে জল তোলা হচ্ছে। কলকাতার মাটির তলায় জলের কোনো অভাব নেই। হবেও না। কিন্তু মাটির ওপর চলছে জলের নৈরাজ্য। কলকাতার মাটির তলার এবং ওপরের জল নিয়ে অনুসন্ধানী রচনা এবং বিশেষজ্ঞের মত নিয়ে গড়ে উঠেছে এবারের প্রধান রচনা।

অন্য আলাউদ্দিন

আমার প্রথম পক্ষ প্রথম সরোদ মানে পুরানোটা, তারপর তোমার দিদু, সে হল গে দ্বিতীয় পক্ষ আর এই নতুনটা তৃতীয় পক্ষ। বয়সটা কম তাই বুড়ো বয়সে একে হাত ছাড়া করি না। তোমার মত যুবার সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি তো করতে পারে।

প্রচ্ছদের রঙীন ফটো প্রদীপ সাহা

EVERGREEN FIELDS OF PROGRESS
WHERE QUALITY REIGNS SUPREME
Makum Tea Co. (India) Limited
Dehing T.E.
Dirok T.E.
Margherita T.E.
McLeod Russel (India) Limited
Addabarie T.E.
Gingia T.E.
Halem T.E.
Hunwal T.E.
Monabarie T.E.
Nya Gogra T.E.
Tarajulie T.E.
Tezpore & Gogra T.E.
Central Dooars T.E.
Chupara T.E.
Jainti T.E.
Matelli T.E.
Namdang Tea Co. (India) Limited
Bogapani Tea Estate
Namdang Tea Estate
NAMDANG HOUSE
27, SHAKESPEARE SARANI,
CALCUTTA-700 017
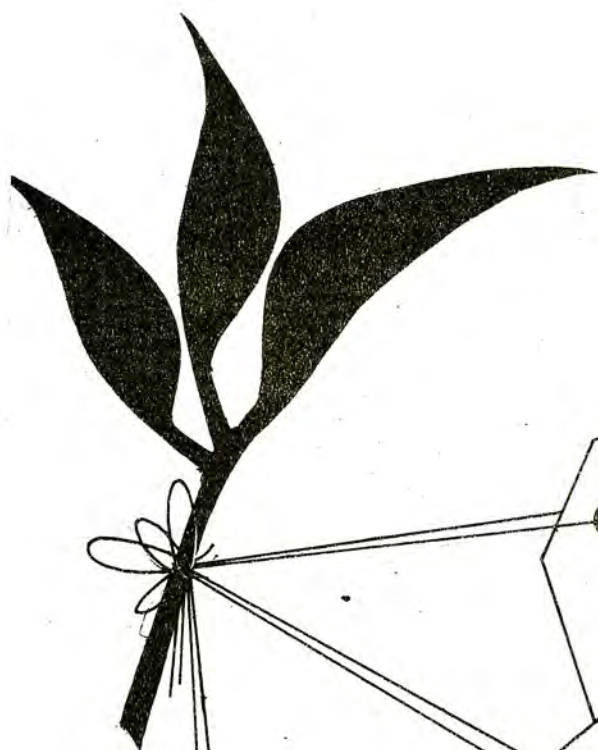
আপান আপনার প্রতিবেশীকে তিন বছর ধরে গালিগালাজ করবেন, হুমকি দেবেন, লাথি মারবেন আর তারপর আশা করবেন যে সেই প্রতিবেশী আপনার সঙ্গে বল খেলতে আসবে। তা হয় না।

--গাসহল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট নেতা, লস এঞ্জেলেসে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সমর্থনে।

লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকে যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাব। সমাজতন্ত্রী দেশের খেলোয়াড়দের সম্মান ও জীবন দুইই সেখানে বিপন্ন হতে পারে।

--সেভিয়েত রাশিয়ার অভিযোগ

আথলিটদের কাছে এ এক দুঃসংবাদ।

--সোভিয়েতের অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্তে আমেরিকার অ্যাথলিটরা

বাংলাদেশের অবস্থা তো বেশ ভাল। যার মাথা ঠিক আছে সে কেন বাংলাদেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাবে।

—বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র

সমাজের কয়েক'শ কিংবা মাত্র কয়েক হাজার ইংরেজি পড়ুয়া শিক্ষিতের জন্য ড্রইং রুম ফিল্ম করতে রাজি নই।

--মহেশ ভাট ('অর্থ' ছবির পরিচালক)

আমি এখনও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলা ফুটবলে সেরা এখানে বাংলাকে একশর মধ্যে সাতানব্বই দিতে আমার কোন ঘাটতি নেই। তিন নম্বর কাটব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য অর্থাৎ হাল্কাভাবে নেবার জন্য। —নঈম

ক্রিকেটের আইন কানুন যদি মাঠের ভেতরকার হিংস্রতা দূর করতে না পারে, তাদের কি অধিকার আছে জনতার রোশ (তা সে রাজনৈতিক হোক বা না হোক) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য চাওয়ার? --রোবিন মারলার

আমি চীনে যাব সেলসম্যান হিসেবে, তার জন্য আমি সব কিছু করব—এমনকি ব্যাগে 'আমেরিকা কিনুন' লেখা স্টিকার লটকানো পর্যন্ত। --রোনাল্ড রেগান

প্রেসিডেন্ট তাঁর পররাষ্ট্র নীতিকে মদত দিতে বলেছেন......আমরা জানিই না তিনি কি কাজটা করছেন, তাঁর পররাষ্ট্র নীতিকে মদত দেব কী করে?

--সেনেটর বারি গোল্ড ওয়াটারের চিঠি সিয়া ডিরেক্টরকে।

হাস্যরসকে আমি খুবই গুরুত্ব দিই। হাস্যরসকে আমি গ্রহণ করেছি গুরুত্ব দিয়ে। এখন হাস্যরসের নামে যা চলছে তা রীতিমত আতঙ্কিত করে।

--সাই পরাঞ্জপে (চলচিত্র পরিচালক)

খবরের কাগজে রাজনীতির লোকদের বাঁধিয়ে রাখে (আমরা জানি, কখনো মারেও)। খবরের কাগজকে বাঁধিয়ে রাখে রাজনীতির লোকেরা

--আলেকজাণ্ডার হেগ

এমন কেউ কি আছেন, যিনি লোকসভার দিবা-অধিবেশনে বুটা সিং এবং পি.সি শেঠীর বক্তৃতার সময় থাকে?

--টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয় মন্তব্য

বাজেট বিষয়ে

কলকাতায় অল্পকয়দিন থাকাকালীন আপনাদের পত্রিকাটি দেখবার সুযোগ হল, এবং কিছুটা আকস্মিক ভাবেই, বাজেট সংক্রান্ত আলোচনাটি শোনবারও সুযোগ হল।

আপনাদের পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি নানান রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে, এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষত 'ওপর' মহলে যে চেতনা আনবার চেষ্টা আপনারা করছেন, সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আপনাদের শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হবে এই আশা রাখি।

একটি বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করি, যদি কখনো এটি নিয়ে কিছু আলোচনার অবতারণা করতে পারেন, মনে হয় সেটি নিয়ে আপনাদের অনেকেই একটি বিতর্কতে যোগদান করতে পারবেন।

"Growth"-এর বিবিধ ভালোমন্দ নিয়ে গত চার দশকে অনেক মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। এই সূত্রে কয়টি প্রশ্ন এখনো যেন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। 'জাতীয় আয়' কি ভাবে বণ্টিত হবে সকলের মধ্যে এটি নিয়ে কোন আলোচনার অবকাশ হয়ত আর নেই; কিন্তু পরিসংখ্যানবিদ্‌রা এই বণ্টনের যে চিত্র উদ্‌ঘাটন করছেন, সেই বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে কি কোন গলদ আছে? শুনি যে দেশের শতকরা ৭২ জন লোক (agriculture-এ) মোট জাতীয় আয়-এর মাত্র ৪৫ ভাগ উৎপন্ন করেন, আবার পরিসংখ্যানবিদ্‌দের তথ্য ঘেঁটে দেখা যায় agricultural sector সবচেয়ে কম উৎপাদন করে, সবচেয়ে বেশি হারে আয় করছেন। "Deflature" method-এর মহিমায় সেই কথাটি এখন ওপর মহলেও গৃহীত এবং Policyও সেই ধারায় নির্ধারিত হচ্ছে। এর থেকেই "Urban India" এবং "Rural India"র বহু আলোচিত ক্রমবিবর্তনের কথা বাদ দিয়েও, যে প্রশ্ন আসে, তা হল—absolute poverty যদি বা removed হয়েছে বলে ধরে নিই (এবং povertyর সংজ্ঞা নিয়েও বিতর্কে না প্রবৃত্ত হই), গত তিন দশকে Per capita income-এ বৈষম্য কি বৃদ্ধি পেয়েছে, না লাঘব

হয়েছে? 'Rural' 'Urban'; Agricultural', Non-agricutural; শ্রমিক ও মালিক—যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রশ্নটি যাচাই করা হোক না কেন, এই Income distribution -এর সঠিক চিত্রটা কি রকম? Inflation-এর কুফল নিয়ে আলোচনা নাই বা হল—কিন্তু যে পদ্ধতিতে "real" income (সমাজের বিভিন্ন স্তরে) measure করা হচ্ছে সেটির মধ্যে কি কোন Conceptual গোঁজামিল আছে?

যদি সম্ভব হয় Firma KLM (P) Ltd প্রকাশিত "Measurement of Change in national Income" বইটি দেখতে পারেন। পরবর্তী বিশদ লেখাগুলি এখন পাচ্ছি না। টাইপ যদিও খুব ছোট, এবং অসম্পূর্ণ (এটি ৪ বছর আগে লেখা; এই সূত্রে অনেক কাজ পরে করা হয়েছে), সম্ভবত বইটির থেকে, এই Income distributionএর ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান-এর anomalies বাবদ যে ভ্রান্ত তথ্য উপস্থিত করা হচ্ছে সেটির কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

বিষয়টি উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে Growth এর সঙ্গে সঙ্গে "Sharing of the national Cake" নামে যে কথাটি অর্থনীতিবিদ মহলে সুবিদিত, এই Sharing এর চিত্রটি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে, অন্তত সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে। সম্প্রতি RBI একটি কমিটির উপর ভার দিয়েছেন 'to review the working of the monetory system' তাতে যে

১৭২টি প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলি থেকেই দেখা যায় "Growth"-এর দিকে নজর দিতে গিয়ে এই distribution of income-এর দিকটা সম্পূর্ণভাবেই অবহেলিত হচ্ছে। RBI-কে প্রেরিত দীর্ঘ স্মারকলিপির প্রতিলিপি এখন হাতে নেই, পাঠাবার চেষ্টা করতে পারি।

সম্প্রতি দিল্লির এক খ্যাতনামা বাঙালী সমাজবিজ্ঞানী বলেন "Rural exodus" বলতে কোন সমস্যা আমাদের দেশে আর নেই। কলকাতা দিল্লি বোম্বের বস্তির কথা ছেড়েই দিলাম, মহারাষ্ট্রসুন্দরী পুণা শহরের সব কয়টি পার্ক কেন বস্তিতে পরিণত হতে চলেছে তার সদুত্তর পাই নি। একমাত্র শুনলাম, Inflation বাবদ কোন income redistribution নাকি উল্লেখযোগ্যভাবে "ধনী"র favour-এ এবং "গরীব"-এর বিপক্ষে যাচ্ছে না। মাঝে শুনলাম "Hunger" বা absolute poverty-র সমস্যা চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে (1983 এর famine -এর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করার কোন সার্থকতা আছে কিনা জানি না অবশ্য)। হয়ত কথাটি সত্য, কিম্বা এটিও একটা "Point of view" মাত্র হতে পারে। সম্পূর্ণ তথ্য কম নেই statistician-এর হাতে পৌঁছতে পারে না, কিন্তু যে তথ্য হাতে আসছে, বিশ্লেষণ পদ্ধতির দুর্বোধ্যতা এবং অসারতার ফলে জানা তথ্যই পরিবেশন করবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র উপস্থিত করতে পারে

যদি কখনো সুবিধা মনে করেন, এই তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে কি গোঁজামিল চলছে (এটির সূত্র UN. Statistical Office — আমাদের statistical organisation ঐ পদ্ধতির তল্পিবাহক মাত্র) সেটি একবার খতিয়ে দেখবার জন্য কোন নবীন, উৎসাহী ব্যক্তিকে ভার দিতে পারেন। হয়ত পূর্বোল্লিখিত বইটি এই অনুসন্ধানের কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

প্রায় ১২ বছর আগে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত "Urban Growth in a Rural Area" বইটি সম্ভবত কোনদিনই বইয়ের দোকানের আলমারিতে আসে নি, সম্ভব হলে বইটি দেখবেন। দীর্ঘকাল বাদে বোলপুর শান্তিনিকেতনে "Urban Growth"-এর যে চেহারা দেখে এলাম, সেটির থেকেও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দুটি অবিস্মরণীয় পত্র

প্রতিক্ষণ এপ্রিল ১৯৮৪ সংখ্যায় দীপঙ্কর সেনের "দুটি অবিস্মরণীয় পত্র" শীর্ষক রচনা সম্পর্কিত কিছু মতামত পাঠানো হচ্ছে। এই ধরনের রচনা মূলত রেফারেন্সিয়াল, সুতরাং সর্বতোভাবেই দেখা উচিত যেন কোনরকম তথ্য বা রচনাগত বিচ্যুতি পাঠককে ভ্রান্তিবোধে আক্রান্ত না করে। লেখক তাঁর রচনার সূত্র হিসেবে কোনো কোনো পুস্তক ব্যবহার করেছেন জানি না তবে গঁগ্যার সম্পর্কিত কোন্ ভাষার জন্যই সবচাইতে জরুরী যে বই দুটি (জঁ দোলে কৃত "ল মাসতার" এবং গঁগ্যার "থ্রলান") তাদের কথা নিশ্চয়ই ভাবেন নি। দোলের পুস্তকে চিঠি দুটি আদ্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ প্রতিক্ষণে ঐ চিঠি দুটির যে অংশ উদ্ধৃত বন্ধনী চিহ্নে লেখকের বাংলা তর্জমায় পাচ্ছি তা কোনমতেই হুবহু ভাষান্তর নয়, বরং অনেক অংশেই সারাংশের উপর ভিত্তি করে ফীচার লেখকের নিজস্ব ব্যাখ্যান মাত্র। স্ট্রিণ্ডবার্গ এবং গঁগ্যা একই বাড়িতে কোনসময়ই থাকতেন না। বরং তিনি ছিলেন গঁগ্যার বিখ্যাত আড্ডার একজন সদস্য লেখক যা উল্লেখ করেন নি তা হোল স্ট্রিণ্ডবার্গের চিঠির সম্বোধন অংশ। DEAR MASTER এই নামেই গঁগ্যাকে উদ্দেশ করে তাঁর চিঠি শুরু হয়েছিল, যা যুগবৎ ঐতিহাসিক এবং নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

ফীচারের ভিতর দু'দুবার ছাপা হোল "কার্ভার" নামটি। আসলে ওটি হবে "কাভিয়ের"। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ। পুরো নাম জর্জ ক্যুভিয়ের। ফরাসী বিপ্লবের সময় তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ, এবং সে সময় তিনি ঘুরে বেড়াতেন নর্মাণ্ডির সমুদ্র উপকূলে, জেলেপাড়ায় সামুদ্রিক ঝিনুক সংগ্রহে। তাঁর পরিণত বয়েসে তিনি জিপসাম খনি অঞ্চলে এক অজানা প্রাণীর কিছু দাঁত পান। সেই ফসিল দাঁতের নমুনা দেখেই ক্যুভিয়ের সাদা কাগজে এঁকে ফেলেন বিগত যুগের এক লুপ্ত প্রাণী শরীর। যার কোন বিবরণী কিম্বা অস্তিত্ব সে সময় লোকচক্ষে ছিল না। ক্যুভিয়ের সেই প্রাণীর নাম দেন "ফেনাডোকাস"। পরবর্তী বছরই ঐ জিপসাম খনি অঞ্চলেই খননকার্য চলাকালে একটি আস্ত ফেনাডোকাসের ফসিল আবিষ্কৃত হয়, যা ছিল সামান্য বিসাদৃশ্য সত্ত্বেও ক্যুভিয়ের অংকিত চিত্রের প্রতিরূপ। নৃতত্ত্ববিদ ক্যুভিয়েরের কল্পনার অসাধারণত্ব সম্পর্কে কিছু না জানা থাকলে স্ট্রিণ্ডবার্গের চিঠির বিষয় প্রসঙ্গ, গঁগ্যার চিত্র কল্পনা তথা সৃজন প্রক্রিয়ার অসাধারণতা সবকিছুই দুর্বোধ্য থেকে যায়। শেষ কথা, লেখক অন্তত রচনার আগে অহিভূষণ মালিকের লেখা "ডিয়ার মাস্টার" পুস্তকটি (বাংলায় লেখা) দেখে নিতে পারতেন।

মানবেন্দু রায়
দুর্গাপুর ৪

২৫ বৈশাখ ক্রোড়পত্র

আমি প্রায় গোড়া থেকেই আপনাদের পত্রিকার পাঠক, আগামী সংখ্যাগুলির জন্যেও আগ্রহ যখন এযাবৎ বজায় আছে, তখন ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আপনাদের পাওনা। প্রতিক্ষণের বেশ কয়েকটি প্রধান লেখাই মনে রাখার মত (হায়দ্রাবাদের দাঙ্গা, ডাক্তারদের আন্দোলন, এবং অবশ্যই গার্ডেনরীচ)।

তবে আপাতত চিঠি লেখার উদ্দেশ্য, ২৫শে বৈশাখ ক্রোড়পত্রের একটি লেখা। চারটি লেখার মধ্যে 'রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক' লেখাটি একটু খাপছাড়া যেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে লেখাটি মনে হয়েছে, আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও, 'ব্রিটিস ওয়েবের চোখে রবীন্দ্রনাথ'। রবীন্দ্রনাথের সাথে সমকালীন পৃথিবীর বহু মনীষীর যোগাযোগ-কথা বিবৃত-ব্যাখ্যাত হয়ে রবীন্দ্রচর্চাকে সমৃদ্ধ করলেও আলোচ্য লেখাটি পড়ে মনে হয়—এমন হয়ত আরো কেউ কেউ রয়ে গেছেন যাঁরা এখনও অনালোচিত, কিম্বা এমন কেউ কি আজও অনালোচিত আছেন স্বয়ং কবি যাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে কলম ধরেছিলেন? যদি সেসব কথা জানানো যায়, তবে তা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। শ্রীযুক্ত বাসব সরকারকে অভিনন্দন এমন একটি আকর্ষণীয় নিবন্ধ উপহার দেবার জন্য। তারি সাথে অনুরোধ, এরকম আরো কিছু অনালোচিত সম্পর্কের উদ্‌ঘাটন।

দীপঙ্কর চৌধুরী,
ইন্দ্রলোক, পাইকপাড়া

প্রসঙ্গ : প্রেসিডেন্সি

প্রতিক্ষণের ২রা মে '৮৪ সংখ্যায় 'প্রেসিডেন্সি কলেজের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষা' পড়লাম। লেখার মধ্যে কয়েকটি যুক্তিগত ও তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল।

প্রথমত "এই অ্যাডমিশন টেস্টের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় স্কুল-কলেজের বাইরে হায়ার সেকেণ্ডারি স্তরে 'বিশেষ' ধরনের শিক্ষাকে", —কথাটা ঠিক বোধ্যগম্য হ'ল না। দ্বিতীয়ত "অন্তত ৫/৬ জন গৃহশিক্ষক ছাড়া এই 'বিশেষ শিক্ষা' পাওয়া সম্ভব নয়"—কথাটা কতটা যুক্তিসংগত এবং বাস্তবধর্মী সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অজেয়া সরকারের যুক্তি অনুযায়ী প্রেসিডেন্সিতে ঢুকতে গেলে একজন ছাত্রের জন্য অন্তত হাজার খানেক টাকা মাসে খরচ করতে হয়। তাহলে আমার মত ছাত্ররা যাদের পারিবারিক মাসিক আয়ই হাজার-বার'শ টাকার মত তারা কি করে প্রেসিডেন্সিতে পড়াশুনা করছে। এর থেকেও অনেক দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েও এই কলেজে পড়ে। তাই 'অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যই এদের অনেককেই কোনো এলিট কলেজে ঢোকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে', কথাটা অসার বলেই মনে হয়।

প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন কখনই সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রের উপযোগী নয়—এটা একজন বিশেষ ছাত্রের নিজের সাপেক্ষে একান্তই নিজস্ব মতামত হতে পারে; কখনই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সর্বসম্মত মতামত নয়। সুতরাং 'প্রেসিডেন্সির অ্যাডমিশন টেস্টে হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত আমাদের স্কুল-কলেজে যে পড়াশুনো হয় সেটাকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়'—এই সিদ্ধান্তে তিনি

(লেখিকা) কি করে এলেন। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসেবে এইটুকু বলতে পারি, বাজারের নামী এবং প্রচলিত বিজ্ঞানের পাঠ্যবইগুলো পড়ে নিয়ে এইচ্‌· এস্‌· সিলেবাসের সবটাই ভালোভাবে 'ধাতস্থ' করতে পারলে প্রেসিডেন্সিতে চান্স পাওয়া খুব একটা সমস্যা হয় না। পদার্থ বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছি এবং বুঝেছি যে ঐ বিষয়ে এইচ্‌· এস্‌· সিলেবাসে যত ফর্মুলা বা সূত্র আছে সব এবং তার সমস্ত রকম প্রয়োগ যথাযথভাবে জানা থাকলে চান্স পাওয়ার মত উত্তর দিতে কোনো অসুবিধা হয় না। মোটের উপর কথা, ছাত্রের সিলেবাসের উপর সম্যক জ্ঞান এবং প্রকৃত মেধা আছে কিনা সেটাই প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষার বিচার্য বিষয়।

অরুনাভ দাস
১ম বর্ষ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি কলেজ

২

ইদানীং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে বাজার গরম। আপনাদের পত্রিকাতেও (২রা মে, ১৯৮৪) ঐ ব্যাপারে লিখেছেন শ্রীমতী অজেয়া সরকার। লেখাটা পড়ে কিছু প্রশ্ন মনে এল।

প্রতিটি কলেজই, এমন কি খুব 'ওঁচা' কলেজ বলে যারা পরিচিত তারাও, ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে উৎকর্ষের এক-একটা মান নির্দিষ্ট করে দেয়। কার মান কি হবে এ ব্যাপারটা বোধহয় কলেজগুলির স্বাধিকারের মধ্যেই পড়ে বরাবর। সাধারণত উচ্চমাধ্যমিক বা দিল্লী বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই এটা করা হয়। কয়েকটি কলেজ প্রবেশিকা পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকে। কিন্তু তারাও গ্রহণ-বর্জনের প্রথম স্তরে উচ্চমাধ্যমিক বা দিল্লী বোর্ডের দেওয়া নম্বরই বিবেচনা করে, অর্থাৎ এই দুটি পরীক্ষায় একটা ন্যূনতম কৃতিত্ব দেখালে তবেই প্রবেশিকা পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাওয়া যায়। শুধু প্রেসিডেন্সি নয়, বেথুন, ব্রেবর্ন, সেন্ট জেভিয়ার্সের মত কলেজেও এই ব্যবস্থা। তবে হ্যাঁ স্বাধিকার প্রমত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র ভর্তির উভয় স্তরেই উৎকর্ষের চাহিদাটা সবার চেয়ে উঁচু করে রেখেছে আর প্রেসিডেন্সি নামের মোহ তো অন্য কোন কলেজের নেই। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়া দুজন ছাত্রের নাম করেছেন অজেয়া সরকার, যাঁরা নাকি শুধু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হতে পারতেন, কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল না হওয়ায় "এলিট কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত", সুতরাং ক্ষুব্ধ। কিন্তু এমন অনেকের কথাও বলা যায়, শুধু উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম কজনকে দিয়ে আসন ভর্তির নিয়ম থাকলে যাঁরা এই কলেজে পড়তে পারতেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে তাঁদের সেই সুযোগ দিয়েছে। একটা কথা বলেই ফেলি, একটু রূঢ় শোনাবে যদিও—প্রেসিডেন্সির মোহের কাজল চোখে দিয়ে যাঁরা এই কলেজে ভর্তি হতে উৎসুক প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে বললেই কেঁদে ফেললে চলবে কেন তাঁদের? এতে যে নিজের মুখেই কালি মাখামাখি হয়ে যাবে!

আমাদের সমাজে সবকিছুই টাকার বশ—শিক্ষাও। তাই গরিব চাষী মজুরের ছেলেমেয়েরা প্রেসিডেন্সিতে পড়া দূরে থাক, প্রাথমিক লেখাপড়ার সুযোগও অধিকাংশ সময় পান না। অন্যদিকে যার বাবার যত বেশি টাকা সে ততই 'ভাল' স্কুলে পড়া, 'ভাল' প্রাইভেট টিউটর কেনার সুযোগ পায়। অর্থাৎ 'ভাল ছেলে' হবার সুবিধে পায়। টাকা দিয়ে ভালত্ব কেনার ব্যাপারটা ন্যক্কারজনক নিশ্চয়। কিন্তু এটা আমাদের পচা-গলা শিক্ষাব্যবস্থা ও আরো বড় করে দেখলে সমাজব্যবস্থার ফল। প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষা তুলে দিলে এ সমস্যার সামান্যতম সমাধানও কি হবে?

একটু গভীরে গিয়ে একটা জিনিস কি বুঝে নেওয়া যায় না যে 'মানুষ' তৈরির কাজে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত?

নক্ষত্র রায়
বিধান নগর

পণপ্রথা রুখবে কে ?

'বলল সবাই মেয়ে হল,হলনাকো ছেলে…' এ শুধু গানের কলি নয় ধ্রুব সত্য । আজও এই বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল যুগে মেয়ে জন্মালেই দুরু দুরু বক্ষে চিন্তা শুরু হয়ে যায় । অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা কি করে ভবিষ্যতে মেয়েকে বিয়ের বৈতরণী পার করবেন । পণের টাকা জোগাড় করতে মধ্যবিত্ত বাঙালী ব্যয় সঙ্কোচ করে টাকা জমাতে শুরু করেন মেয়ের জন্মের পর থেকেই । আর গরীবের মেয়ের কপালে শৈশব থেকে লাথি-ঝাঁটা বাঁধা । অথচ আজকের যুগে ছেলেমেয়েরা একে অপরের প্রেমে পড়ছে আগের থেকে অনেক বেশি । প্রেম সাগরের জোয়ারে উত্তাল এই তরুণ-তরুণীরা তবুও পণপ্রথার মত সামাজিক কুপ্রথাকে নির্মূল করতে পারছে না কেন ?

আজকের যুবকদের বেশিরভাগই বেকার । কেউ কেউ মাসে মাসে বেকারভাতা পায় । কেউবা ছাত্র পড়িয়ে চা-সিগারেট খরচটা তুলে আনে । কারোর কারোর ভরসা নিত্যকার বাজারের বরাদ্দ থেকে কৌশলে কয়েক টাকা হাতানো । চাকরি কিংবা স্ব-উপার্জনের চেষ্টায় অনেকেই ব্যর্থ । জীবন এদের কাছে হতাশা । সমাজের কুসংস্কার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনে মনে জেহাদ ঘোষণা করলেও কার্যত এরা ঠুঁটো জগন্নাথ ।

এখনও প্রায় সব তরুণীই বিয়ের স্বপ্নে পাগল । তারা এখনও মা-ঠাকুমার যুগ পেরোতে পারেনি । গা ভর্তি গয়না, বহুমূল্য বেনারসী আর সানাইয়ের সুরের মধ্যেই সব সুখ লুকিয়ে আছে বলে তাদের ধারণা । যদিও তারা চাকরির প্রত্যাশায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলোয় ভিড় করে । ক্ষেত খামারে, কলে-কারখানায় দেশের প্রগতির কাব্যে অংশীদার হতে চায়, এমনকি কেউ কেউ স্বাধীন জীবিকা ব্যবসাকেও বেছে নিতে পিছপা হয়না । শিক্ষিত রুচিবান তরুণীরা মনে মনে পণপ্রথাকে ঘৃণা করে । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় মুখে যতই তারা পণপ্রথার বিরোধী হোক্না কেন বিয়ের সুখে লালায়িত হয়ে নিজেদের বোধ বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে । বাবার মাথায় ঋণের বোঝা চাপিয়ে বিয়েতে গয়না, ফ্রীজ, টি· ভি চাইনা এমন কথা কজন মেয়েকে বলতে শোনা যায় ? প্রেম করে বিয়ে করলেও যাবার সময় নিজেদের ভাগের সম্পত্তি গুছিয়ে নিতে এদের ভুল হয় না ।

বলবেন হয়তো, আজকের যুগে যে সমস্ত তরুণ-তরুণী প্রেম করে তারা সবাই কি বিয়ে করে ? মোটেই না । প্রেমের বাজারে একদল আছে যাদের কাছে বিয়েটাই বড় কথা নয় । দুজনে একসঙ্গে বেড়াচ্ছে, সিনেমা দেখছে, বইমেলায় যাচ্ছে, দুজনে দুজনকে জানছে অথচ সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে না । এটাই তাদের কাছে অনেক দামী । শেষ পর্যন্ত সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভিজে বেড়ালের মত বাড়ির পছন্দ করা বিয়ের আসরে ।

অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে কতিপয় প্রেমিক তরুণ-তরুণী পরস্পর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন । এ সমস্ত বিয়ে পিতামাতার অনুমতিতে সামাজিক বিয়ের স্বীকৃতি পেলেও মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছেন পাত্রের অভিভাবকেরা । "প্রেম করে বিয়ে করছ মেনে নিলাম, কিন্তু পণ নেবনা কেন ?" তাদের দাবি, "বৌভাতের খরচাপাতি সব কন্যাপক্ষকেই মেটাতে হবে ।" "গয়নাগাটি তো আপনারা আপনার মেয়েকেই দেবেন । অন্য কাউকে তো আর দিচ্ছেন না ।" "ছেলেকে মানুষ করতে এত পয়সা খরচ করলাম, পণ নেবনা মানে ?" প্রেমের বিয়েতেও এই ধরনের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, পনের হুজুগ চলছে । প্রেমিক তখন পরোক্ষে অভিভাবকেরই দলে । যতটা পণের মূল্য প্রেমের মূল্য তার কাছে তুলনায় কানাকড়িও নয় ।

আমরা, তরুণ সমাজ একদিকে প্রেমের জোয়ারে ভাসছি । বলছি এরই নাম আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা । তাহলে পণপ্রথার মত সামাজিক কুপ্রথার কাছে এই জোয়ার এসে ঠেকছে কেন ? কেন পণপ্রথাকে আমাদের সম্মিলিত জোয়ারে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিতে পারছি না ? পণপ্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরাও কি দায়ী নই ? আজকের তরুণ-তরুণীদের ভালবাসা, প্রেম সবই কি এতই ঠুনকো ? আমাদের ভালবাসার মূল্যে পণের মূল্যকে পরাজিত করতে হবে । তবেই এতদিনের কুপ্রথাকে সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব । আজকের তরুণ সমাজকে বিষয়টা গভীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি । □

অনুপকুমার দত্ত

নাটকের বাঁচামরা

একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে যে, কবিতা-উপন্যাস-নাটকের মধ্যে নাটকেই যত অনীহা । যাঁরা নাটক করছেন, যাঁরা পড়ছেন কিংবা যাঁরা দেখছেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই নাটক সম্বন্ধে একটা আপাত অনাগ্রহ । তুলনামূলকভাবে উপন্যাসের পাশে । অথচ সেই সুদূর গ্রীসের ইস্কাইলাস, সফোক্লেট, ইউরিপিডিস থেকে শুরু করে স্তানিস্লাভস্কি, ব্রেখটকে অতিক্রম করে আজ পর্যন্ত নাটক লেখা হচ্ছে । আজকে বাংলায় বাদল সরকার, রতন ঘোষ, উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, রাধারমণ ঘোষ নাটক লিখছেন, কিন্তু উপন্যাসের মতো নাটকে সফলতা এল না কেন ? সাধারণ্যে নাটক এত অবহেলিত কেন ?

আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে ডঃ অজিত ঘোষকে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম । তাঁরা নানা কথার মধ্যে আর্থিক অসঙ্গতির কথা বলেছিলেন । সত্যিই তো । উপন্যাস পড়তে এক পয়সা লাগেনা কিন্তু একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে পয়সার দরকার । আমাদের সে পয়সা নেই । এজন্যই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলির প্রায় সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত লোক নাটক দেখার সুযোগই পাননা । গ্রামের উদ্যোগী যুবকরাও তাই ঐ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন । আর মফঃস্বল অঞ্চলেই বা কত নাটক হয় ?

পশ্চিমবঙ্গের কটা মফঃস্বল শহরে যে স্থায়ী মঞ্চ আছে তা বোধহয় হাতে গুনে বলা যাবে। এমনকী খোদ কলকাতাতেই কতো পার্শেন্ট লোক থিয়েটারে যান নিয়মিত ? তুলনামূলকভাবে কবিতা-উপন্যাস পাঠকের সংখ্যা তো বইমেলাগুলিতেই নির্ণীত হচ্ছে।

"ভারতীয় গণনাট্য সংঘই প্রথম সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা আমাদের মঞ্চ ও সঙ্গীতের ধারার আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতে এবং নাট্যে তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু ভারতীয় গণনাট্য সংঘই প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান যে সচেতনভাবে তাকে সংগঠিত করে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করে—গণআন্দোলনের সঙ্গে সচেতনভাবে শিল্প আন্দোলনের মিলনের যোগসূত্র গেঁথে দিয়ে।"

১৯৪৪ সালে গণনাট্যের শিল্পীরাই বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক উপস্থাপন করেন। কিন্তু তার পরেও তো আন্দোলন হয়েছে—মন্মথ রায়, সবিতাব্রত দত্ত, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, প্রবীর দত্ত (আরো অনেকে) এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলি করেছেন। কিন্তু তবু কেন তা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না ? তাহলে কি তাদের আন্দোলনের ধারা ভুল পথে চলেছে ? আগের অনুচ্ছেদে যাঁর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরই ভাষায় 'মিলনের যোগসূত্র' কই গাঁথা হচ্ছে ? নাটক তো যুগবিবিক্ত হতে পারে না, তবু কেন তা দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হচ্ছে না ? আসলে নাটক কী হলে যে ভালো হবে তাতেই আমাদের অনিশ্চয়তা। নাটককে, নাট্য আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই দ্বিধাকে তো কাটিয়ে উঠতেই হবে। □

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

কলকাতার ফুটবল নিয়ে

চৈত্রের সেই কড়া রোদও ছিল, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের দরজাও পনের দিনের জন্য ছিল উন্মুক্ত, সমর্থকরাও রোদ-জল উপেক্ষা করে হাজির ছিল, কিন্তু তবু এবারের দলবদল তেমন জমল না। এবারের দলবদলে যার দাম নাকি সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল, সেই তথাকথিত স্টার ফুটবলারও যখন তার পুরোনো দল ছেড়ে নতুন দলে যোগ দেয়, তখন হয়ত গণ্ডগোলও হয়, হয় ইট ছোঁড়াছুঁড়িও কিম্বা টেন্টে গিয়ে হামলাও হয়ত বাকি থাকে না, কিন্তু তবুও এবারের দলবদল তেমন কোনো আলোড়ন তুলতে পারল না। দু'বছর আগেও যেমন দলবদলের বহু আগে থেকেই দু'দলের সমর্থকেরা হোটেল, রেস্তোরাঁ, পাড়ার রক উত্তপ্ত করে রাখতেন, তাদেরও এবার তেমনভাবে চোখে পড়ে নি। যার জন্য গত বছরের লীগবিজয়ী দলের অধিনায়কও যখন এবার পুরোনো দল ছেড়ে অন্য দলে গিয়ে গা মেলান, তখনও মনে হয়েছে এ যেন ঘটারই ছিল। আসলে হঠাৎই যেন নেহেরু গোল্ড কাপ আর ১৯৪ গোলের (আশা করি, সেই ঐতিহাসিক ম্যাচ দুটির কথা এত তাড়াতাড়ি আপনারা ভোলেন নি) মাঝখানে পড়ে আমাদের খেলোয়াড়দের দৈন্যদশাটা বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। গট্-আপ ঠেকাতে এক শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকের নেতৃত্বে কমিটিও গঠিত হয়েছিল এবং যথারীতি তাদের সুপারিশগুলোকে কেউ কোন সম্মান দেখানোরও প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তবুও এবার নাকি লীগ ফুটবল খেলা হবে নতুন নিয়মে। দেখা যাক, এই নতুন নিয়মের প্রয়োগে কলকাতার ফুটবল ক' সেন্টিমিটার এগোয়।

এ কথা ভীষণভাবে সত্যি যে কলকাতার ফুটবলকে চালনা করে থাকে তিন প্রধান। অথচ গত বছরের শেষ দিকের খেলাগুলোতে তিনটি বড় দলেরই মাঠের একটি বিরাট অংশ ফাঁকাই রয়ে গেছে। এবছরও যে ফাঁকা থাকবে না, তারই গ্যারান্টি কোথায় ? সুরজিৎ, হাবিবদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ফুটবল থেকে স্কিলও বিদায় নিয়েছে। তবু আছে মর্যাদার লড়াই। আর তারই জন্য আজও মারপিট হয়, ভাঙচুর হয়।

শুধু খেলোয়াড় বদল নয়, কোচ বদলও কলকাতার ফুটবলের অপর এক বৈশিষ্ট্য। ভারতের সবচেয়ে নামী এবং দামী কোচ যিনি আজকাল আবার চাকরিতে ভীষণ ব্যস্ত, তিনি গতবারের দল ছেড়ে পুনরায় অন্য দলে ঢুকেছেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য। অপর একজন প্রফেশনাল কোচ যিনি কি না ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় একটি বিশেষ দলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনিই 'ঘৃণা-লজ্জা' নামক শব্দদুটিকে আপাতত শিকেয় তুলে আবার হয়ত সেই দলটির কোচিং-এর জন্যই মাঠে নামবেন। ক্লাবপ্রীতি-টিতি এই সমস্ত শব্দ আজকাল কেমন যেন বোকা-বোকা শোনায়। ক্লাবপ্রীতির মত খুচরো মূল্যবোধকে কে পাত্তা দেয় ? দুই প্রধান তো আবার মামলা-মোকদ্দমা আর গ্যালারি তৈরি নিয়ে এত ব্যস্ত যে খেলোয়াড়দের দিকে তাকানোর সময় কোথায় ? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ স্বার্থপরতার বিষ প্রবেশ করেছে। কলকাতার ফুটবলের প্রতিটি রন্ধ্রেও আজ সেই বিষের বীভৎস উল্লাস। □

অভিজিৎ বিশ্বাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দেশে দেশে ঘর

পিটার লিখেছে মার্চের শেষের দশটা দিন আমি আর গীতা যেন দেশছাড়া না হই। দশ বছর পর ভারতে আসছে। ক'টা দিন সে আমাদের সঙ্গে কাটাতে চায়।

কিছু কিছু মানুষ খুব তাড়াতাড়ি আপন হয়ে যায়। দেশ ধর্ম জাত ভাষা রীতিনীতি—মানুষে মানুষে আড়াল-করা এই দেয়ালগুলো নিজেদের অজান্তে ভেঙে পড়ে।

নইলে হাঙ্গেরিতে গিয়ে আমার এমন জামাই-আদর জুটেছিল কেন?

গীতা যখন যুদ্ধের পর হাঙ্গেরি গিয়েছিল, ওদের ছাত্রাবাসের রসুই ঘরের তদারকি করতেন ভিগ্ বাচি বা ভিগ্ খুড়ো। ওঁদের পরিবারে গীতা ছিল ঠিক মেয়ের মতন।

আমি ভিগ্ বাচিকে দেখিনি। বিধবা ভিগ্ নেন্নিকে আমি দেখেছি তারও প্রায় দু দশক পরে। বুদাপেস্তে ভিগ্ নেন্নি তখন থাকেন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে গীতার জন্যে সে কী কান্না!

ওঁদের ছেলে রুদির সঙ্গে অবশ্য আগেই আমার আলাপ হয়েছিল কলকাতায়। রুদি প্রথমবার একা এবং দ্বিতীয়বার সস্ত্রীক এসে আমাদের বাড়িতে দুবারে দেড় দুমাস থেকে গিয়েছিল। রুদি ছিল সঙ্গীতজ্ঞ। জিপ্‌সীদের গান ছিল তার গবেষণার বিষয়।

রুদির এক বোন হাঙ্গেরির হাঙ্গামার সময় সেই যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল আর ফেরে নি।

ভিগ্ নেন্নি ছিলেন তাঁর মহল্লার পার্টি-সেক্রেটারি। গোটা পরিবারে তখন তিনিই একমাত্র কমিউনিস্ট। একদিনেই আমি হয়ে গিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ির লোক। খাবার টেবিলে ছেলে-মেয়ে বউ-জামাই যখন সুযোগসন্ধানী পার্টিমেম্বারদের সম্বন্ধে খোঁচা দিত, তখন ভালোমানুষ ভিগ্ নেন্নি অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাতেন। আমি বেশ বুঝতাম তিনি চাইছেন আমি তাঁর পক্ষ নিই।

ভিগ্ নেন্নি একবর্ণ ইংরিজি জানতেন না। আমি জানতাম না একবর্ণ হাঙ্গেরিয়ান। এ সত্ত্বেও ভিগ্ নেন্নিকে আমার নিজের মা-র মতই মনে হয়েছিল।

রুদি যে মারা গেছে, সে খবর পেলাম মাত্র মাস পাঁচেক আগে। আন্না কোথায় কেমন আছে জানি না। ভিগ্ নেন্নি?

খবরটা দিয়েছিল মস্কোয় পড়তে

আসা হাঙ্গেরির এক ছাত্রী। রুদির মৃত্যুর কথা সে হাঙ্গেরির পত্র পত্রিকায় পড়েছে।

রুদির ছিল অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। একবার আমরা যুক্তি করেছিলাম, ওদের বড় মেয়ে আমাদের কাছে এসে আর আমাদের মেয়ে পুপে ওদের কাছে থেকে লেখাপড়া করবে। পরে নাচতে নেমে বুঝেছি সাধ আর আহ্লাদ এক নয়।

গীতার বন্ধু বেটি মিলার্ড? তাকে তো কোনদিন চক্ষেই দেখি নি। আজ চৌত্রিশ বছর ধরে চিঠির সূত্রে হলেও বেটি আমাদের সঙ্গে আছে।

অগ্নিগর্ভ লাতিন আমেরিকার দিকে বেটিই প্রথম আমাদের চোখ ফিরিয়েছিল। তার ঠিক পরে পরেই এলেন কাস্ত্রো। তখন বেশ কিছুদিন ধরে বেটি একটা কাগজও বার করেছিল।

প্যারিসে, পূর্ব বার্লিনে আন্তর্জাতিক মহিলা ফেডারেশনে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকে বেটির সঙ্গে গীতার বন্ধুত্ব। দুজনে প্রায় একই সময় নিজের নিজের দেশে ফিরেছিল। বেটির ভাগ্যে আর বিয়ে করা হয়ে ওঠে নি। ঘর করবার সময়ই-বা ওর কোথায়? লেখা ছেড়ে কিছুদিন নিউ ইয়র্কের বাড়িতে ফটোগ্রাফির স্টুডিও ফেঁদে বসেছিল। কিন্তু আবার ফুড়ুৎ। দুনিয়ায় যখনই যেখানে মানুষের ঘুম ভাঙবে, মানুষ চাইবে সুখ আর শান্তি—তখনই বেটি সেখানে ছুটবে।

আমরা আশা করে আছি একদিন হয়ত এদেশের মাটিতেই বেটিকে ছুটে আসতে হবে।

জন্ চলে গেছে সে আজ কম দিন হল না। আমাদের হাঁটুর বয়সী জন।

পরীক্ষা দিয়ে একটা লটারির টিকিট কিনেছিল। পেয়েছিল একটা ঝকমকে নতুন গাড়ি। সেই গাড়ি ঝটপট বেচে দিয়ে সেই টাকা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল দুনিয়া দেখতে।

তারপর যা হয়। কলকাতায় এসে আটকে গেল। থাকত শর্বরীর স্টুডিওয়। সুতৃপ্তিতে আড্ডা দেয়। পাইস হোটেলে খায়। সায়েবের পেটে সইবে কেন? আমাশায় পট্‌কে গিয়ে সেই যে আমাদের বাসায় এসে উঠল, তারপর দেশে ফেরা অব্দি ও হয়ে গেল আমাদেরই বাড়ির ছেলে। মধ্যে মাস দুই হিচ্ হাইক করে হিপিদের ঘাড়ে চড়ে ইউরোপ ঘুরে এসেছিল।

আমাদের জন্যে সঙ্গে করে এনেছিল আফগানিস্তানের দেয়াল জোড়া এক রঙীন নিসর্গ চিত্র। ছিঁড়ে না যাওয়া অব্দি ছবিটা এই সেদিনও আমাদের বাইরের ঘরে টাঙানো ছিল।

জন্ থাকতেই আমাদের গ্যাসের সিলিণ্ডারে একবার আগুন লেগে গিয়েছিল। দমকল আসার আগেই জনের উপস্থিত বুদ্ধিতে আগুনটা আমরা নিভিয়ে ফেলতে পেরেছিলাম।

দেশে ফিরে মাঝে মাঝে চিঠি দিত। তারপর একদিন জন্ হারিয়ে গেল। অথচ আজও আমাদের বাড়ির কেউ জনের কথা ভোলে নি।

হান্না বলত, তোমাকে দেখতে ঠিক আমার বাবার মত। হান্নার একটা পা খোঁড়া ছিল। লেংচে লেংচে হাঁটত।

বলেছিল, জানো—আমাদের দেশে পোলিও-হওয়া আমিই শেষ বাচ্চা। তারপর থেকেই পোলিওর ভ্যাক্‌সিন দেওয়া শুরু হয়।

আমি যেবার প্রাগে যাই, স্থানীয় সকলেরই তখন খুব মন-মরা অবস্থা। সোজা চার্লস ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে হান্নার ঘরে হাজির হই। আমাকে দেখে হান্না অবাক।

তার ছোট্ট ঘরে কিভাবে আমাদের সকলের জায়গা হবে যখন ভাবছি, হান্না টক্ করে বলে উঠল, 'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নয় জন।'

ঠিক হল, আমরা কার্লভি-ভারি যাব। হান্না হবে দোভাষী।

তথাস্তু বলে একদিন বেরিয়ে পড়লাম গাড়িতে। রাস্তায় কত কিছু দেখতে দেখতে গেলাম। পুরনো গির্জা, গঞ্জ মতন এক শহরে ফ্যাশান প্যারেড। এক সিনাগগের র‍্যাবির সঙ্গে আলাপ হল। চেক ভাষায় তিনি 'কামসূত্রে'র তর্জমা করে প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন।

হান্না আগে ফাঁস করে নি। ফেরার পথে এক মফস্বল শহরের বাড়িতে এসে কলিং বেল বাজাল।

বুঝলাম, আমাদের আগমন বার্তা আগে থেকেই তাঁরা জানতেন। খানিক পরে শাদা মাথার এক ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন দেখেছি। হান্না একগাল হেসে বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম—এই যে আমার বাবা।' ও হো, তাহলে কি আমি ওঁকে বহুবার আয়নায় দেখেছি?

গীতা যেতে পারছে না। ছোট মেয়ের পরীক্ষা।

বেনারসে যাতায়াত থাকা-খাওয়ার সব খরচই পিটারের। কিন্তু নিজের টাকায় টিকিটটা তো আগাম কিনতে হবে!

সেকেণ্ড ক্লাস স্লীপারে যাওয়ার মত টাকা যখন যোগাড় হল, তখন আর সদ্‌ভাবে যাওয়ার উপায় নেই।

পাঁচ টাকা বেশি দিতে গেলে টি-টি বললেন, বড্ড কম হচ্ছে। বললাম, আমি একজন সামান্য লেখক। বলতেই শক খাওয়ার মত হাত টেনে নিয়ে বললেন—না, না। তাহলে একদম দেবেন না।

পাঁচ টাকার নোটটা শেষ পর্যন্ত আমাকে জোর করে তাঁর হাতে গুঁজে দিতে হল।

রথীন মিত্রের কলকাতা
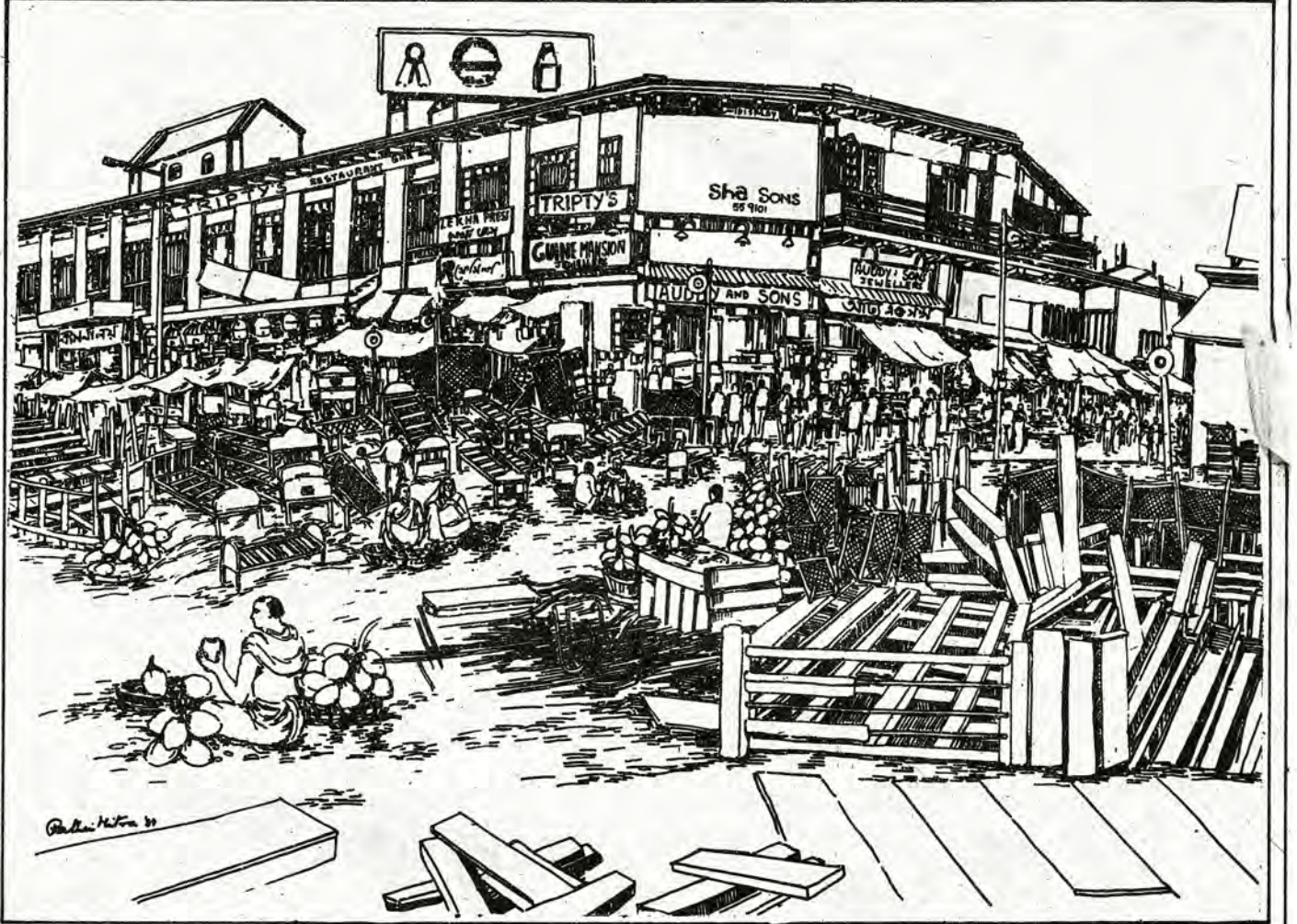
যদুবাবুর বাজারের সামনে দিনরাত চলেছে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি। তালগাছ-প্রমাণ যন্ত্র মাটির ভিতরে উঠছে নামছে কামান দাগা শব্দে। পাতাল রেল যেখানে, সেখানেই প্রায় ভূমিকম্পের মত চেহারা। তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে হয়তো খানিক। কিন্তু ব্যবসার রকমারিত্ব কমেনি। এই যদুবাবুর বাজারের সামনে এক চক্কর ঘুরলেই দেখতে পাবেন এদিক-ওদিক জুড়ে বিস্তর খাট এবং খাটিয়া। দাম জিজ্ঞেস করলেই দোকানদারের প্রশ্ন, পুরনো নেবেন ? না নতুন ? পুরনোর দাম ৪০ থেকে ৬০ টাকা। নতুন ৭০ থেকে ১৫০ টাকা। দড়ির খাটিয়া ১৮ থেকে ২৫। পুরনো খাটের মানে শ্মশান-ফেরৎ। এখানকার দোকানদারদের এজেন্ট আছে। শ্মশানের ডোমেদের সঙ্গে তাদেরই যোগসাজশ। সেখান থেকেই চালান আসে বাজারে। যে সব খাট এইভাবে শ্মশান থেকে দোকান আবার দোকান থেকে শ্মশানে যাতায়াত করেছে কয়েকবার, তারাই পুরনো। চমৎকার ব্যবসা। মূলধন লাগে যত, তার বেশি লাগে বুদ্ধি।

এই বাজারটা আগে ছিল স্যার রবার্ট চেম্বার্স। সুপ্রীম কোর্টের জজ সাহেবের বাগানবাড়ি। পরে কিনে নেন রানী রাসমণি। নিজে বাজার বসিয়ে জায়গাটা দান করে দেন দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরীকে। সেই থেকে নাম যদুবাবুর বাজার। যদু নামটাই মুখে মুখে বদলে কখন হয়ে গেছে জগু। এখন যদুবাবুর বাজার বললে চিনবে কেবল বয়স্করা। □

বেলগাছিয়া-শিবপুর

সংগঠনই শক্তি, সংগঠনই দায়

পশ্চিমবঙ্গে দুটো উপনির্বাচন হয়ে গেল ২০ মে—বেলগাছিয়ায় ও শিবপুরে। একটি কলকাতার ভিতরে, একটি কলকাতার কাছাকাছি। এ কারণেও এই উপনির্বাচনের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। কারণ কলকাতা ও তার আশপাশের হাওয়া থেকেই আমাদের বুঝতে হয়—কোথায় গরমে বাতাস ওপরে উঠে গেছে, কোথায়-ই বা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, বৃষ্টিপাত-ঝড়-খরার আশঙ্কাই বা কোথায় আসন্ন।

কিন্তু কলকাতার কাছেই ত সেদিন যাদবপুরের উপনির্বাচনও হয়ে গেল। কালিয়াচক, নদীয়ার ভোটও হয়ে গেছে। সেই সব ভোটের যোগ-বিয়োগ রাজনীতির একটা চেহারা ইচ্ছে করলে পড়া যেত। কিন্তু তখনও খুব মন দিয়ে পড়া হয়নি। এখন, বেলগাছিয়ায়-শিবপুরের সঙ্গে মিলিয়ে সেই সব অঙ্ক যে নতুন করে পড়া হচ্ছে তার কারণ এ বছরের শেষে লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা।

সি· পি· এমের নেতারাও যে এই দুটি উপনির্বাচনের ফল একটু অন্যভাবে বিচার করতে চাইছেন তারও নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জি বলেছেন তাঁদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এই পরাজয়ের জন্যে দায়ী নয়, বরং, বহুদিন পর পুরো পার্টিকে একটি কাজে এখন নামানো গেল সুতরাং পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করতে হবে ও তা থেকে যথার্থ শিক্ষা নিতে হবে।

চীন থেকে ফিরে জ্যোতি বসু চীনের অভিজ্ঞতা বলার সুযোগই পেলেন না। আমাদের আগ্রহ ছিল জ্যোতি বাবু চীনে কী দেখলেন সে-কথা শোনার। কিন্তু জ্যোতি বাবুকে তার প্রথম বক্তৃতাতেই এই পরাজয়ের কথা বলতে হল। তিনিও বলেছেন—কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তিনি আর একটু যোগ করেছেন যে বামফ্রন্টের সাত-আট বছরের শাসনের পর লোকে যদি কংগ্রেসকে জেতায় তা হলে সেটা সি· পি· এমের পক্ষে মারাত্মক কথা। জ্যোতিবাবু বলেছেন—"'লোক'কে বোঝাতে হবে যে আমরা দিল্লি পর্যন্ত যেতে চাই" "আমাদের আরো নম্র ও ভদ্র হতে হবে।"

জ্যোতিবাবুর কথাটাকে আমরা একটু গভীরে দেখতে চাই। তাঁর কথার ইঙ্গিত কি এই যে—জ্যোতিবাবু যাঁদের 'লোক' বলছেন, সেই জনসাধারণ আর এটা বিশ্বাস করছে না যে সি· পি· এম বিপ্লবী পার্টি, তাঁরা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর চান এবং তাঁরাও একটা রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ

ক্ষমতার মৌতাতে মজে আছেন? আর সে-কারণেই এই 'লোকদের', জনসাধারণকে বোঝাতে হবে সি· পি· এমের কর্মসূচির বৈপ্লবিক তৎপরতা

আর, এরই সঙ্গে কি জুড়ে আছে জ্যোতিবাবুর দ্বিতীয় ইঙ্গিত? সি· পি· এমের কর্মীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কিছু অভিযোগ হয়ত জমে উঠেছে, জনসাধারণের সঙ্গে যে-নিশ্ছিদ্র সংযোগ একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান শক্তি, সেই সংযোগে কোথাও ঘটছে শর্ট সার্কিট?

জ্যোতিবাবুর কথা থেকে যে-ইঙ্গিতগুলো আমরা খুঁজে বের করতে চাইছি—তার সত্যমিথ্যা কোনো সময়ই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এমন-কি সি· পি· এম বা বামফ্রন্টের সরকারি দলিলে পরাজয়ের যে কারণ বিশ্লেষণ করা হবে—তার ভিতরেও থাকবে অনেক সতর্কতা, অনেক সাবধানতা ও অনেক ভাবনাচিন্তা। সেই সব প্রস্তাবের চাইতে অনেক বেশি সত্য—জ্যোতিবাবুর মত অভিজ্ঞ, বয়স্ক, সর্বজনমান্য নেতার এই অনুভবের অনুমান। দলমতনির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গে এখন জ্যোতিবাবুর সমতুল আর কোনো সক্রিয় রাজনৈতিক জন-নেতা নেই। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পর্যন্ত হাতে-কলমে তিনি কাজ করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির মত সংগঠনের সাংগঠনিক নেতৃত্ব থেকে বিধানসভায় বিরোধীদলের নেতৃত্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের গৌরবময় প্রসার। প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে, পার্টির সংগঠনের সঙ্গে ও পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার সঙ্গে এই গভীর সংযোগই জ্যোতিবাবুর প্রধানতম শক্তি। জ্যোতিবাবুর সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতা এমন কোন দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যা প্রস্তাব আর বিশ্লেষণের শত শত শব্দের আড়ালে আর দু-এক দিনের মধ্যেই চাপা পড়ে যাবে।

জ্যোতিবাবুর প্রথম কথাটিই সবচেয়ে জরুরি। এ রাজ্যের মানুষ সি· পি· এমকে শাসনক্ষমতার অধিকার দিয়েছেন দুই হাত উজাড় করে। ১৯৭৭ ও ১৯৮২-র ভোটের ফল দেখে মনে হয়, ভোটারদের যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে তাঁরা চারহাতে ভোট দিতেন। তার আগে, এ-রাজ্যে কংগ্রেস কর্তৃত্বের সমস্ত বিকল্প সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়েছে। সি· পি· এমকে দলগতভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শারীরিক ভাবে উৎখাত করার ধারাবাহিক চেষ্টা হয়েছে সমস্ত রকম পদ্ধতিতে। এই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দেশে সি· পি· এম একমাত্র পার্টি যারা গোটা একটা বিধানসভা বর্জন করার অসামান্য রাজনৈতিক সাহস দেখিয়েছে। ঠিক যে সময় জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে সি· পি· এম-বিরোধী রাজনৈতিক অভিযান সবচেয়ে ধারালো হয়ে উঠেছে, সেই সময় জুড়েই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস তার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে হারিয়েছে। এর সঙ্গে সর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের তখনকার ভূমিকাও জড়িয়ে আছে।

এত কিছুর পর, সি· পি· এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্টকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রায় সাত বছর এক নাগাড়ে শাসন ক্ষমতায় রাখার পর যদি কংগ্রেসপ্রার্থীদের জিতিয়ে দেয়া সাব্যস্ত করে থাকেন-(শিবপুরে ফরোয়ার্ড ব্লক যে সংখ্যক ভোট হারিয়েছে ও কংগ্রেস যে সংখ্যক ভোট নতুন করে পেয়েছে তাতে শিবপুরেও বামফ্রন্টের রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছে—একথা মানতেই হয়)—তা হলে তা সত্যি করেই 'মারাত্মক' ঘটনা। এমন যে হতে পারে তার একটা আবছা ইঙ্গিত ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনেই পাওয়া গিয়েছিল। সেই ভোটে কলকাতার প্রধান এলাকাগুলিতে কংগ্রেসের প্রার্থীদের কাছে বামফ্রন্টের প্রতিষ্ঠিত প্রার্থীদেরও পরাজয় ঘটেছিল। কংগ্রেসের যাঁরা জিতেছিলেন, তাঁদের কাছে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের পরাজয়, প্রার্থীর যোগ্যতার বিচারে, ছিল অভাবিত। ১৯৮৪ র এই উপনির্বাচনে ১৯৮২-র সেই ধারাই কি অব্যাহত আছে? বেলগাছিয়ায় লক্ষ্মী সেন ঐ এলাকার বহুদিনের স্বীকৃত, সম্মানিত, সংগ্রামী নেতা। বেলগাছিয়ার দরিদ্র মানুষদের সঙ্গী হিশেবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ও প্রতিষ্ঠা। কলকাতা জিলা কমিটির তিনি সম্পাদক। তাঁকে হারিয়ে দিয়ে অমর ভট্টাচার্যকে জিতিয়ে দেয়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে সি· পি· এমকে রাজনৈতিকভাবে হারিয়ে দেয়া। অমর বাবু সামাজিক মানুষ হিশেবে সজ্জন। কংগ্রেসের রাজ্য রাজনীতির খেয়োখেয়ির মধ্যে তিনি কোনোদিনই থাকেন নি। রাজ্যের তেমন

উঁচুদরের নেতাও তিনি নন। এগুলো হয়ত কংগ্রেস হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভোট দিতে ভোটারকে দ্বিধামুক্ত করেছে। কিন্তু সি· পি· এমকে ভোট না দেয়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার পরই সেই দ্বিধামুক্তির প্রয়োজন হতে পারে, তার আগে নয়।

কিন্তু সি· পি· এমকে রাজনৈতিক ভাবে হারানোর এই সিদ্ধান্ত কখনোই কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ভাবে জিতিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত থেকে আসতে পারে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নেই, রাজনৈতিক নেতৃত্বও নেই। তার প্রমাণ গত সাত বছরে অসংখ্যবার পাওয়া গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। যখনই করেছে তা শেষ হয়েছে কেলেংকারিতে। শেষে দিল্লি থেকে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আন্দোলন প্রত্যাহারের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের একটি ব্যাপক কর্মীভিত্তি আছে। আগে এক সময় হয়ত এই অসংগঠিত কর্মীভিত্তিছিল প্রধানত গ্রামাঞ্চলে। এখন, শহরে-শহরে, এবং কলকাতাতেও এই কর্মীভিত্তি প্রায় অনড়। গ্রামের এই ভিত্তি কিছুটা শিথিল হয়েছে। কারণ, সেখানে তরুণ-নেতৃত্ব বামপন্থার দিখে ঝুঁকেছে। শহরে ও কলকাতাতে এই কর্মীভিত্তি যুবক ও তরুণদের মধ্যে বেশ দৃঢ়। কমবয়েসি যে ছেলেরা কংগ্রেস করে তারা হয় মাস্তান আর নয় ধান্দাবাজ—এ-রকম সরল সিদ্ধান্ত প্রায় অন্ধতার সামিল। কংগ্রেসের তরুণ সমর্থক হয়ত তার রাজনীতিকে তত্ত্বে প্রকাশ করতে পারে না। প্রকাশ করা মুশকিলও কারণ সে রকম কোনো রাজনীতি জাতীয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের নেই। কিন্তু এই তরুণরা রাজনীতিগতভাবে স্থিরপ্রত্যয়ে কমিউনিস্ট-বিরোধী ও ইন্দিরা গান্ধী যে দেশের একমাত্র ভবিষ্যৎ এই বিশ্বাসে অনড়। রাজনীতিহীন এই ঘৃণা ও আস্থাই রাজনীতিহীন এক জীবনচর্যায় পরিণত হয়। রাজনীতিহীন, নেতৃত্বহীন, কর্তৃত্বহীন কংগ্রেসের এই তরুণ কর্মীভিত্তি অত্যন্ত সত্য। সেই সত্য ইতিপূর্বে কলকাতার অনেক কলেজে ছাত্র পরিষদের জয়ে প্রমাণিত হয়েছে। সেই কর্মীভিত্তি এই বেলগাছিয়া-শিবপুরেও প্রমাণিত হল।

কেউ যদি মনে করেন, কংগ্রেসের এই কর্মীভিত্তিকে আমরা সি· পি· এমের সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করছি, তা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ, সি· পি· এমের সংগঠনের ক্ষমতার সঙ্গে অন্য কোনো পার্টির তুলনা চলে না। আর এই চরম শক্তির মধ্যেই সি· পি· এম সম্পর্কে জনসাধারণের রাজনৈতিক সন্দেহের কারণও নিহিত।

কারণ, সি· পি· এম তার সাংগঠনিক দাপটে সরকার ও সরকার-সহযোগী সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান এমন নিশ্ছিদ্রভাবে দখল করেছে যে সেখানে মাছি ঢোকারও জায়গা নেই। সংগঠনের এই শক্তিতে মানুষ ভরসা পায়, আশ্বস্ত হয়—সরকারি প্রশাসনের বিকল্প এক পার্টি সংগঠন যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন ও আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকে—তখন আমরা নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু, সংগঠনের এই শক্তিতে মানুষ ভয় পায়, সন্ত্রস্ত হয়—সরকারি প্রশাসনের বিকল্প এক পার্টি-সংগঠন যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন ও আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকে—তখন আমরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ি। তবে কি সরকার বিধানসভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সব রকম মত ও আয়োজনের যে সম্ভাবনা খোলা থাকে, তা বন্ধ হয়ে যাবে সংগঠনের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থায়। এক আমলাতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচতে আরো এক অতিরিক্ত আমলাতন্ত্র আমাদের ঘিরে ধরবে?

ঠিক, এইখানেই, সি· পি· এমের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের গৌরব সি· পি· এম পেয়েছে প্রথমবারের বন্যা ও খরার মোকাবিলায়। এখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই বন্যা ও খরার অভিজ্ঞতাতেই গ্রামের জনসাধারণ প্রথম বুঝতে পেরেছিল কংগ্রেসের রাজ্যসরকারের তুলনায় সি· পি· এমের রাজ্য সরকারের পার্থক্য। তারপর পঞ্চায়েত ও বর্গা-অপারেশন ত আছেই।

আবার, এই দায়িত্ব লঙ্ঘনের লজ্জাজনক উদাহরণ হয়ে থাকল এবারের আন্ত্রিক মহামারীর ঘটনায়। সরকারের কোনো মন্ত্রী ত আক্রান্ত এলাকাতে গেলেনেই না, উল্টে, অভিযোগ পাওয়া গেল স্থানীয় সি-পি-এম কর্মীরা গ্রামের হেল্‌থ্ সেন্টারের ডাক্তারদের ধমকে বেড়িয়েছে যে কোথাও বলা চলবে না ওষুধ পত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

অর্থাৎ প্রথমবার সরকারি সংগঠনের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে পার্টি সংগঠন কাজ করেছিল প্রধান শক্তি হিশেবে। আর, এবার সরকারি সংগঠনের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাকে রক্ষা করার কাজে লাগানো হল পার্টি সংগঠনকে। উভয় ক্ষেত্রেই সেই একই শৃঙ্খলা পরায়ণ পার্টি-সংগঠন। প্রথম বার যে সংগঠন সরকারের নিয়ন্তা। দ্বিতীয়বার সেই সংগঠন সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সি-পি-এম, এই প্রক্রিয়ায় যেন একটি সরকারি দল হয়ে উঠছে। সরকারি দল সরকারকে কোনোক্রমে রক্ষা করতে চায়। সি-পি-এমও কি তাই চাইছে? এই সংশয়েই মানুষজন এখন বড় বেশি করে খতিয়ে দেখতে চাইছে সরকার সি-পি-এমকে কতটা গ্রাস করছে।

তার একটি অত্যন্ত খারাপ অভিজ্ঞতা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে। সেখানে সিনেটের সুপারিশগুলো থেকে একটি কাজ আচার্য বেছে নিয়েছেন। এটা বিধানসভার পাশ-করা আইনের এক্তিয়ারেই থাকে। সি-পি-এম তাদের নিজেদের প্রার্থীকে যে সর্বোচ্চ ভোট পাইয়ে দিতে পারে নি সেটা সি-পি-এমেরই ত্রুটি, সাংগঠনিক ত্রুটি। অথচ সেই ত্রুটি ঢাকতে তারা নিযুক্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে ও আচার্যের বিরুদ্ধে বয়কট-বয়কট খেলায় নেমে পড়ল। আমরা জানি না—সেই খেলা এখনো চালু আছে কিনা। কিন্তু এই বয়কটের সিদ্ধান্ত ও তার পর তড়ি ঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন মানুষজনকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে—এরা কি নিজেদের দখল থেকে এইটুকুও ছাড়তে রাজি নয়? নিজেদের দোষেই যদি কিছু হয়ে থাকে সেটাও মানতে রাজি নয়?

আমরা এ-কথা কখনোই বলতে চাই না যে এই সব ঘটনা আলাদা-আলাদা ভাবে জনসাধারণের মত নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু এই সব কিছুর সমবেত প্রভাব জনমতের ওপর নিশ্চয়ই পড়েছে। তেমনি, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের খবরের কাগজে ধারাবাহিক বিবৃতির নকল লড়াইয়ের 'কায়দাবাজি মানুষের রুচিকে আঘাত দিয়েছে।

তেমনি সাত-সাতটি বছরে বামফ্রন্টের কোনো সাংগঠনিক বিস্তার উচ্চতম স্তরের নীচে কোথাও ঘটল না—এটা মানুষজনকে খানিকটা বিমূঢ় করে রাখে। ঘটনা এটা নয় যে প্রত্যেকেই চান গ্রাম-গ্রামান্তরে বামফ্রন্ট কমিটি ছড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু, গত সাত বছর ধরে ত বামফ্রন্ট একটা রাজ্যস্তরের কমিটি হয়ে আছে—তারা মাঝে-মাঝে মিটিং করে। কিন্তু সেটা কোনো সময়ই একটি রাজনৈতিক ফ্রন্টের চেহারা নেয় না। এমন কি এই বেলগাছিয়া-ভোটেও বামফ্রন্টের কোনো কমিটি হয় নি। বামফ্রন্টের অন্যান্য কমিটির কর্মীদের ওপর সিপিএমের ভরসাও করা। এবং তাঁরাও স্বাভাবিক ভাবেই অধস্তন ভূমিকায় নিজেরা খুব জোরদার কাজে নামতে পারেন না। ফলে, বামফ্রন্ট হয়ে থাকে সিপিএমের একটা সংগঠন। বামফ্রন্ট হয়ে ওঠে না এমন সংগঠন যেখানে সিপিএম প্রধানতম হলেও অন্যতম।

এই ভোটের ফল বেরবার পর আমরা বেলগাছিয়ায় ঘুরছিলাম। কোনো উল্লাস ছিল না। আনন্দ ছিল না। প্রায় চোখমুখ দেখেই বলে দেয়া যাচ্ছিল বামফ্রন্টের বা সিপিএমের বরাবরের সমর্থকরা সিপিএমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে রাগে, বিরক্ত হয়ে, কিন্তু এখন সি-পি-এম হেরে যাওয়ায় দুঃখ পাচ্ছেন। প্রসঙ্গত তাঁরা বারবার প্রমোদ দাশগুপ্তের কথাও বলছিলেন। যেন, অমন একজন নেতার অভাবেই হাল এমন হয়েছে। প্রসঙ্গত জ্যোতি বাবুর চীন-ভ্রমণের কথাও এসেছে। যেন, জ্যোতি বাবুর চীনযাত্রায় এই উপনির্বাচন তার রাজনৈতিক তাৎপর্য হারিয়েছে। যেন, জ্যোতি বাবু থাকলে আরো কিছু ভোট পাওয়া যেত।

কংগ্রেস দলেও উল্লাস ছিল না খুব একটা। তাঁরা অত্যন্ত দ্রুত এই নির্বাচনী সংগঠনকে ও জয়কে আগামী লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছেন। তাতে তাঁদের তৎপরতায় মনে হল—তাঁরা বেলগাছিয়ার জয়েই খুশি থাকার মত আর নেই, এখন তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বেড়েছে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই গভীর রাজনৈতিক লড়াইয়ের দিকে বেলগাছিয়া আমাদের ঠেলে দিল।
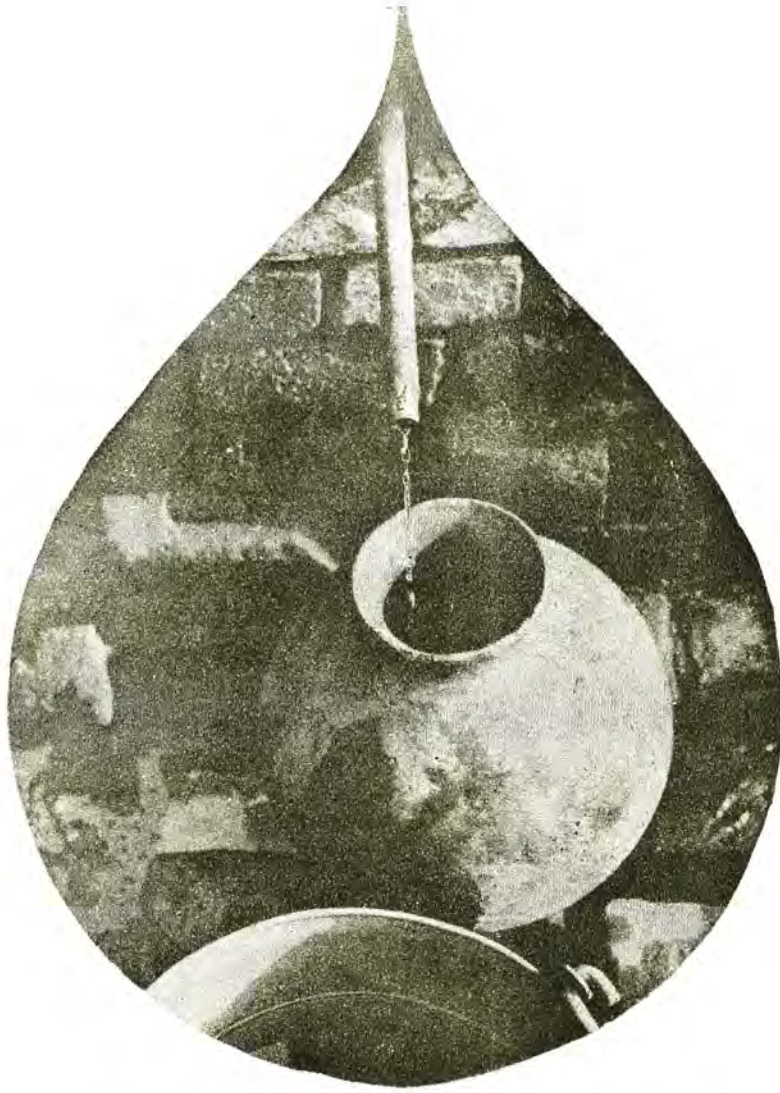
কলকাতার জল

কলকাতার জলের শ্রেণীভাগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সাধারণভাবে খবরের কাগজে, নেতাদের বিবৃতিতে, বা এমন কি বিশেষজ্ঞদের কথাবার্তাতেও এ-রকম একটা ভাব আসে যেন কলকাতার সব লোক একই জল খান, সুতরাং সেই জলের দোষগুণের দ্বারা তাঁরা সবাই যেন একই ভাবে প্রভাবিত হন। কলকাতার কলের জলে কোথাও যদি **জীবাণু** পাওয়া যায়--সে **জীবাণুর** দ্বারা **বহুতল** অধিবাসীদের আক্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কাই নেই। কারণ তাঁরা জীবনযাপনের কোনো স্তরে বা প্রয়োজনে ঐ জলের সংস্পর্শেই আসেন না।

মাটির ওপর কলকাতার **লোকজনের** বসবাস শ্রেণী-অনুযায়ী ভাগ করা। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, পার্কের আনাচে-কানাচে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা এ-শহরের নীচের স্তরের মানুষ। ফুটপাতেই যাঁদের সংসার তাঁদের বলা যায় সংগঠিত বিন্যাসের **নিম্নতম** স্তর। তারপর ধীরে ধীরে আছে ছোট বস্তি, খারাপ বস্তি, ভাল বস্তি, বস্তিও নয় অথচ ফ্ল্যাটও নয়--এমন সব ভাড়া বাড়ি, বার ঘর এক **উঠোনের** ঘরবাড়ি, তারপর আছেন ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দে, হাউসিং এস্টেটের বাসিন্দে--এই করতে-করতে বিন্যাসের উচ্চতম স্তরে আছে **বহুতল** বাড়ির বাসিন্দে।

এই বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা অধিবাসীরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী জল ব্যবহার করেন এবং প্রত্যেকেরই জলের উৎস আলাদা। এতই আলাদা যে কোনো অবস্থাতেই এক শ্রেণীর লোক, অন্য শ্রেণীর লোকের জলের উৎস ব্যবহার করতে পারে না।

কলকাতায় মাটির ওপরে, যে-যত ওপরে থাকে, সে কলকাতার মাটির তত নীচের জল খায়।

বা, এই একই কথাকে উল্টে বলা যায়, কলকাতায় যে মাটির যত কাছাকাছি বাস করে, সে তত বেশি করে মাটির ওপরের জল খায়।

যেমন ধরুন মল্লিকঘাট ও ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন থেকে অপরিশোধিত ঘোলা মাটি-মেশানো গঙ্গা জল পাইপে ছড়ানো হয়—রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা পরিষ্কার করার জন্যে। তাও অন্তত ১৫/২০ বছর কলকাতার রাস্তাঘাট নালা-নর্দমা জল দিয়ে ধোয়া হয় না। প্রত্যেকেই রোজ দেখেন, গঙ্গার এই ঘোলা জল শহর কলকাতার মধ্য অঞ্চলে—কারণ কলকাতার নতুনতর অঞ্চলে গঙ্গা জলের পাইপ যায়নি—ফুটপাত বাসীদের ও কোনোকোনো অঞ্চলের বস্তিবাসীদের সমস্ত কাজের একমাত্র অবলম্বন!

এরপর বস্তি। সেখানে টালার ট্যাংকের একটা লাইন থাকে আর তাতে ঘটি-বাটি-বালতি থাকে সারাদিন! এটাও হুগলি নদীরই জল কিন্তু 'পরিশোধিত' জল!

এর ওপরের স্তরে যাঁরা তাঁরাও প্রধানত এই টালার জলের ওপরেই নির্ভরশীল।

তার ওপরের স্তরে কলকাতায় জলের দিক থেকে নতুন অভিজাত শ্রেণী—মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং ও হাউসিং কোঅপারেটিভ। এঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ জলব্যবস্থা আছে। গভীর নলকূপে মাটির ১০৮, ২০০, ৩০০ ফুট গভীর থেকে এঁরা জল তুলে জমা করেন, তারপর সেই জল বিলি করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সল্ট লেকেও এই একই ব্যবস্থা চালু করেছেন। মাটির যে-গভীরতা থেকে এই জল তোলা হয় সেখানে জল জীবাণুমুক্ত। কোথাও-কোথাও লবণের ভাগ বেশি থাকে; কোথাও-কোথাও লোহার ভাগ বেশি থাকে। সেসব ত্রুটি সংশোধনের জন্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্টের নানা রকম ব্যবস্থা হয়েছে।

তাই, কলকাতার 'জলসমস্যা' বলতে এখন কিছু বোঝা যায় না। আসলে, 'কলকাতার জলসমস্যা' বলে কোনো সমস্যাই নেই। হাউসিং এস্টেট, মাল্টি স্টোরিড—ইত্যাদিতে কলকাতার জনসংখ্যার যে-বেশ বড় একটা অংশ থাকে—তাঁদের 'জলসমস্যা' বলে কিছু নেই। যন্ত্রপাতি খারাপ হলে সারিয়ে নিলেই সমস্যা হাসিল। সল্ট লেকে অবিশ্যি মাঝে মাঝে অভিযোগ শোনা যায়। কারণ সেখানে জলের চাপ সব সময় এত বেশি রাখা সম্ভব না যে সেই চাপে জল তেতলা-চারতলা ছাদে ট্যাঙ্কে উঠবে। কিন্তু সল্ট লেকে যে এখনো অধিকাংশ বাড়িতেই পাম্প নেই, তাতেই প্রমাণিত হয়—জল সেখানে কোনো সমস্যা নয়।

টালার জল বলতে আমরা জল সরবরাহের যে-ব্যবস্থাটিকে বুঝে থাকি তা সংখ্যার দিক থেকে কলকাতার বিপুলতম অংশকে পানীয় ও প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে। সাধারণভাবে সেই জলের সরবরাহের প্রয়োজন নির্বাহ করা যায়—মাঝেমধ্যে যান্ত্রিক গোলমাল ছাড়া। এক-একটি বস্তিতে বা বেশ ঘনবসতি অঞ্চলে জলের কলের সংখ্যার অভাবটাই জলকষ্টের প্রধান কারণ। কিন্তু সে অভাবের জন্যে দায়ী প্রধানত বস্তির বা ঐ ধরনের বাসস্থানের মালিক। জানিনা, কলকাতার কর্পোরেশনের এমন-কোনো আইন আছে কিনা—যাতে জনসংখ্যার অনুপাতে কলের সংখ্যা বাড়ানো বাধ্যতামূলক করা যায়।

কিন্তু জল নিয়ে তত্ত্ব-তালাশ করতে গিয়ে আমরা প্রধানত যে-বিষয়টি আবিষ্কার করেছি, তা হল কলকাতা তার জীবনযাত্রার গণতন্ত্র হারিয়ে বসেছে। জলের মতো জিনিসের ওপরও শ্রেণীকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার হয়—কলকাতায় তৈরি কোল্ড ড্রিঙ্কসের হিসেব থেকে।

কলকাতায় অলিতে-গলিতেও এখন কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান আছে। এই জল নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের জল ও বিশেষ আয়সীমার লোকজনই এই জল খেয়ে থাকেন। কিন্তু এই হিসেব থেকে আমরা দেখতে পাব—এই 'বিশেষ' জলও এখন কত 'সাধারণ' হয়ে গেছে।

তাপিত কলকাতার তৃষিত মানুষ ঠাণ্ডা করতে কলকাতার দশটি ঠাণ্ডা পানীয় তৈরির কারখানায় দিনে মোট ৭,২০,০০০ বোতলে জল ভরা হয়। এবং এই বিপুল পরিমাণ বোতল বাজারে আসে বিক্রির জন্য। কলকাতার লাইসেন্স-প্রাপ্ত দশটি কারখানা প্রতি আট ঘন্টার শিফটে দশ হাজার কেস বোতলে জল ভরে। একটি কেসে বোতল থাকে ২৪টা। প্রত্যেক কারখানায় তিন শিফটের কাজে মোট জল ভর্তি বোতলের উৎপাদনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,২০,০০০ বোতল। এই ঠাণ্ডা পানীয়—যার পারিভাষিক নাম 'সফট ড্রিঙ্ক'—একটা স্ট্যাণ্ডার্ড বোতলে ২০০ মিলি লিটার পরিমাণ থাকে। অর্থাৎ ৭,২০,০০০ বোতলে ভরে রোজ ১,৪৪,০০০ লিটার জল কলকাতার বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

এতো কেবল সরকারি হিসেব। সরকারি হিসেবের দশটি কারখানা ছাড়াও সমপরিমাণ লাইসেন্স বিহীন কারখানা প্রতিদিন ঠাণ্ডা পানীয় তৈরি করে বাজারে ছাড়ছে—তার হিসেব এখানে দেওয়া হল না। □

মিলন দত্ত
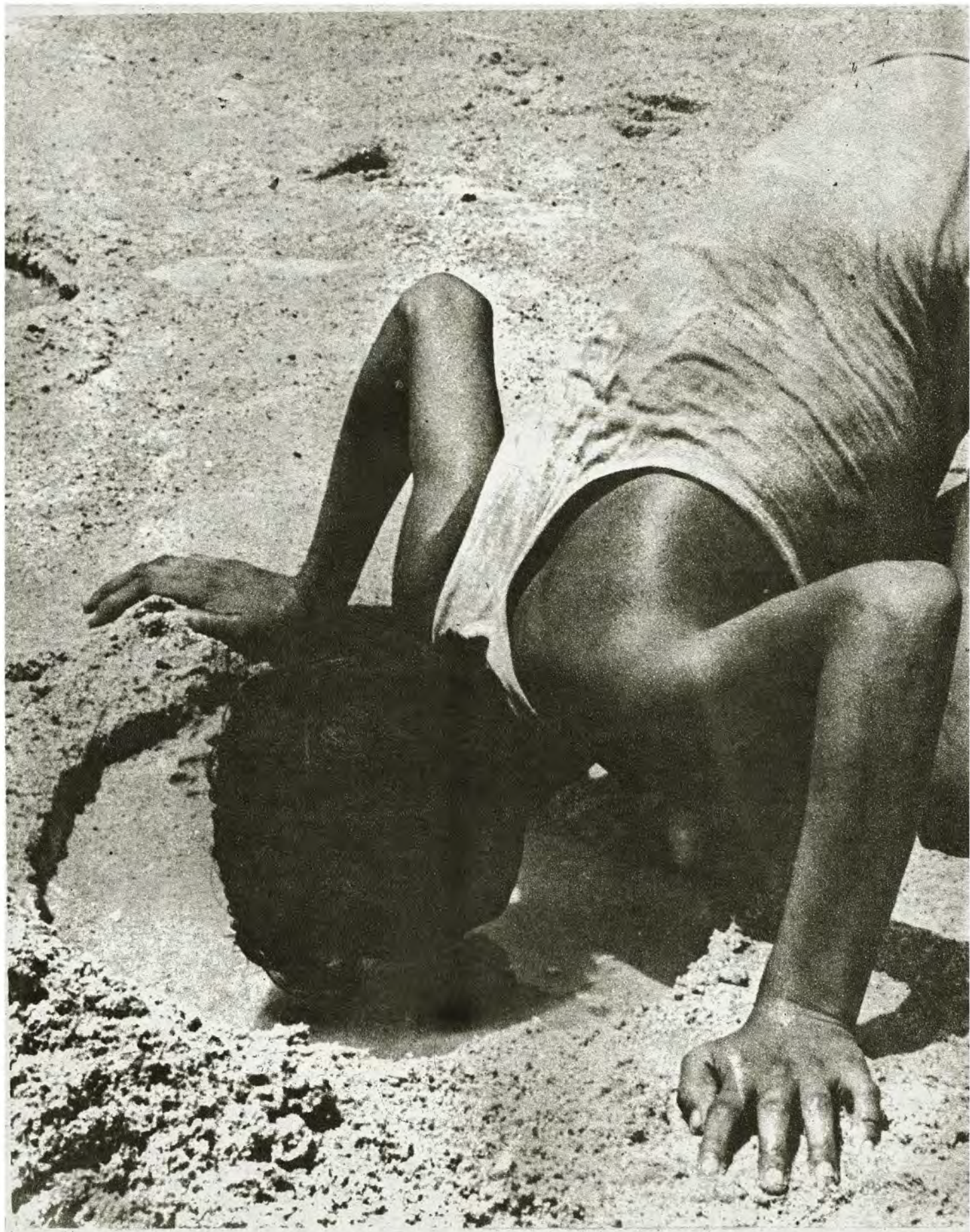
কলকাতার নগর পরিকল্পনা ও পানীয় জল

সুব্রত সিংহ ও সুরজিৎ গুহ, ভূগর্ভস্থ জল ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তাঁরা কলকাতার জল ও নগরবিন্যাস সম্পর্কে তাঁদের গবেষণার ফল আমাদের জানান। প্রসঙ্গত কলকাতার নগর পরিকল্পনা ও জল-উত্তোলন ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে তাঁরা আলোচনা করেছেন।

কলকাতা শহর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভুল করা হলো—১)শহরটাকে কলকাতার কাছের জমিগুলো ভরাট করে করে বাড়ানো হতে লাগলো—বালীগঞ্জ, নিউ আলিপুর, দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের রেল লাইন বরাবর যাদবপুর, গড়িয়া অবধি জনবসতি—কিছুটা পরিকল্পিত, নলিনী সরকার করেছিলেন, বাঙ্গুররা করেছিলেন এবং অনকেটাই জনসংখ্যার চাপে। ফলে শহরের বসতি বাড়তে থাকল পুবে ও দক্ষিণে, জমি ভরাট করে। সল্ট লেক হয়েছে, বৈষ্ণবঘাটাও তৈরি হলো এবং এখনও পরিকল্পিতভাবে সেই বৃদ্ধিটাই চলছে।

জলের সঙ্গে এর যোগাযোগটা কোথায়? আমরা যতো দক্ষিণে যাচ্ছি, ততে হুগলীর মোহানা নিকটবর্তী হচ্ছে। আমরা ঢুকে যাচ্ছি একটা বদ্বীপ অঞ্চলে। বদ্বীপ এলাকায় লোনা জল প্রধান সমস্যা। জমি তৈরির সময় তাই ভূগর্ভস্থ নানা স্তরে জমে থাকা জলে লোনা জল মিশে যায় অনেক জায়গায়। কিন্তু ৭০০-৮০০ ফুট নীচের জল মিষ্টি হবে। লোনা ব্যাপারটা ছাড়াও লোহা ও অন্যান্য আকরিক পদার্থ ঢুকে যায়। আমাদের অববাহিকার জলগুলো সেই উত্তর প্রদেশ থেকে বিরামহীন আসছে আর পরস্পরযুক্ত। পৃথিবীর ভেতর সবচাইতে বড় ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার এই অববাহিকা জুড়ে—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ, অর্থাৎ গঙ্গা-সিন্ধু অববাহিকা বলা হয় থাকে। ধীরে ধীরে জলপ্রবাহের ফলে হাজার হাজার বছর ধরে ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারে জল সঞ্চিত হচ্ছে, তাতে সমুদ্রের দিকে যতোযেতে থাকে জলটা, ততো লোহা, আকরিক পদার্থ জমে যায় তার ভেতর। সময় লাগে অনেক। তাই বদ্বীপের দিকে জলে আকরিক পদার্থের পরিমাণ বেশি। প্রমাণ হচ্ছে দমদম এবং তার উত্তরে জলে লোহা বা অন্যান্য পদার্থের পরিমাণ যতো, কলকাতার দক্ষিণ দিকে তার পরিমাণ অনেক বেশি।

কলকাতার উত্তরদিকে কিন্তু ক্রমশ জলটা ভালো হচ্ছে, এবং জলের স্তরগুলো কিন্তু মাটির অনেক কাছে। এখানে ক্রমশ কাদামাটি পাওয়া যাচ্ছে, ও ৫০০-৬০০ ফিট মাটির মধ্যেই কিন্তু জল আছে, যার থেকে আমরা হ্যাণ্ড টিউবওয়েল বা অন্যান্য মাধ্যমে জল নিয়ে থাকি। সেগুলো বড় ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার নয়। বড় ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার কলকাতার দক্ষিণ দিকে পাওয়া যায়, অনেক নীচে গিয়ে। জিওলজিকাল সার্ভের সমস্ত কাজ এতে করা আছে। সবাই জানেন, কোথায় কতো ফিটের প্রধান 'এ্যাকুইফার' (জলাধার স্তর) আছে। কোথায় ছোট ছোট লেন্সের মতো লেয়ার আছে যেখান থেকে একটানা জল তুলতে থাকলে জল শেষ হয়ে যাবে, তেমন লেয়ার সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু বড় জলাধার স্তর সম্পর্কে তথ্য আছে। শহর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যতো সরে যাচ্ছে, ততো ভালো ভূগর্ভস্থ জলের উৎস থেকে দূরে যাচ্ছি আমরা।

২)ফলে সরবরাহের সমস্যা আসছে। নতুন করে পাইপ বসাবার খরচা অনেক। সেইজন্যে প্রত্যেক জায়গায় আলদা আলাদা টিউবওয়েল খুঁড়ে দিচ্ছি। তিন-চার মাস পরে লোহা জমে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টিউবওয়েল প্রায়শই ভালোভাবে করা হয় না। যেখানে ভূগর্ভস্থ জল যতো গেলামেলে, সেখানেই টিউবওয়েল বসাবার কতোগুলো রীতিনীতি আছে। যেমন আগে পেতলের ছাকনি দিয়ে করা হতো, তাতে রাসায়নিক তলানি জমার পরিমাণ অনেক বেশি। লোহাতে কম হয়, তাতে প্লাস্টিক কোটিং করলে এই তলানি জমা এড়ানো যায়। এইরকম অনেক কম-খরচা পদ্ধতি আছে। পি· ভি· সি· পাইপ আছে। মোদ্দা কথা হলো, যেটা পরিকল্পিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা তা ব্যর্থ হচ্ছে। এখন খুঁড়তে খুঁড়তে কম আকরিক উপাদানের জল যদি পাওয়া যায়, সেটা নেহাতই

সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু দক্ষিণাংশের জলে আকরিক উপাদান ও লবণাক্ত স্বাদ খুব বেশি।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, পরিকল্পিত ও সংগঠিত জল সরবরাহ কলকাতায় কোনোদিনও কম হতে পারে না। কমার কথা শুনলে লোকে হাসবে। আমাদের এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ এই এলাকায়—বদ্বীপ অঞ্চল বলে এর একটা বিশেষ চরিত্র আছে। এখানে ১,২০০-১,৪০০ ফুট টিউবওয়েল করলে জল পাওয়া যাবে। 'আয়রণ এলিমিনেটর' দিলে বাইরের সমস্যাও থাকবে না। কিন্তু সে সব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশে লোকে ভালো খেতে পায় না, বস্তিতে ভালো পায়খানা নেই—সেখানে এমন খরচা করলে অনেকেই অন্যায় বলবেন।

কিন্তু এখন হচ্ছে কি—যেমন গার্ডেনরীচ। কোথা থেকে জল টানা হচ্ছে—হুগলী।

শ্রীরামপুর—কোথা থেকে জল টানা হবে—হুগলী।

কামারহাটি—হুগলীর জল।

বরানগর—হুগলীর জল।

এমন কি হলদিয়ার জন্য এক প্রকল্পে বলা হয়েছে—উলুবেড়িয়া থেকে জল নিয়ে হলদিয়াতে ফেলা হবে!

হুগলী নদীর একেবারে মোহানার কাছটা বাদ দিলে বাদবাকী অংশ কল্যাণী থেকে বাটানগর কিন্তু ভীষণ দূষিত। ফলে এই পুরো অংশের যেকোনো জায়গা থেকে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জল টানলে সে জলটাকে সবসময়ই পরিশোধন করতে হবে। তার খরচা তো অনেক বেশি। অর্থাৎ আমরা নিজের ময়লা নিজে খাচ্ছি। হুগলীর জল ময়লা করছি আমরাই, সেই জলই আবার আমরা খাবার জন্যে টানছি। অনেক দাম দিয়ে। দুর্গাপুরে টামলা নালার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—এতো বেশি শিল্প সংস্থার ময়লা পড়ছে ওখানে যে তাকে পরিশোধন করবার ব্যয়ও ততো প্রচুর। অর্থাৎ আমরা একটা নঞর্থক জল পরিকল্পনায় চলে যাচ্ছি। গ্রীষ্মের সময় এতোগুলো জায়গা থেকে গঙ্গার জল ব্যবহারের জন্য টেনে নিলে তার প্রতিক্রিয়া কল্পনা করা কষ্টসাধ্য নয়। অথচ ফারাক্কায় জল চেয়ে আমাদের শক্তি আমরা অযথা ব্যয় করছি।

শহরের বিকাশ ও প্রসারকে আমরা যদি উত্তরদিকে রাখবার চেষ্টা করতাম, তাহলে আরো ভালো ভূগর্ভস্থ জল মানুষজন পেতেন। আমাদের প্রধান জল সরবরাহের পরিকল্পনাতে টিউবওয়েলের ব্যাপারটা কিন্তু জরুরী অবস্থা হিসেবে বলা আছে। স্থায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা একমাত্র উত্তরাংশেই হতে পারত।

তাছাড়া, কলকাতা বন্দরের নাব্যতার ব্যাপারও তো আছে। এই জল টানাবার ফলে জলদূষণ বাড়ছে। আমরা নিজেদের পরিকল্পনার ভুলের জন্য এভাবে জল নিয়ে নেব, এটা তো চলতে পারে না। তাছাড়া বিদ্যুতের সমস্যা আছে। পলতা একদিন বন্ধ থাকলেই জলের জন্য হাহাকার লেগে যায়।

তাই শহরটাকে দক্ষিণ দিকে কোনোমতেই বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। লোকজনকে বলে দেওয়া দরকার—দক্ষিণ দিকে গেলে ক্রমাগত জলের সমস্যা দেখা দেবে। কলকাতার খাবার জলের প্রধান সমস্যা হলো, যেখানে জল ভালো পাওয়া, প্রচুর জল যেখানে আছে, শহরটাকে আমরা সেই জায়গা থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ফলে আমরা হুগলীর জলের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। হুগলীর জল অত্যন্ত দূষিত। তা পরিশোধনের ব্যয় তাই প্রতি বছরই বাড়ছে। ফলে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

পূর্ব কলকাতার যে সব জমি আমরা ভরাট করেছি, সে সব জমিতে কলকাতার ময়লা জল প্রধানত গিয়ে পড়ত।—সল্ট লেক, ধাপা ইত্যাদি এলাকায়। সেখানে পলি জমত। তুলে ফেলা হতো এবং মাছের চাষ হতো। ময়লা-গাদ পিয়ালী-বিদ্যাধরীতে পড়ত কতগুলো খাল দিয়ে। পিয়ালী-বিদ্যাধরী প্রবাহ মজে গেছে। সেখানে এখন চাষবাস হয়। আজকে কিন্তু এই ময়লা জলটা ফেলার কোনো জায়গা নেই। কতগুলো পাম্প আছে। প্রধানত পামার বাজারে।

কলকাতায় বর্ষাকালে জল জমে। আমাদের জল নিকাশী পদ্ধতিতে এই জমা জল ও বাড়ির ময়লা জল একই সঙ্গে যায়। কিন্তু জল পাম্প করে বের করতে হলে তো পামার বাজারে জলটাকে পৌঁছুতে হবে। ছাই ও অন্যান্য জিনিস ফেলে আমরাই বিভিন্ন জায়গায় ভূগর্ভস্থ পাইপ ও ঝিল্লি বন্ধ করে দিয়েছি।

ফলে পামার বাজারের পাঁচটা পাম্প তো চালানোই যায় না—কারণ জল পৌঁছয় না সেখানে। আর যদি ধরেও নিই যে জল পামার বাজারে পৌঁছচ্ছে—তাহলে পাম্প করে জলটা ফেলবার কোনো জায়গা এখন নেই। রাস্তায় খাবার জল সরবরাহের স্ট্যাণ্ডপোস্ট, বিশেষ করে কুমারটুলি, বৌবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রীট অনেক নীচু। বর্ষাকালে জলে ডুবে যায়। সেখান দিয়ে ও জমির অন্যান্য অসংখ্য ফাটল দিয়ে দূষিত জল বৃটিশ আমলের পাইপে নানা ছেঁদা দিয়ে পাইপের খাবার জলের সঙ্গে মিশে যায়। পলতা থেকে টালাতে আসার সময় কোনো বড়রকম দূষণ হতে পারে না—নতুন পাইপ বসানো হয়েছে বলে। কিন্তু টালার ট্যাঙ্ককে একটি দূষিত এ্যাকুয়ারিয়াম বললে অতিশয়োক্তি হয় না। সেখানে জীবাণু ভর্তি। সব জীবাণুতে ভয় পাবার কারণ নেই। কিন্তু সেই জলই পাইপ দিয়ে আসবার সময় ওপর থেকে আসা ময়লা জলের সঙ্গে মিশে যায়। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ জলনিকাশী ব্যবস্থা ও খাবার জল সরবরাহ ব্যবস্থা খুব কাছাকাছি। জল সরবরাহে চাপ কম থাকলে পাইপ বিজ্ঞানের নিয়মেই ঐ ময়লা জল টেনে নেয়।

জল জমে থাকা তাই কলকাতায় চলবেই। বিদেশী রিপোর্টেও বলা আছে, সল্ট লেক করবার জন্য উল্টাডাঙা, নারকেলডাঙা, বেলেঘাটার জল নিকাশী ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও এখন ভেঙে পড়েছে। ময়লা জল খাবার জল সব একাকার। ফলে আমাদের পানীয় জলের সমস্যার প্রধান কারণ হলো কলকাতা মহানগররী অপরিকল্পিত বিকাশ—তাতে জলদূষণ পরিবেশদূষণ—দুই-ই বাড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জল পরিকল্পনায় সঠিক ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্বাচন করা হচ্ছে না। যে সমস্ত বিভাগ থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে, তারা কেউই ভূতাত্ত্বিকদের পরামর্শ নেন না। বিশ-তিরিশ বছর আগে করা হতো। এখন কোনো বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া হয় না। অথচ সেনাবাহিনীতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া একটি টিউবওয়েলও বসানো হয় না। বিশেষজ্ঞদের মত নিলেই একমাত্র ভূগর্ভস্থ জলের স্বাস্থ্যকর প্রকৃত উৎস নির্বাচন করা সম্ভব। আমাদের এখানে কোনো স্তরেই তা করা হয় না।

এই সমস্যা ছাড়াও, আমাদের দেশে জল ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো আইন নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে তো বটেই, অন্যান্য সব দেশেই জল ব্যবহার সম্পর্কে, মাটি থেকে জল তোলা সম্পর্কে স্পষ্ট কড়া আইন আছে। আমাদের দেশে যেমন জমি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি জল ব্যবহার নিয়ে মামলা। সব জল সবাই ব্যবহার করতে পারে। ১৯৬৩ সাল থেকে এদেশে চেষ্টা হয়েছে, কোথাও কোনো টিউবওয়েল বসালে যেন জিওলজিক্যাল সার্ভে-তে তার খবর আসে। বিশেষজ্ঞরা সায় দিলে তবেই যেন সেই প্রকল্পে এগুনো হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। কারণ আজকে 'গ্রাউণ্ডওয়াটার ল' পাশ হলে একশ্রেণীর লোকের প্রচুর ক্ষতি হবে। সেই চক্র এই আইন পাশ করাতে দিচ্ছে না।

আইন না থাকলে কী হয় তার উদাহরণ—বি· বা· দী· বাগে এলাকো হাউস ও ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং এক পাঁচিলের এপার ওপার। দুদিকেই ছ'ইঞ্চি পাইপ ঢুকিয়ে মাটি থেকে জল টানা চলছে—ছ'গজ মাত্র তফাৎ। দুটোই নষ্ট হয়ে গেল। বহুতল বাড়িগুলোতে জল তুলবার ব্যাপারে কোনো নিয়ম নেই। এবং এটা কনকারেন্ট লিস্টে আছে—রাজ্য সরকারের একার দায়িত্ব এটা না, দিল্লি থেকে সবুজ সংকেত আসা চাই। আন্ত্রিক রোগও কিন্তু এই জল সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত।

১০০ ফুটের নীচে না গেলে জল জীবাণুমুক্ত হয় না। আমাদের কটা হ্যাণ্ড টিউবওয়েল ১০০ ফুট গভীর?

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১,৮০,০০০ অগভীর ও ৩,০০০ গভীর নলকূপ আছে। এই ১,৮০,০০০ এর অধিকাংশই ১০০ ফুট গভীরতায় নামে না। সবই ঐ ৮০-৯০ ফুট। অপরিকল্পিত নলকূপ বসানোর ফলে মাটির নীচে যেস্তরে জল পাওয়া যেত, সেই জলস্তর (level) নেমে যায়। আসল জলাধারে (main aquifer) কিন্তু জল আছে—কিন্তু কৃত্রিমভাবে ওপরের জলস্তর—যে 'লেভেলে' জল পাওয়া যায়—সেটা নামিয়ে আনা হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিরতি দিলেই আবার সেই জলস্তর কিন্তু উঠে আসে। এখন যতো বেশি অপরিকল্পিতভাবে নলকূপ ও পাম্প বসানো হবে, জলস্তর নেমে আবার স্বাভাবিক হতে ততো দেরি হবে। কলকাতাতেও তাই হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর

প্রথমে ১০ ফুট নীচ থেকেই জল পাওয়া যেত। সেটা এখন ২০ বা ৩০ ফুট। কিন্তু প্রধান ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলোয় জল কিন্তু শেষ হচ্ছে না। কয়েক প্রজন্মেও তা শেষ হবে না। শুধু জল তোলার এক পরিকল্পিত ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

এই অপরিকল্পিত জল তোলা সামাজিক অপরাধ।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, রিগ টিউবওয়েলের কথা—পাথর ফুঁড়ে জল বের করবার হুজুগ। পাথরের মাঝখানে ওপরের জলই জমা হয় এবং তা বিপজ্জনক। কিছুদিন জল তোলার পরই তা শেষ হয়ে যায়। অথচ পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে পাথর ফুঁড়ে হাজার হাজার রিগ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে—জলের কোনো হিসেব না করেই। এক একটি টিউবওয়েলের দাম ১৮-২০ হাজার টাকা। এই বিপজ্জনক অপচয়ের অর্থ কি। কিছুদিন বাদেই সব নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ কুয়ো খুঁড়লে এর চাইতে অনেক বেশি কাজে লাগে। অন্ধ্র, রাজস্থান, বিহারে, দুশো, আড়াইশো বছরের কুয়ো এখনও আছে। নালন্দাতে হাজার বছরের কুয়োও আছে।

খাবার জল যদি ফুটিয়েও খাওয়া হয়, আমাদের ধোপারা যেখানে কাপড় কাচে সে জলের দূষণ কল্পনাতীত, সেই জলের জন্যে আমাদের সারা গায়েই তো ডিসেন্ট্রি। আমাদের খাবারের মান ভাল। গ্রামের লোক খেতে না পেয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে মারা যায়। কলকাতার বস্তির ছেলে-মেয়েদের ডিসেন্ট্রি হচ্ছে। জল পরিকল্পনা শুধু শুদ্ধ খাবার জল সরবরাহ নয়।

আমাদের সংগঠন আছে। পরিকল্পনা আছে। কিন্তু রূপায়ণ নেই।

সুব্রত সিংহ, সুরজিৎ গুহ

> কলকাতার মাটির তলায় জলের কোনো অভাব নেই। হবেও না। কিন্তু মাটির ওপর চলছে জলের নৈরাজ্য।

কলকাতার জলের বিশুদ্ধতা হাকিমের রায় ও বিশেষজ্ঞের রায়

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা করপোরেশনের দায়িত্ব। জলবাহিত নানা ধরনের রোগ, বিশেষ করে আন্ত্রিক রোগ, কলকাতার প্রায় বাৎসরিক অভ্যাসে পরিণত। কলকাতাবাসীর দৈনিক প্রয়োজন ২৪০ মিলিয়ন গ্যালন বিশুদ্ধ পানীয় জল, করপোরেশন সরবরাহ করে ১৯৩ মিলিয়ন গ্যালন জল। এবং এই জলের বিশুদ্ধতা নিয়েও সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রশ্নোত্তরের পালা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। ১৯৮৩ সালের জুন মাসে সিটিজেন্স অ্যাডভাইস ব্যুরো (৭৩/১১ পাম অ্যাভিন্যিউ, কলকাতা-১৯) নামে একটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক এখনও অরেজিস্ট্রিকৃত সংস্থার পক্ষ থেকে গৌরকিশোর ঘোষ কলকাতাবাসীর বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের—কলকাতা করপোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকাল গভর্নমেন্ট ও আরবান ডেভলপমেন্ট বিভাগ এবং সি. এম. ডি এ'র, সেই ন্যায্য দাবি পূরণে অসতর্কতার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন।

কিন্তু এই মামলারও আগে ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি সি রায় ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনের ডঃ সুবীরকুমার দত্ত ও ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার পানীয় জলের ওপর একটি সমীক্ষা চালান। সেই সমীক্ষায় কলকাতা করপোরেশন নমুনা হিসেবে তালতলা, ঝামাপুকুর, এন্টালী, সি. আই. টি রোড, ল্যান্সডাউন এবং বেলেঘাটা অঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহ করে। পরীক্ষায় প্রামাণিত হয়—

১। বেলেঘাটা এবং ফুলবাগান অঞ্চলের পানীয় জলে প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৮ জার্ম কলিফর্ম আছে।

২। বেলেঘাটা এবং আরো অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে—(ক) পানীয় জল ভূগর্ভে মলনিকাশি জলের সাথে মিশছে; (খ) পানীয় জলে যথেষ্ট পরিমাণ ক্লোরিন দেওয়া হচ্ছে না;

৩। এই জল পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরো-র আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোর্ট মহানগরীর পানীয় জল পরীক্ষার জন্য অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ-এর এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশনের অধ্যাপক শ্রী কে. জে. নাথকে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেন। সারা শহরের ৫৫টি জায়গা, এমনকি হাইকোর্ট বার লাইব্রেরীর সভ্যদের জন্য নির্দিষ্ট পানীয় জলের আধার থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষান্তে অধ্যাপক নাথ যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দেখা গেছে শহরের বহু অঞ্চলেই এমন কি বার লাইব্রেরীর জলেও কলিফর্ম ও ফিকাল কলিফর্ম উভয়বিধ দূষণই বর্তমান। রায়ে বিচারপতি পি সি বড়ুয়া উল্টোডাঙা, নারকেলডাঙা, সত্য ডাক্তার রোড এবং হাইকোর্ট অঞ্চলের জল সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ জারি করেছেন। যদিও অধ্যাপক কে. জে. নাথের রিপোর্টে গ্যালিফ স্ট্রিট, ক্যানাল সার্কুলার রোড, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, হরিশ নিয়োগী রোড, ক্যানাল ইস্ট রোড, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, গোবিন্দ খাটিক রোড, ক্রিস্টোফার রোড, মদন

কলকাতা শহরের উত্তরদিকের জল খুব ভাল ও মাটির তলার সেই উৎস আমরা প্রায় ব্যবহারই করি নি।

চ্যাটার্জী লেন, এস. এস. কে. এম হাসপাতাল অঞ্চল, সূর্য সেন স্ট্রিট, গোলপার্ক, নিউ আলিপুর, চেতলা রোড, হেলেন কেলার সরনী, ময়ূরভঞ্জ রোড, রামকমল স্ট্রিট এবং অকল্যাণ্ড প্লেস বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের জলেও ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণিত বলে জানান হয়েছে। **হাইকোর্ট কলকাতা পুরসভাকে অধ্যাপক নাথের এই রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ নাগরিক সচেতনতার কারণেই প্রকাশের অনুমতি দিলেও এযাবৎ তা অপ্রকাশিতই রাখা হয়েছে।** বরং সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরোর তরফ থেকে অভিযোগ এসেছে, **অধ্যাপক নাথের রিপোর্ট পেশ করার পরই**

তা প্রকাশ করলে কলকাতায় সাম্প্রতিক আন্ত্রিক রোগের আক্রমণ অনেক সহজে ঠেকান যেত।

কিন্তু কলকাতা করপোরশনের অ্যাডমিনিসট্রেটর শ্রী অরুণ সেন এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, অধ্যাপক নাথ পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করেছেন ১৯৮৩ সালের অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাস নাগাদ। কিন্তু এ বছরের গোড়া থেকেই করপোরশনের জলে যথেষ্ট ক্লোরিন মেশান হচ্ছে। যেন, এ বছরের আগে কলকাতার পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখার দায়িত্ব করপোরশনের ছিল না। যেন, জলবাহিত রোগ শহরে ব্যাপক হারে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিলে তবেই পলতা-গার্ডেনরীচে ক্লোরিন মেশাতে হবে।

যদিও আমাদের আশংকা, করপোরেশনের জল সরবরাহ কেন্দ্রগুলোতে শোধন করার জন্য যে পরিমাণ ক্লোরিন জলে মেশান হয়, জলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। কলকাতার ভূগর্ভে দূষিত জল নিকাশি এবং মলনিকাশি পাইপগুলির অবস্থা প্রায় সমানই ভগ্নদশা। বয়স ঘটিত জীর্ণতা, রাস্তার ওপরে যানবাহনের প্রচণ্ড চাপ, কারণে অকারণে রাস্তায় খোঁড়া-খুঁড়ির ফলে মাটির তলার পাইপ লাইনে অনেক সময়েই ফুটো দেখা দেয়, ভেঙে যায়। কিন্তু সময়মত সেগুলোর মেরামতির ব্যবস্থা বেশিরভাগ সময়েই হয় না। ফলে বহু ক্ষেত্রেই মলনিকাশি ও জলসরবরাহের পাইপ ভেঙে আবর্জনা পানীয় জলে মিশে যায়। এর সাথে অনেক সময়ই হয়ত কলকাতার রাস্তায় জমা বর্ষার এক হাঁটু জল তো মিশছে। করপোরেশনের জল শোধন কেন্দ্রগুলোতে যে পরিমাণ ক্লোরিন দেওয়া হয় সরবরাহ পথে তারি সাথে এসে মেশা দূষিত জলের জীবাণুকে সেই অবশিষ্ট ক্লোরিন বিনষ্ট করতে পারে না। তাই করপোরেশনের ক্লোরিন মেশান জলেও, ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। যদিও চীফ এঞ্জিনিয়ার শ্রী বি. নন্দী এই আশংকার কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এই জীবাণু দূষণ যদিও বা ঘটে তার জন্য বাড়ির অভ্যন্তরের পুরোন ভাঙা পাইপ লাইন নয়ত অপরিচ্ছন্ন জলের ট্যাঙ্ক, যার রক্ষণাবেক্ষণ করপোরেশনের দায়িত্ব নয়। যদিও অধ্যাপক নাথের পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত করপোরেশন পানীয় জলের নমুনা বহুক্ষেত্রেই কলকাতার রাস্তায় সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট কলের জল থেকেই নেওয়া যার দায়িত্ব একান্তভাবেই করপোরেশনের কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, এমন কি সে জল কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীর।

১৯৫১ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ২৬৯ ধারা অনুযায়ী করপোরেশনের সরবরাহকৃত পানীয় জলের বিশুদ্ধতার মান যথাযথ বজায় থাকছে কিনা, প্রতি সপ্তাহে এটি পরীক্ষা করা করপোরশনেরই দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্বেরজন্যনির্দিষ্ট বিভাগের কাজের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে, এই বিভাগের কর্মী সংখ্যা সম্পর্কে করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কোন সুনির্দিষ্ট জবাব আমাদের দেন নি। উত্তরদানে তাদের এই অস্পষ্টতা নেতিবাচক উত্তরেরই সমার্থক। করপোরেশন কর্তৃপক্ষ জলের বিশুদ্ধতা যতই জোর গলায় প্রচার করুন না কেন, কলকাতায় জলবাহিত রোগের ধারাবাহিক আক্রমণ এবং বিগত দু-তিন বছর ধরে বিশেষজ্ঞদের নানা সমীক্ষার ফলাফল এর বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই দেবে।

অজেয়া সরকার

কলকাতার জলসরবরাহের চেহারা ও চরিত্র

কলকাতার জল-যোগানের প্রধান উৎস দুটি, হুগলি নদীর জল এবং মাটির তলার জল। হুগলি নদীর জল জমানোর ও শোধন কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার ২২ কিলোমিটার দূরের গ্রাম পলতাকে বাছাই করা হয়—১৮৬৫ সালে। তখন হুগলি নদীর জলে লবনত্ব খুব বেশি ছিল না। উপরিতলের পরিষ্কার জলপ্রবাহ না পাবার জন্য ১৯৩৬ সাল থেকে পলতা জলকেন্দ্রের জমানো জলে লবনত্ব বাড়তে থাকে। পলতা জলকেন্দ্র ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কলকাতা শহরকে প্রতিদিন প্রায় ৮৪ মিলিয়ন গ্যালন শোধিত জল যুগিয়েছে।

পলতায় হুগলি নদীর জল প্রথমে পাম্প করে তোলা হয় থিতানোর জন্য নির্মিত ৪ টি প্রাথমিক জলাধারে, যার নাম পাকা জলাধার। এই জলাধারে ১৮ ঘণ্টা ধরে অপরিশোধিত জল থিতানো হয়। প্রাথমিকভাবে থিতানো ঐ জল

পুনরায় পরিশ্রুত করা হয় বিশাল কাঁচা জলাধারে যার জল ধারণক্ষমতা ২০০ মিলিয়ান গ্যালন প্রতিদিন। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে বর্ষা সময়েই কেবল অপরিশোধিত জলে ফিটকিরি মিশিয়ে শোধন করা হয় পলতার জলপ্রকল্পে আছে ৩ শ্রেণীর ৯৯ টি ধীরগতি-বালি ফিল্টার। এই ফিল্টার গুলোতে থিতানো জল পরিশ্রুত করা হয়। এবং উপযুক্ত ক্লোরিন ব্যবহারে শোধণ করে তা পাঠানো হয় টালার জলাধারে। এরপর টালা থেকে জমানো জল যোগান যায় কলকাতাবাসীর নাগালে।

পলতার জলপ্রকল্প বিশেষ করে গরমের মাসগুলোতে স্বাভাবিক কিছু শোধন সমস্যায় পড়ে। কারণ এই সময়ে হুগলির জলে লবনের ভাগ সর্বোচ্চ মাত্রায় (২৫০০ মি:গ্রাম প্রতি লিটারে) পৌছায়। এছাড়া নদীর জলের ধারা এসময় অনেক নীচে নেমে যায় বলে অপরিশোধিত জল পাম্প করে তোলার সময়ও সীমিত হয়ে যায়। গরমে জলে লবন সর্বাধিক হবার সুযোগ সামুদ্রিক দ্বিকোষী জীবাণু (beivaves) বংশ বিস্তার করে পলতার বিভিন্ন ফিল্টারের পার্শ্বদেয়ালে জমে গিয়ে এক সমস্যা তৈরি করে। এছাড়া গরমে অপরিশোধিত জলে কাদা, ক্ষার, খরতা ইত্যাদির আধিক্যে মরসুমি এবং দৈনন্দিন পরিবর্তন ঘটে। অথচ গরমেই পলতায় ছোট ফিল্টার ব্যবহার হয় এবং চাহিদা বেশি থাকা সত্ত্বেও

কলকাতার পুবে সল্ট লেক হওয়ায় শহরের দূষিত জল বেরবার পথ পায় না--মাটির তলায় চুঁইয়ে গিয়ে ঠিক ওপরের জলটাকে দূষিত করে রাখে।
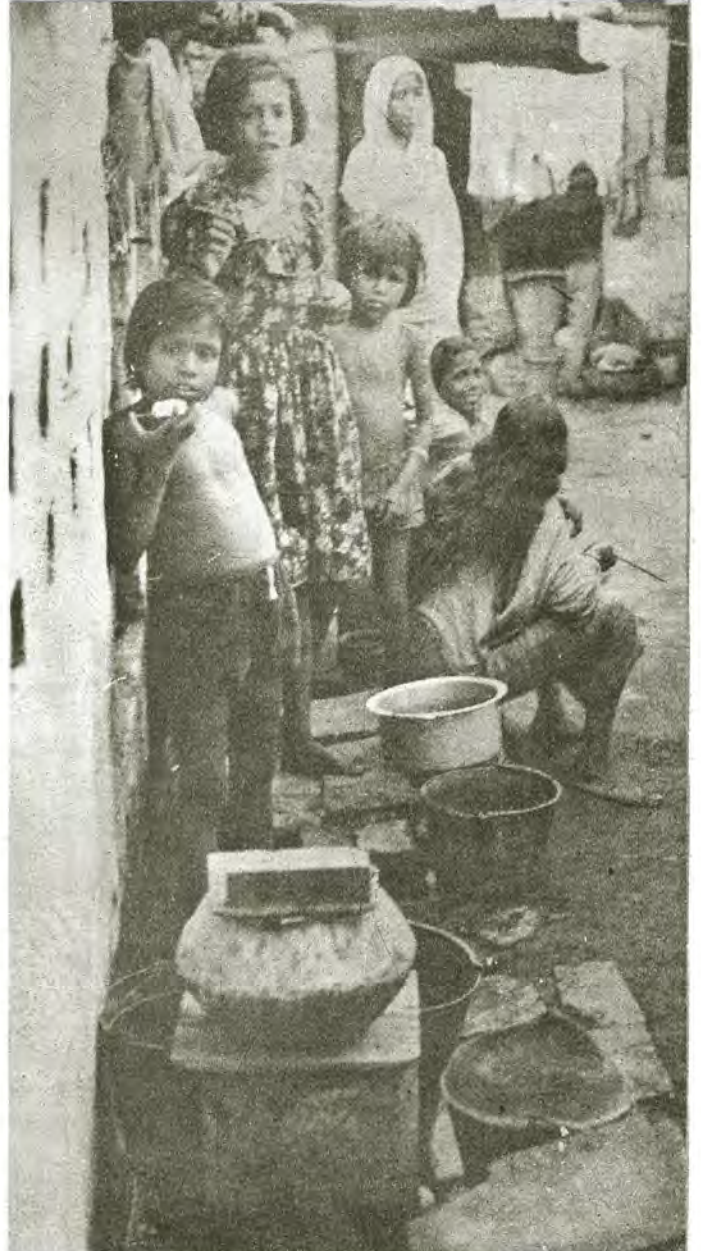
কলকাতার শহরে ডিপ টিউব ওয়েল খুঁড়তে কারো অনুমতির প্রয়োজন হত না। তাই যত্রতত্র আকাশ ছোঁয়া বাড়ি উঠেছে আর পাতাল ফুঁড়ে জল তোলা হচ্ছে।

জলসরবরাহ কমানো হয়। অবশ্য গবেষণায় এটা পরিষ্কার যে পরিস্রুত জলে ক্লোরিন মিশিয়ে দিলে রোগ সৃষ্টিকারি চরিত্রের কোন ব্যাকটেরিয়া আর থাকতে পারে না।

শহরের আরো প্রয়োজন মেটাতে পলতার নতুন ইউনিটে প্রতিদিন ৬০ মিলিয়ান গ্যালন জলশোধন ব্যবস্থা হল। নতুন ঐ ইউনিটে বালি, পশম ইত্যাদি দ্রুত শোধন ব্যবস্থার আধুনিক সুযোগ রাখা হল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ৪টি প্রধান ট্রান্স মিটারের সাহায্যে পলতার বিশুদ্ধ জল টালার জলাধারে পাঠানো হয়। টালা জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ৩৪ মিলিয়ান গ্যালন। এবং এই টালা-ই কলকাতার জল বিতরণের প্রধান কেন্দ্র। কলকাতার জল বিতরণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ পাঁচটি এলাকায় খণ্ডিত। এই পাঁচটি এলাকার কেন্দ্রের সঙ্গে টালার সরাসরি যোগাযোগ রাখা হয়েছে। কলকাতায় পলতার বিশুদ্ধ জল সরবরাহের সঙ্গে আছে সংযুক্ত পাতাল-জল সরবরাহের ব্যবস্থা। এজন্য প্রায় ১১৪টি বৃহৎ আকারের টিউবওয়েল টালার জলবিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে রাখা হয়েছে। তবুও কলকাতায় জলের যোগান যথেষ্ট নয়। মাঝে মাঝেই তাই শহরের জল সরবরাহ থেমে যায়।

১৯৬৮ সালে কলকাতার জল বিতরণ ব্যবস্থায় জলের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত গুণাগুণ-এর সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাত্র ১০% নমুনা জলে অতিরিক্ত ক্লোরিন আছে। এবং ৪০% নমুনা জলে আছে দূষনের প্রমাণ। জলবিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ঐ সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, কলকাতার ৮০টি ওয়ার্ডের ১২টি ওয়ার্ডে জলের গুণাগুণ অত্যন্ত খারাপ, ৭ টি ওয়ার্ডের গুণাগুণ সন্দেহজনক, এবং মাত্র ৬১ টি ওয়ার্ডে জলের গুণাগুণ সন্তোষজনক। এই সমীক্ষা নির্দেশ করে যে, শহরের জলসরবরাহ ব্যবস্থার উপযুক্ত সংরক্ষণ দরকার। জল বিতরণের পাইপ থেকে এজন্য ঘন ঘন জলের নমুণা নিয়ে তা বিশ্লেষণ করা উচিত। জল বিতরণ ব্যবস্থার পাইপে ফাটল থাকলে বিশুদ্ধ জল দুষিত হয়ে যায় যার অনিবার্য ফল জল বাহিত মহামারী। পলতার পরিশোধিত জল নিরাপদ ঠিকই, তবুও ঐ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহারকারীদের ট্যাপ ও অতিরিক্ত ক্লোরিন-অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার।

বিভিন্ন বড় আকারের টিউবওয়েল প্রতিদিন ২০ মিলিয়ান গ্যালন জল মাটির গভীর থেকে তুলে দিয়ে কলকাতার জল-যোগান ব্যবস্থাকে সাহায্য করে। পাতাল-এর জল সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়াং বলে এই জলে আর কোন শোধন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তবে কলকাতা অঞ্চলের টিউব ওয়েলের জলে বিভিন্ন ধরণের খরতা ক্লোরাইড এবং আয়রন পাওয়া যায়। কোন কোন টিউব ওয়েলে আয়রনএর ভাগ অত্যন্ত বেশি (৫ মি: গ্রা: প্রতি লিটারে)। এই টিউবওয়েলগুলি থেকে পাওয়া জলের সাধারণ ধর্ম আয়রণ ব্যাকটেরিয়া উপস্থিতি যা জল বিতরণ পাইপগুলির মধ্যে দ্রুত সংখ্যা বাড়িয়ে পাইপগুলোর গায়ে আটকে থাকে এবং জলবহন ক্ষমতা কমিয়া ফেলে—শেষপর্যন্ত জলের পাইপগুলি হয়ে ওঠে ভঙ্গুর। ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারে আয়রণ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার সহজ পদ্ধতি আমাদের জানা আছে, তাই যেখানে দরকার এই পদ্ধতি ব্যবহার করা জরুরি। এতে করে পাতাল-জল সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এখানে বলে রাখা ভাল, যে, কলকাতায় পলতা ও পাতাল-জলের সরবরাহ থেকে প্রতিদিন মাথাপিছু ৪০ গ্যালন জল ব্যবহার হয়।

এছাড়া, মল্লিকঘাট এবং ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন থেকে অপরিশোধিত হুগলী নদীর জল রাস্তাঘাট ও নর্দমা ধোয়ার কাজে আলাদা বিতরণ ব্যবস্থায় যোগানো হয়। কিন্তু ঐ জল বস্তিবাসী ও কলকাতার পথচারী মানুষরা শরীর ও জামাকাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহার করে। অপরিশোধিত জলের এই বিভিন্ন মুখী ব্যবহারে গ্যাস্ট্রো ইনটেসটিন্যাল অসুখ (আন্ত্রিক রোগ) সৃষ্টি হয়। ত্রুটিপূর্ণ বিতরণ ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ জলের মাত্রারিক্ত অপচয় বিশুদ্ধজলের যোগানকে অপর্যাপ্ত করে তোলে এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা থামিয়ে দেয়। তখন কিছু সংখ্যক মানুষ নোংরা পুকুর ও ডোবার জল ব্যবহার করে যেগুলি কলেরা ইত্যাদি রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুতে দুষিত।

ড: এ. কে. বসু, আর-এর ধনেশ্বর ও সি· এস· জি· রাও·—এর পরীক্ষার ফল

ফটো : অজয়, দে
শুভাশীষ ব্যানার্জী

কৌশিক : একটি নির্ধারিত ও অ

সাউথ পয়েন্ট কলকাতার একটি ভাল স্কুল—প্রায় সবচেয়ে ভাল স্কুলগুলির একটি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাউথ পয়েন্ট অনেক দিন ধরেই নিয়মিত ভাল রেজাল্ট করে আসছে। সাউথ পয়েন্টের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধ্যাপনার সুনাম আছে। আমরা জানি, একটি স্কুলের সুনাম রক্ষা করা কত কঠিন। স্কুলের স্বার্থেই ছেলেদের ওপর পড়াশোনার চাপ রাখতে হয়। ছেলে বাছাই করতে হয়। পড়াশোনার চাপের জন্যে প্রশ্নও কঠিন করতে হয়। ভাল স্কুল চাই, অথচ এগুলো চাই না—এটা প্রায় সোনার পাথর বাটি চাওয়ার মত।

কৌশিক সাউথ পয়েন্টের ক্লাশ ইলেভেনের ছাত্র ছিল। তার মাত্র একটি বিষয়ে পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় সে ভয় পায় তাকে স্কুল ছাড়তে হবে। সেই লজ্জার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সে আত্মহত্যা করেছে। স্কুল নিশ্চয়ই চায় নি, তাদের কোনো ছাত্রের জীবন এভাবে শেষ হয়ে যাক। কিন্তু এ মৃত্যু যেন ছিল পূর্বনির্ধারিত, স্কুলের চাওয়া-না-চাওয়া নিরপেক্ষ।

পণ্ডিতিয়া রোডের ঋতা ঘোষাল ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আমাদের সব বাড়িতেই ছেলেমেয়েদের যেভাবে পড়াশোনার তাড়া দেয়া হয়—ঋতার মা সেভাবেই ঋতাকে পড়ার তাগাদা দিয়েছিলেন। সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়ার কথাতে যেমন বিরক্ত হয়—ঋতাও নিশ্চয়ই সেভাবেই বিরক্ত হয়ে থাকবে। বিরক্ত হয়ে সে লেকে চলে যায়। যেখানে মরার ইচ্ছাতেই ডোবে ও ডুবেই মারা যায়।

ঋতার মা নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন নি ঋতা মারা যাবে। কিন্তু এ মৃত্যুও যেন ছিল পূর্বনির্ধারিত—বাবা বা মায়ের চাওয়া-না-চাওয়া নিরপেক্ষ।

গত তিরিশ বছরের "শিক্ষা-ব্যবস্থায়" আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কোনো শিক্ষার খোলা হাওয়ায় ছেড়ে দিই নি, কোনো শিক্ষার আদিগন্ত প্রান্তরে মুক্তি দিই নি। পরিবর্তে, আমরা প্রায় নিশ্ছিদ্র একটি 'ব্যবস্থা' গড়ে তুলেছি। সেই 'ব্যবস্থা'য় আমাদের ছেলেমেয়েদের শুধুই পরীক্ষা দিতে হবে—মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পর···। আমাদের ছেলেমেয়েদের শুধুই নম্বর পেয়ে যেতে হবে—লেটারের পর স্টার, স্টারের পর প্ল্যানেট···। কোনো পরীক্ষায় কোনো নম্বরই আমাদের এই হতভাগ্য সন্তানদের পক্ষে যথেষ্ট নয়—'মাধ্যমিকে ত সবাই ফার্স্ট ডিভিশন পায়, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে ?' 'উচ্চ মাধ্যমিক ত কত ছেলেই পাশ করে কিন্তু জয়েন্ট এন্ট্রান্স'।

এমন গত্যন্তরহীন ভাবে চূড়ান্ত ভাল ফল করার দায়বদ্ধ একটি চোদ্দ-পনের-ষোল-সতের বছরের কিশোর তার ক্ষমতার দৌড় আর সীমা মাপবে কী দিয়ে ? একমাত্র, পরীক্ষার ফল দিয়ে। তাই এই আত্মঘাতী দৌড় তাকে দৌড়তেই হবে। তার দম যদি আটকে আসে, তাও তাকে দৌড়তে হবে। সে যদি দৌড়তে দৌড়তে পড়ে মারা যায়, তাও তাকে দৌড়তে হবে। এই নিরবচ্ছিন্ন দৌড়ে তার পতন অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, পূর্বনির্ধারিত। কৌশিকও দৌড়চ্ছিল। সে তার সামনের সেই নির্ধারিত 'পতন' দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিজেই সে নিজের 'পতন' বেছে নিল।

সব 'নিশ্ছিদ্র' ব্যবস্থাতেই গভীর রাতে সাপ-ঢোকার মত ছোট একটা ফুটো সবার অজ্ঞাতে কোথাও থেকে যায়। সেই পথে সর্পাঘাতে লখিন্দর মারা যায়। কৌশিক-ঋতা—এরা আমাদেরই তৈরি এই নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার শিকার।

দোষ দেব কাকে ? সাউথ পয়েন্ট স্কুলের পড়াশোনার ব্যবস্থাকে ? আমরাই ত আমাদের সাবেকি ব্যবস্থা বাতিল করে এই ব্যবস্থা গড়েতুলেছি আর এই স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার জন্যে রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়েছি—দারোয়ানের কাছ থেকে ফর্ম নিতে।

কলকাতা শহরে সাউথ পয়েন্টতুল্য অভিজাত স্কুলই ত গত কয়েক দশকে মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের প্রধান কীর্তি। সাউথ পয়েন্ট তুল্য আরেকটি স্কুলে কি আর-একজন কৌশিক এই মুহূর্তে তার হাফ-ইয়ারলি বা অ্যানুয়্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে না ?

দোষ দেব কাকে ? সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষক আশুবাবু আর অঞ্জনবাবুকে ? শিক্ষক হিশেবে দু জনই আদর্শনিষ্ঠ, ছাত্রবৎসল, পরিশ্রমী। বহু ভাল ছাত্র তৈরি করার কৃতিত্ব তাঁদের আছে। স্কুলের ভাল ফল দেখাবার দায়িত্বও তাঁদের আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কোনো ঠাট্টা, কোনো তিরস্কার—নরম মনের কোনো ছেলেকে আঘাত দিয়ে থাকতে পরে, পরন্তু যখন সেই ছেলেটি হয়ত মনের গভীরে নিজেকে নিয়েই বিব্রত।

দোষ দেব কাকে ? কৌশিকের মা, বাবা, আত্মীয়স্বজনকে ? ঋতার মাকে ? তাঁরাও ত কেউ কোনো অপরাধ করেন নি ?

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অভিভাবক-অভিভাবিকারা বিক্ষোভ করেছিলেন কার বিরুদ্ধে ? কঠিন প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে ? তাঁরা ত সেই জন্যেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ওরকম ইস্কুলে

...নক সম্ভাব্য মৃত্যুর বিবরণ

অশোক কুমার কুণ্ডু
কিন্নর রায়

ভর্তি করে থাকেন ? শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ? কিন্তু ঐ শিক্ষকরাই ত তাঁদের গৌরব ছিল এতদিন ?

তা হলে ?

আমরা কি আমাদের সন্তানদের অভিমন্যুর ব্যূহে ঢুকিয়ে, নিজেরাই তাদের ঘিরে ধরছি। ঘিরে ধরছি এবং মারছি ?

কলকাতা জুড়ে সকাল সাতটা থেকে স্কুলের বাসগুলো বাচ্চাদের নিয়ে, ছোটদের নিয়ে, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ছুটে যায়। কৌশিকের এমন নীরব, গোপন, প্রস্থানের পর সেই সব বাসের দিকে তাকিয়ে কি আমরা এখনো আঁতকে উঠব না—আমার শিশুটি ঘরে ফিরবে ত ? ঘরে ফিরে ঘরে থাকবে ত ?

কৌশিক ও তার স্কুল

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ক্লাশ ইলেভেনের ছাত্র কৌশিক ব্যানার্জির আত্মহত্যার সূত্রে প্রথমেই হাজির হয়েছিলাম সাউথ পয়েন্ট স্কুলে।

রাস্তার ওপর দাঁড়ানো বিশাল কম্পাউণ্ড সমেত বিরাট বাড়িটার গায়ে লাগানো উড়ন্ত পাখির গায়ে তখন মাঝ বেলার রোদ ছড়িয়ে গেছে। ভারি লোহার গেটের পেছনে খাকি উর্দি পরা দারোয়ানের মুখ পাথর-পাথর,. ভাবলেশ হীন। তোতাপাখির মতো একটা কথাই দম না নিয়ে আউড়ে যায়, প্রিন্সিপাল সাহাব কলকাত্তাকা বাহার, রেক্টর সাহাব বাহার, ভাইস প্রিন্সিপালকে মিলতে চাইলে, কাল এগারো বাজে আসুন। সন্দিগ্ধ, ভেতর দেখার চেষ্টা করা চাউনি। প্রেসের লোক বলাতে কথার ঝাঁঝ সামান্য কমে, থিতিয়ে যাওয়া একটা ভাব ছড়ায় মুখের ওপর।

একটু কষ্ট খরে ঠিকানা খুঁজে চেনাজানা একজনের বাড়ি এসে কড়া নাড়ি। দোতলা থেকে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে তিনি নামেন। 'প্রেস থেকে আসছি' এবং নমস্কার বিনিময় হয় একই সঙ্গে। কৌশিকের ব্যাপারে প্রশ্ন ছুঁড়তেই তাঁর পরিষ্কার জবাব—এ নিয়ে প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল ছাড়া কারোরই মুখ খোলা বারণ। তাঁর মুখ থেকেই প্রথম শুনি, অনেক ভুলভাল খবর ছাপা হচ্ছে দৈনিকগুলোতে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্ররা যথেষ্ট ভালো এবং ভদ্র। বিক্ষোভ তারা দেখিয়েছে ঠিকই, তবে তা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে। কোনো বোমা পড়েনি। ফিজিক্সের শিক্ষক অঞ্জন দাশগুপ্ত বা অঙ্কের শিক্ষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কেউ চলে যেতে বলে নি। আর অঞ্জনবাবু এবং আশুবাবু দু জনেই বহুদিন শিক্ষকতা লাইনে আছেন। ছাত্রদের তাঁরা ভালোবাসেন, তৈরি করে নিতে চান। বিশেষ করে অঞ্জনবাবুর তো তুলনাই নেই, ব্যাচিলার মানুষ! এসব নিয়েই থাকেন।

১৬ মে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে। আমরা খবর নিয়ে জেনেছি রেকটর সতীকান্ত গুহ এবং প্রিন্সিপাল ইন্দ্রনাথ গুহ দুজনেই কলকাতার বাইরে। কৌশিকের ব্যাপারে কথা বলার এক্তিয়ার ভুক্ত সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল মালতী সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে কথা পরে।

আবার সেই কথায় ফিরে আসি, তিনি স্বীকার করলেন, ওয়েস্টবেঙ্গল কাউন্সিলের যে সিলেবাস, তা ১৩ মাস কেন, ৩৩ মাসেও শেষ করা যায় না। ছাত্রদের ওপর ক্রমশই বোঝা চাপে। যত ওপর দিকে, উঁচু ক্লাসে তারা ওঠে, তত কমপিটিশন, রেষারেষি, আর তারপরেই প্রবল হতাশা এবং কখনও কখনও সুইসাইড। এই অদ্ভুত ঘোড়দৌড়ে জড়িয়ে পড়েন অভিভাবকেরাও। তাছাড়া ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ডের সিলেবাস ভারি হচ্ছে ক্রমেই। দিল্লি বোর্ডের কোনো ছাত্র কলকাতায় ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ডের আওতায় পড়তে এলে তার সমস্ত নাম্বার থেকে শতকরা ১৫ নম্বর বাদ দিয়ে হিসেব ধরা হয়।

ওখান থেকে খুঁজতে-খুঁজতে হাজির সাউথ পয়েন্টের ফিজিক্সের মাস্টারমশাই অঞ্জন দাশগুপ্তর বাড়ি। অঞ্জনবাবুর ওখানে যাওয়ার কারণ, ফিজিক্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র শক্ত হয়েছে, এই অভিযোগ সব চাইতে বেশি।

বালিগঞ্জ প্লেসে 'ফ্ল্যাশ' নামে একটি ইলেকট্রিকের দোকান। তার প্রায় গায়েই শ্রীরামভবন, ঠিকানা ৮৭ বালীগঞ্জ প্লেস। বেশ পুরনো ধরনের বাড়ি। সামনে জায়গা ছাড়া। গাছ-গাছালি। মাটিতে ঝরা ফুল এবং পাখির ডাক। সামনের ঘরে টেলিফোন আগলানো তিনজন মানুষ। তাঁদের অঞ্জনবাবুর কথা জিজ্ঞেস করতেই বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছন দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু এগিয়ে বারান্দা। সেখানে কাঠের রথ। তার ভেতর রাম ঠাকুরের ছবি। সিঁড়ি উঠেছে দোতলায়। নিচ থেকে অঞ্জনবাবুর নাম ধরে ডাক দিতেই সাড়া মিলল। অর্ধেক সিঁড়ি নেমে 'আপনারা কারা'—এই প্রশ্ন করার পর 'প্রেসের লোক', শোনা মাত্রই একটু থেমে বললেন, ওপরে আসুন। ওঁর পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। সিঁড়ি যেখানে বাঁক নিল দোতলার দিকে সেই দেয়ালে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে এবং কালীয়দমন করা কৃষ্ণের মূর্তি। দোতলায় গাদা গাদা বৈষ্ণব গুরুদের কাঁচ বাঁধানো ঢাউস ঢাউস ছবি। বসার একটি জায়গা।

অঞ্জনবাবুর পরনে শার্ট ও পাজামা। কপাল ঢাকা চুলে। ফিজিক্সের প্রশ্ন শক্ত হয়েছে কিনা, প্রশ্ন করতেই বললেন, যা বলার বলবেন, প্রিন্সিপাল কিংবা ভাইস প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপাল কলকাতায় নেই। ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কাল সকাল এগারোটার পর স্কুলে গিয়ে। আমার বলার কোনো এক্তিয়ার নেই।

অঞ্জনবাবু জানালেন, তিনি ১৭ বছর পড়াচ্ছেন, সাউথ পয়েন্টে। নিজে পাশ করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে। কৌশিকের বাড়ির ঠিকানা বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানার জন্যে তিনি দেখিয়ে দিলেন সাউথ পয়েন্টের রেজিস্টার। পরে খবর নিয়ে জেনেছি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও কলকাতার বাইরে

২৪ মার্চ সকাল এগারোটায় সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ঢুকতে মুখোমুখি হতে হয়েছে. একগাদা জেরার। আবার সেই খাকি উর্দির দারোয়ান। গেট অল্প ফাঁক করে—অফিসে কেয়ার-টেকার ছাড়া কেউ নেই বলে। আশ্চর্য পাথুরে মুখ।

মালতী সেনগুপ্ত তখনও আসেন নি। অফিস কেয়ার-টেকার এবং দারোয়ান পিয়নদের সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু চাউনি। আধ-বন্ধ-শাটার-দরজা প্রায় মাথা ছোঁয় ছোঁয়। মালতীসেনগুপ্ত আসবেন কি, আসবেন না, এই নিয়ে কিছু কথার প্যাঁচ। চোখে চোখে কথা হয়। আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও কিছু আমতা আমতা।

১৫৮/৪ প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে মালতী সেনগুপ্তর বাড়িতে (ফোন নম্বর—৪৬-১৫৬৮) ফোন করেন সাউথ পয়েন্টেরই একজন কর্মী। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা। শোনা যায়, মালতী দেবী এখন পুজোয় বসেছেন। তিনি একঘণ্টা পরে বেরবেন। আজ ফিরবেন কিনা জানা যাচ্ছে না। মালতী দেবীর সঙ্গে হাজার চেষ্টা করেও পরে আর যোগাযোগ করা যায় নি। কেয়ার-টেকার কিংবা অফিসে বসা কেউ কোনো প্রশ্নেই মুখ খুলতে নারাজ। ১ তারিখ (জুনের) গুহ-সাহাব ফিরবেন, তারপর আসুন।

আগে সাউথ পয়েন্টে পড়তেন। এখন আশুতোষ কলেজে। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েও জায়গা হয়নি। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে একটা অদ্ভুত পরীক্ষার নিয়মের কথা শোনা গেল সেই ছেলেটির কাছে। মাধ্যমিক পাশ করার পর সাউথ পয়েন্ট স্কুলে দুটো পরীক্ষা হয়। হাফ ইয়ার্লি আর

কৌশিকের কবিতার কপি [ওষুধের প্যাডে লেখা]

I, the dictator of myself,
have given me the death sentence.

The peacocks are tired, they fade out
The orchestra singer there, fall singing ;
The white gardenia splendours fade to yellow
As it seems to me, hail life I'm going.

I came here with a great deal of hope
But as days passed my candid hopes fade
And at this stage there's only one way for me,
I wish now only to be dead.

I pay my best tributes to all I know
Specially to my friends and parents
But remember let me have a smooth journey to the death
I, my own dictator have announced my death sentence

Sd/-

CETRAMYCETIN

ফাইনাল। মাধ্যমিকে যতই নম্বর পাক না ছাত্রটি, তা স্বীকার করেনা স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওই দুটি পরীক্ষায় অবশ্যই শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পেতে হবে, আর সায়ান্স সাবজেক্টে ৩০০ নম্বরের মধ্যে ২০০। কোটার নম্বর কমলেই ছাত্রকে বলা হয়, সায়ান্স সাবজেক্ট ছেড়ে ভূগোল বা ইতিহাস নাও। একথা অবশ্যই ঘুরিয়ে টি· সি· নিতে বলার সামিল। এতদিন সায়ান্স পড়ে একটি ছেলে ভূগোল বা ইতিহাস কেন পড়বে ? আর এভাবেই বদল হয় স্কুল। স্বপ্নের ছেঁড়া তার হাতে, হতাশ কোনো কিশোর এমনি করেই সাউথ পয়েন্টের গেট নতমস্তকে পেরিয়ে আসে, চিরদিনের জন্যে। তার লম্বা ছায়া ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায় দূরে।

অভিযোগ আছে, সাউথ পয়েন্ট এবং আরও এই ধরনের কোনো কোনো স্কুলে 'ভালো ছেলে', 'খারাপ ছেলে' এই দু ধরনের জার্সি পরিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ ছাত্রদের। শেখানো হয় পরস্পরকে ঘৃণা করতে। তৈরি হয় নতুন এক ধরনের 'ক্লাস'।

রূপকথার সুয়োরানি এবং দুয়োরানির ছেলেদের মতোই এদের প্রতি ব্যবহার আসে নেমে। মাস্টারমশাইরাও 'টিজ' করেন এমন অভিযোগ আছে। তার ফলে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয় ছাত্ররা। হতাশা গাঢ় হয় আরও।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্র এবং অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ, বিশাল কোচিং র‍্যাকেট চালান কোনো কোনো মাস্টারমশাই। সেইসব চিহ্নিত কোচিংয়ে পড়লে মাধ্যমিক পাশ করার পর দুটি স্কুল-পরীক্ষার বৈতরণী সহজেই পেরনো যায়। যেসব ছাত্র কোচিং-এর আশীর্বাদপুষ্ট, তাদের কোনো সমস্যাই নেই। বাকিরা 'হেরো'র দলে। তাদের ভাগ্যে তখন অহেতুক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। যার নিট ফল কৌশিকের মতো ছেলেদের আত্মহত্যা।

কৌশিক ও তার বাড়ি

বিজয়গড়ে পল্লীশ্রী মোড়ে নেমে ডান ফুট ধরে নাক বরাবর হাঁটলে ঐ ফুটে পড়বে কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ডান হাতে রেখে হাঁটলে কালীমন্দির। ওরই কাছে কৌশিকদের নতুন বাড়ি। বাড়ির কিছুটা অংশের কাজ এখনও বাকি। কৌশিক ওর বাবা মার একমাত্র সন্তান। ওর বাবা সূর্যনারায়ণবাবুর কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা। মা কমলাদেবী মহাকরণের আইন বিভাগের চাকুরে। কৌশিক 'ইনট্রোভার্ট' টাইপের ছেলে। খুব বেশি বন্ধু-বান্ধব নেই। পড়াশোনা নিয়েই দিনরাত। স্কুলের পড়াশোনা ছাড়া সে অন্যান্য বইই পড়ত বেশি। সংসারে বাবার সঙ্গেই তার বেশি কথাবার্তা। বাবা ছিলেন কৌশিকের বন্ধুর মতো।

কৌশিক বরাবর সাউথ পয়েন্টে পড়ত। মাধ্যমিকে সে ৬৪তম হয়, মোট নম্বর ৯০০-র মধ্যে ৭২৫ পায়। দুটি বিষয়ে লেটার। অঙ্কে পায় ৯২ এবং বাংলায় ৭৬।

কৌশিকের বাবার আয় ৫০০ টাকার বেশি হওয়ায় ওকে জাতীয় বৃত্তি দেওয়া হয়নি কিন্তু মেধা সার্টিফিকেট ও জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

সাউথ পয়েন্টে উচ্চ মাধ্যমিকে কৌশিক কিন্তু ভর্তি হতে চায়নি। তবুও কিছুটা বাবা মার ইচ্ছাতেই ও ভর্তি হয়। মনের ভেতর ভয় ছিলো যে স্কুলের হাফ ইয়ারলি ও ফাইন্যাল পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হলে স্কুল ছাড়তে হবে।

ছাত্র হিসেবে কৌশিক সাধারণ মেধার নয়। সে প্রমাণ তার মাধ্যমিকের রেজাল্ট। পড়াশোনা নিয়ে সে এত বেশি আগ্রহ দেখাত যে বাবা মা কোন দিনই তার খারাপ রেজাল্ট হবে এমন ভাবতেন না। স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে কৌশিক ভালো ফল করতে পারেনি। ফলে নার্ভের ওপর একটা চাপ ছিলো। আর ফাইন্যালে ফিজিক্স পরীক্ষা দেবার পর তার মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। যদিও তার লক্ষণ বাহ্যিক ভাবে এমন কিছু প্রকাশিত হয়নি। বরং ওকে সাহস দেবার জন্যে বাবা বলেছিলেন 'কি আছে, সাউথ পয়েন্ট থেকে টি· সি· দিলে অন্য কোথাও ভর্তি হবি'।

ফিজিক্স পরীক্ষা দিতে যাবার আগের দিন সে মাকে বলে 'মা এবার একবার মামার কাছে যেতে হবে'। কৌশিকের মামা ডঃ শান্তিরঞ্জন গাঙ্গুলি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের রীডার। কৌশিক অঙ্কের জন্যে ওর মামীমা গোখেলের অঙ্কের শিক্ষিকা শোভা গাঙ্গুলীর কাছে সাহায্য নিতো।

বিচিত্র বই পড়তো কৌশিক। রূপকথার বই দেখলাম টেবিলে। দেখলাম পুশকিনের গল্পের বই। আবার জানলাম ও নাকি প্রতিদিন কিছুটা সময় গীতা ও বাইবেল পড়তো। সব মিলিয়ে ও বারো চোদ্দ ঘণ্টা পড়ত। তারমধ্যে ঘণ্টা পাঁচেক সাহিত্য ও অন্যান্য বই পড়ত। অরিগেমি বানানো ওর একটা প্রিয় হবি ছিল। ওর বাবা আমাকে দেখালেন বিভিন্ন কাগজ কেটে বানানো টেনসিল ও অন্যান্য নকসা। সিগারেট প্যাকেট দিয়ে বানানো নানান খেলনা, জন্তু, কাপ-ডিস।

ওর পড়াশোনার ধরনটাও ছিলো কিছু বিচিত্র। বিভিন্ন ডায়েরীর (একই বছরের একাধিক ডায়েরী) পাতায় বিভিন্ন বিষয়ের পয়েন্ট লিখে রাখত। পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েই পড়া করার অভ্যাস—জানালেন ওর বাবা। মৃত্যুর আগের দিন কৌশিক বলেছিল যে ওর পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। কিন্তু বাড়ির কেউ ধরতে পারেননি ও আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

সূর্যনারায়ণ বাবুদের বাড়িতে একটা নাম্বারিং তালা আছে। যে নাম্বারিং তালার নাম্বারটি ঐ বাড়ির তিনজনই জানতেন। বাড়িতে ঢোকার তিনটি দরজা। সিঁড়ির কাছের দরজাটিতে ঝোলে নাম্বারিং তালা। যে যার কাজ সেরে সময় মত ফিরে পড়ে। কৌশিক সেদিন হাওয়াই চটি পরে দরজায় তালা দিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পাশের বাড়িতে বলে যায় 'আমি বন্ধুদের কাছে পড়তে যাচ্ছি'। সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অন্য দরজা খুলে (যে দরজায় চাবি দিয়ে কাঠি বাড়ির মধ্যে আলনায় রাখা হত), এই কাঠি নিয়ে সে বাইরে থেকে তালা খুলে চিলে কোঠায় ওঠে। সেখানে ছোট্ট একটি ঘর। কিছুটা গুদমঘর মত। জিনিস পত্র সামান্য সরিয়ে সে ফুট দুই জায়গা করে নেয়।

মৃত্যুর আগের দিন কৌশিক একটি মৃত্যু লিখন লেখে সেখানে সে মৃত্যুর তারিখটি ভুল লেখে ২৯ বৈশাখ। কিন্তু কৌশিক মারা যায় ২৮ বৈশাখ। বয়ানটি ছিলো এইরকম, '···· মৃত্যুদণ্ড দিলাম। ২৯ বৈশাখ আমারই জন্ম দিনে।' প্রথমে ইংরেজিতে তারিখ লিখতে গিয়ে ১১ মে লিখে সে কেটে দেয়। তারপর লেখে ২৯ বৈশাখ। □

গোল টেবিল

বিশ্বশান্তি আন্দোলন : ৮০-র দশক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের মেয়ে গায়িকা। সম্প্রতি তাঁর একটি রেকর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে ছাড়া উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রেগন গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে, বক্তৃতাও দেন। সমবেত সাংবাদিকরা রেগনের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, রেকর্ড বিক্রির বিপুল অর্থ তিনি কীভাবে কাজে লাগাবেন। রেগন-কন্যা উত্তর দেন, শান্তি আন্দোলনে দান করে। ক্রুদ্ধ রেগন সেই মুহূর্তে নিজেকে ঐ অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী হিসেবে অস্বীকার করে চলে যান।

পশ্চিম জার্মানীর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব হয় নি। মার্কিন সংবাদপত্র জগতের অঘোষিত সেন্সর ব্যবস্থায় এ সংবাদ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু শান্তি আন্দোলন পৃথিবীতে এখন যে ব্যাপক চেহারা নিয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন, ও মার্কিনীদের নিকটাত্মীয় দেশগুলো।

১৯৮৩-র ২১ ডিসেম্বর বিশ্বশান্তি

পরিষদের সভাপতি রমেশচন্দ্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তি আন্দোলনের প্রধান নেতা হান্টার ও-ডেল এবং পশ্চিম জার্মানীর শান্তি ইউনিয়নের প্রধান লোরেঞ্জ নোর কলকাতায় এসেছিলেন।

রমেশচন্দ্র, ও-ডেল এবং নোর-কে নিয়ে ২৩ ডিসেম্বর 'প্রতিক্ষণ' একটি গোলটেবিলের আয়োজন করে বিশ্বশান্তি ও আশির দশকে ঐ আন্দোলনের চেহারা বিষয়ে।

প্রায় একযুগ ধরে বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি হিসেবে রমেশচন্দ্র পৃথিবীতে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা। তথাকথিত নিরপেক্ষ মার্কিনী মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট' কিছুদিন আগে রমেশচন্দ্র পরিচালিত বিশ্বশান্তি আন্দোলন কতো বিপথগামী, তা নিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। রমেশচন্দ্রের সার্থকতার সেটাই বোধ-হয় সবচাইতে বড় প্রমাণ।

হান্টার ও-ডেল শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শান্তি আন্দোলনের নেতাই নন, আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী জেসে জ্যাকসনের প্রধান প্রচারসচিব। ১৯৮২ সালে নিউ ইয়র্কে ঐতিহাসিক শান্তি মিছিলের উদ্যোক্তা উনি। 'ফ্রিডমওয়েজ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগের উনি অন্যতম সদস্য।

লোরেঞ্জ নোর পশ্চিম জার্মানীর শান্তি ইউনিয়নের প্রধান। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এখন পশ্চিম জার্মানীতে সব শহরে ছড়িয়ে গেছে, বৃটেনের মতো।

তাঁদের সমবেত অভিজ্ঞতা আমরা 'প্রতিক্ষণ'-এর পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটেবিলে।

প্রতিক্ষণ বিশ্বশান্তি আন্দোলনের চেহারা এখন বদলাচ্ছে। আপনারা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। এই বদলের চরিত্রটি কেমন, তার ব্যাখ্যা শুনতে আমরা উৎসুক।

রমেশচন্দ্র ১৯৮৩ সালকে নিঃসন্দেহে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বছর বলে চিহ্নিত করা যায় বা বলা উচিত বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বিপুল প্রসারের বছর। গোটা ১৯৮৩ সাল জুড়েই গোটা পৃথিবীতে প্রতিটি অংশে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে নিঃসন্দেহে। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রসার বলছি, কারণ প্রায় প্রতিদিন এই আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে মানুষ পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে নিজেদের স্পষ্ট মত লিখিত আবেদনে ও প্রকাশ্য মিছিলে ব্যক্ত করছেন অনেক দৃঢ় ভাবে, বিশ্বাস নিয়ে। বা পশ্চিম জার্মানীতেই ধরুন—সেখানে ৮০ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহে। কয়েক বছর আগে এর এক-দশমাংশও প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বৃটেন, ইতালী বা সেই অর্থে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপেই যুদ্ধবিরোধী এই আন্দোলন দানা বাঁধছে বটেই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেই এই আন্দোলন বেশ জোরালো। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে—মস্কোতেই কয়েক লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বিশ্বে যুদ্ধ অবসানের ডাক দিতে। এখনও অবধি প্রায় ছ' কোটি মানুষ গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে এই আন্দোলনে সামিল। বহু লোকেই এ তথ্য জানেন না, তাঁরা ভাবেন সমাজতান্ত্রিক দেশে আবার আন্দোলন কি। লাতিন আমেরিকা ও এশিয়াতেও আমরা এই আন্দোলনের প্রসার লক্ষ্য করছি।

শুধু অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাই যে বাড়ছে, তা নয়, এই আন্দোলনের সংহতি আগের চাইতে এখন অনেক বেশি জোরদার। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগন তাই এই আন্দোলনকে টুকরো করে ভাঙতে চাইছেন। রেগন বলছেন, বিশ্বশান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বশান্তি পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ঠিক না। আগে এ ধরনের প্ররোচনায় কিছু কাজ হতো। এখন সব যুদ্ধবিরোধী আলোচনাতে অংশগ্রহণকারীরা—সে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটই হোক বা কমিউনিস্ট বা খৃস্টান—এই হুমকিকে পরাজিত করবার আহ্বান জানায়। সেটা কম লাভ নয়।

তৃতীয় লক্ষণ হলো, আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার প্রসার। গ্রেনাডাতে মার্কিন আক্রমণ, মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পশ্চিম ইউরোপে, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের চরিত্রবদল ঘটিয়েছে। কার বেশি অস্ত্র, কে আগে আক্রমণ শুরু করেছে, সেটা এখানে বড় প্রশ্ন নয়—আসল কথা হলো রেগন প্রশাসনের দায়িত্ব। গ্রেনাডা আক্রমণ এই প্রশ্নটাকে বড় করে ধরেছে বলেই আজ বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মোড় ঘুরেছে। আমরা ১৭ই নভেম্বর (১৯৮৩) এথেন্সে বিশ্বশান্তি পরিষদের এক সভায় মিলিত হই—সারা পৃথিবীর শান্তি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিরা ঐ সম্মেলনে এসেছিলেন। ঐদিনই—১৭ নভেম্বর—ছাত্র অভ্যুত্থানের স্মরণে সেখানে এক বিশাল বিক্ষোভ ছিল। দশম বর্ষপূর্তি ছিল ছাত্র অভ্যুত্থানের—দশ বছর আগে ফ্যাশিস্ত জুন্টার গুলিতে বহু ছাত্র নিহত হন। ফ্যাশিস্ত জুন্টা বলতে আমি গ্রীসের সামরিক কর্তৃপক্ষের কথা বলছি। এথেন্সে, ব্যাপক অর্থে গ্রীসেরই ইতিহাসে অতো বড় বিক্ষোভ আগে কখনও হয় নি। সব রকমের সংস্থা থেকে মানুষ এসেছিলেন। ধর্মযাজক, হ্যাঁ শাসক সোশালিস্ট পার্টির সদস্যরা, কমিউনিস্টরা, ট্রেড ইউনিয়ন···

প্রতিক্ষণ আপনি তো ওখানে ছিলেন?

রমেশচন্দ্র হ্যাঁ। শুধু, ছিলামই না, সেই বিক্ষোভের প্রথম সারি থেকে জনসমুদ্রকে দেখেছি। শ্লোগানও ছিল নানা ধরনের—সাইপ্রাসের ব্যাপারে শ্লোগান, ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান, গ্রীসে মার্কিনী ঘাঁটি নিয়ে শ্লোগান, ন্যাটো, সলিডারিটির বিরুদ্ধে শ্লোগান—ছিল। কিন্তু এই বিভিন্ন শ্লোগান মিছিলের এক একটি অংশে আলাদা আলাদাভাবে বলা হচ্ছিল। কিন্তু আরও একটা শ্লোগান

বিক্ষোভকারীরা দলমত নির্বিশেষে উচ্চারণ করেছিলেন সেদিন। কোনো নেতা সেই শ্লোগান তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেন নি। সেই শ্লোগান হলো—'রেগন, এ্যাসাসিন, মার্ডারার'। এই একটি কথা—'রেগন, এ্যাসাসিন, মার্ডারার', সেদিন সমস্বরে ধুয়ার মতো এথেন্সের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

বিক্ষোভকারীদের সবাই মার্কিন দূতাবাসের দিকে হেঁটে যান। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

প্রতিক্ষণ সেখানে কি সরকারের কোনো মন্ত্রী ছিলেন? একথা জিজ্ঞাসার কারণ, দেশটা গ্রীস বলে; ক্ষেপণাস্ত্র বসাতে তারা অস্বীকার করেছে…

রমেশচন্দ্র সরকারী লোক ছিলেন। আসলে, ওখানে বর্তমান সরকার নির্বাচিত হয়েছে প্রধান গ্রীস ন্যাটোর গোষ্ঠীভুক্ত হতে ও ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। তো এটাই হলো বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বর্তমান চেহারা। আমরা ঠিক কার বিরুদ্ধে লড়ছি, কেন লড়ছি—এই জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখন অনেক। বোঝা যাচ্ছে—রেগনবাদ-ই হলো মানবতার প্রধান শত্রু। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মিলিটারি-ইনডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্স—এসব তো আছেই। কিন্তু আন্দোলন করতে করতে তাঁরা বুঝছেন, আসলে রেগনের পলিসিই বিশ্বে গোলমালের প্রধান কারণ। আমরা চাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটা চুক্তি হোক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে। আগেও এমন অনেক চুক্তি হয়েছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও। আমরা একথা কখনোই বলব না—যতদিন সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাকছে, ততদিন কোনো চুক্তি নয়। তাহলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোনো অর্থই থাকে না।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, রেগন ও তার প্রশাসন থেকে মাঝে মাঝেই যে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ডাক দেওয়া হয় তা প্রধানত রেগনকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবার জন্যই। রেগন দেখাতে চান, এইসব আলোচনা চুক্তিতে তাঁরও উদ্যোগ আছে। তিনি একদিকে পৃথিবীতে 'দাদাগিরি' করতেও প্রধান উদ্যোক্তা, শান্তিরও। যদি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন, নির্বাচনে জেতার পক্ষে তার চাইতে ভালো জিনিস আর হতে পারেনা রেগনের কাছে। কিন্তু রেগন নিজেই প্রস্তুত নয় এই মিটিঙের জন্য। আর মিটিঙ হবেই বা কী নিয়ে? তো এই যে রেগনবাদ সম্পর্কে সচেতনতা, মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য যেকোনো জায়গাতে রেগনবাদই যে প্রধান অন্তরায়, এই উপলব্ধিটাই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রধান পাথেয় বর্তমানে। এবং এই উপলব্ধিকে ভাঙা এখন ভয়ানক শক্ত—পশ্চিম ইউরোপে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অবস্থা বদলে গেছে দুই মহাদেশেই। ইউরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ এখন চুক্তির কথা বলেন, রেগনবাদকে ধ্বংস করবার কথা বলেন। নিরস্ত্রীকরণের অন্য জটিল ব্যাপার হয়তো তাঁরা বোঝেন না। কিন্তু রেগনবাদকে শেষ করবার কথা বোঝেন, জানেন যে প্রধান শত্রু এখন ঐ লোকটির দর্শন। পশ্চিম ইউরোপ তো বটেই, যে সমস্ত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছের, তারাও এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন। আজকের সবচাইতে বিপদ হলো আক্রমণ ও অন্য দেশের স্বাধীনতা খর্ব করবার নীতি। রেগনবাদের নীতি এখন ঠিক তাই।

প্রতিক্ষণ ন্যাটো-সমর্থক একটি পশ্চিমী পত্রিকায়—ওয়েস্টার্ন ওয়র্ল্ড—সম্প্রতি লেখা হয়েছে, ব্রাসেলস্-এ (১৯৮৩) ২৩ অক্টোবর শান্তি মিছিলের পরিপ্রেক্ষিতে, যে, রোমের সম্রাট কনস্ট্যানটাইনকে একদিন তাঁর পারিষদরা উত্তেজিত অবস্থায় এসে জানালেন, সম্রাট, ঐ স্কোয়ারে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা জমা হয়ে কিছুক্ষণ আগে আপনার মূর্তির মাথাটা নামিয়ে দিয়েছে। সম্রাট তখন হেসে বললেন, 'কই, আমার তো একটুও লাগে নি!' এ কথা লিখবার পর ঐ ন্যাটো-সমর্থক পত্রিকাটি লিখছে—আসলে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ঐ উচ্ছৃঙ্খল জনতার মতো এক শৃঙ্খলাহীন ছত্রভঙ্গ মানুষের জটলা—যার

১৯৮৩ সালের ১ অক্টোবর
৮ লক্ষ মস্কোবাসীর যুদ্ধবিরোধী মিছিল

কোনোই গুরুত্ব নেই। এরকম যুক্তিই আজকাল আমরা শুনতে পাচ্ছি অন্য পক্ষ থেকে।

রমেশচন্দ্র হ্যাঁ, হ্যাঁ, এমন কায়দা ওরা বহুদিন থেকে করছে। তাদের প্রথমে অভিযোগ ছিল, বিশ্বশান্তি আন্দোলন সোভিয়েত ইউনিয়নের মদতেই চলছে। সে অভিযোগ এখন আর ধোপে টেকে না। এখন তারা বলছে, এই আন্দোলনকে অতো পাত্তা দেবার কিছু নেই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, এশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কোনো সরকারই এই আন্দোলনকে এখন অবজ্ঞা করতে পারেন না। পশ্চিম জার্মানীর কথাই ধরুন। সেখানে ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে ভোট হয়েছে পার্লামেন্টে। এটা সত্যি যে ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার পক্ষেই ভোটের রায়, অথচ পার্লামেন্টের সদস্যদের কথা ধরলে অন্য ছবি পাই আমরা। প্রথম কথা ১৯৭৯-র ডিসেম্বরে পশ্চিম জার্মানীতে ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার ন্যাটো প্রস্তাবকে ডিমোক্র্যাটিক পার্টি গ্রহণ করে। তারাই তখন ক্ষমতাসীন। কিন্তু শ্মিদ-এর আশেপাশে কয়েকজন ছাড়া গোটা পার্টি কিন্তু ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এটা নিশ্চিতই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এবং এই প্রভাবই এখন বাড়ছে। আর খৃস্টান ডিমোক্র্যাটিক দলের সদস্যরা যদিও ভোটের সময় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিতে পারেন নি—কারণ তখন পার্টির হুইপ ছিল। কিন্তু একটা গোটা অংশই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে। এটাও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রভাব। এই জন্য আন্দোলন ক্রমশই ছড়াচ্ছে, ছড়াবে এবং ক্রমশই রাজনৈতিক চরিত্র নেবে। নির্বাচনের কথাই ধরুন না কেন। আপনি বলতে পারেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে কেউ না কেউ শান্তির কথা বলবেই। কিন্তু অবস্থাটা এখন অতো সরল নেই আর। বাস্তবতার ধরনটাই এখন আলাদা। এখন একজন এমন প্রার্থী আছেন, যিনি রেগনের বৈদেশিক নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ডিমোক্র্যাটিক পার্টি বরাবরই বাই-পার্টিজান বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী এবং তাঁরা বোঝেন না, কেন এই প্রশ্ন তোলা হবে। আমাদের দেশেও অনেকে ভাবেন—বৈদেশিক নীতি কোনো ইস্যু নয়। এখন জেসে জ্যাকসন একজন প্রার্থী। রেগন কিন্তু এঁকে 'ব্ল্যাক ক্যানডিডেট' হিসেবে দেখছেন না। জ্যাকসন এখন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রার্থী—অন্তত রেগন তাঁকে সেরকমভাবেই দেখছেন। এই প্রথম একজন প্রার্থী বললেন, আমাদের প্রধান কর্তব্য রেগনের বৈদেশিক নীতিকে থামানো। হার্ট বা মনডেল আছেন। কিন্তু একজন প্রকৃত জনসাধারণের প্রার্থী বলতে তিনিই একজন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে এমনটা দেখা যায় নি। বিশ্বশান্তি আন্দোলন শক্তিশালী না হলে, এমন হতো কিনা সন্দেহ।

[আগামী সংখ্যায়]

আরসেনিক জল কিংবা স্মৃতি

১·

জটিলতা শব্দটিতে ইদানীং বড় বেশি ভয়।
যেমন কুসুম ঠোঁট কাছে এলে ছুটে যাই দ্রুত,
মাছির ত্রস্ততা নিয়ে বসে পড়ি ওষ্ঠের উপর,
অথচ মুহূর্ত শেষে শিরশির করে ওঠে গা।

আসলে একটি বাঘ, মনে বসবাসকারী বাঘ
সমানে লাফায়, আমি পালাই, পালাতে থাকি ধ্রুবতারাহীন
যেমন পালিয়ে ফেরে যুবকের স্বপ্নের বন্দুক।
এরপরও ফিরে আসি ধীরে, একা, জটিল চত্বরে,
আসতে যে হয় ; এসে লুকোই নিজের গুহামুখে
লুকোতে যে হয়। তবু গুহাটির চতুর্দিকে পাহারায়
জেগে থাকো তুমি, জেগে বসে থাকে স্থিতিস্থাপকতা
এমনকি ষোলঘণ্টা গোলামির নিরাপত্তাবোধও।

তোমার চোখের মত ত্রিকৌণিক সতর্কতা নিয়ে
এই জটিলতা—অক্ষরবৃত্তের মাত্রা বড় বেশি আতঙ্ক জাগায়।

২·

নিরাপত্তা নামক জঘন্য অস্ত্র প্রথমেই
রাঙাল দু চোখ ; চোখ নয়, রক্তাক্ত বৃহৎ
দুটি বৃত্ত যেন তেড়ে আসে এমন কিম্ভূত।
বৃত্তের ভেতর থেকে ভুজঙ্গপ্রয়াত দেহ বের
হয়ে এল, নিঃশ্বাসে দূষিত বায়ু,
অঙ্গ বুঝি প্রতিবিম্বহীন।

হঠাৎ হোঁচট খেলে যে-রকম পড়ে যায়
নিরালম্ব লোক, তেমনি উপুড় হই গোপন শয্যায়
সেখানেও শীত হয়ে ওৎ পাতে লেপের তলায়
সেখানেও, বেদখল করে নেয় প্রেমের শরীর।

৩·

সারাটা শহর থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হল জল
এবং কিছুটা জল দূরে সরে গেল
এখন জলের সঙ্গে আড়াআড়িভাব
এখন জলের মধ্যে জলের যৌবন নেই আর।
নদীও পুকুর থেকে বিদায় নিয়েছে তার নাচের শরীর।

তবুও স্মৃতিতে জল, হয়তো বা আরসেনিক জল
আরসেনিক সে-রকম আলিঙ্গনযোগ্য শব্দ নয়
অথচ জলের সঙ্গে জীবনের বিরোধিতা বোঝাতে এখন
এ-রকমই দুটো-চারটে শব্দ চায় বেশি স্বাধীনতা।

জীবনচরিতে প্রবেশ

দেবেশ রায়

চতুর্থ ভাগ / দুই

২১

ঝিমলির মনে অনেক কথাই আসা-যাওয়া করছে। সে-সব কথার মধ্যে সব সময় শৃঙ্খলাও নেই। কিন্তু মনে যা আসছে, তার বাইরে কতকগুলি ধারণা তার তৈরি হয়ে যায়। এই যেমন, এখন, বললেই মুক্তি বোস কলকাতায় একটা বাড়ি ভাড়া করতে রাজি হয়ে যাবে এটা ঝিমলি একটুও না ভেবেই জানে ও বোঝে। কাল যখন মুক্তি বোস তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখন ঝিমলি প্রথমে অপ্রস্তুত বোধ করেছিল। কিন্তু নিজেকে গুছিয়ে নিতে-নিতেই সে শক্ত হয়ে উঠেছিল-মুক্তি বোসের বিরোধিতায় শক্ত। যেন, সেই মুহূর্তে ঝিমলি জানত, মুক্তি বোসের সঙ্গে তার বিরোধিতা ছাড়া কিছু থাকতে পারে না। সে প্রতিক্রিয়া ত অনেকটাই শারীরিক। মুক্তি বোসের সঙ্গে কথাবার্তাতেও কাল সেই অবধারিত সতর্কতা ছিল

তারপর, কোন-এক সময়, ঝিমলি টেরও পায় নি, তার সতর্কতা শিথিল হয়ে গেছে। কালই ? সন্ধ্যাতেই কথা বলতে-বলতে ? নাকি, রাতে ? নাকি, আজ সারা দিন ধরে ? অথবা, আজ সন্ধ্যায় কৌশিক আসার পরে ? এখন, ঝিমলির চিন্তাভাবনায় মুক্তি বোস কেমন পরোক্ষ হয়ে গেছে। মুক্তি বোসকে ভেবে ঝিমলিকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। মুক্তি বোসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার সবটাই জানা। খুব গভীর সম্পর্কের দীর্ঘ দাম্পত্যে যেমন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এমন-কি শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অভ্রান্ত জেনে যায়, ঝিমলি তেমন নিশ্চয়তায় গত মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টায় জেনে গেছে, মুক্তি বোস তার কাছে কোনো মতলব নিয়ে আসে নি, মুক্তি বোস সত্যিই চায় ঝিমলি ফিরে আসুক ঝিমলিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার কোনো কৌশলও নেই। কৌশিককে কলকাতা থেকে নিয়ে এসে ঝিমলির সঙ্গে দেখা করানোটাও কোনো কৌশল নয়। যদি ঝিমলি কাল মুক্তি বোসের সঙ্গে দেখা না করত, কাল সন্ধ্যাতেই যদি কোচবিহার ছেড়ে চলে যেত, তাহলে ত কৌশিকের সঙ্গে তার দেখা হত না। তাহলেও ত মুক্তি বোস ঝিমলিকে খুঁজতে শিলিগুড়ি, হলদিয়া বা অন্য কোথাও যেত, সঙ্গে কৌশিককে নিয়ে। ঝিমলি কখন মুক্তি বোসকে বুঝে ফেলেছে, মুক্তি বোস সম্পর্কে তার সতর্কতা আর এখন নেই। ঝিমলি জানে, নিশ্চিত জানে, কৌশিককে আর বিপুলকে নিয়ে সে যদি কলকাতায় থাকতে চায়, সে- ব্যবস্থা মুহূর্তে করে দেবে মুক্তি বোস। বরং, মুক্তি বোসও যেন এতে একটা উপায় পেয়ে যাবে—সে নিজে পরোক্ষে, আরো পরোক্ষে, প্রায় নেপথ্যে, সরে গিয়ে ঝিমলিকে তার পরিবারে বা পরিস্থিতিতে জায়গা করে দেয়ার।

দশ বছর পর মুক্তি বোসের সঙ্গে প্রথম এই দেখায়, দশ বছর ধরে মামলায় মুক্তি বোসের সঙ্গে বারবার পরোক্ষ দেখার—প্রায় টানা অবিচ্ছিন্ন পরোক্ষ দেখার—পর এই প্রথম সরাসরি দেখায়, ঝিমলির সঙ্গে যখন মুক্তি বোসের কোনো আইনগত বা সামাজিক সম্পর্কও নেই, তখনই, ঝিমলি মুক্তি বোসকে বুঝতে পারে, প্রায় রোদ-হাওয়ার মত বুঝতে পারে। তার সঙ্গে সম্বন্ধটা চিরকালের জন্যে ও সব অর্থে শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থটা মুক্তি বোসের কাছে কত গভীর, কতই গভীর, মামলার সম্বন্ধের মধ্যেও ত একটা সম্বন্ধ ছিল, ঝিমলি সত্যি-সত্যি স্বাধীন হয়ে যাবে, মুক্তি বোসের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে, কোনো দায়হীন বন্ধনহীন স্বাধীন হয়ে যাবে—এটা মুক্তি বোসের কাছে এতটাই অবাস্তব যে সে এমন ছুটে আসে, ছেলে নিয়ে ছুটে আসে।

মুক্তি বোসকে নিয়ে ঝিমলি ভাবতে চায় নি। মুক্তি বোসকে তার বুঝে নেয়া হয়েছে এটাই শুধু কখন এক সময় তার ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু মুক্তি বোসকে বুঝে নেয়ার ধারাবিবরণে তার নিজের কাছেই এক সময় এই প্রশ্নটাও প্রধান হয়ে ওঠে, আজ মামলায় ডিভোর্স হয়ে গেল বলেই ত আর মুক্তি বোস আসে নি, সে-কথা মুক্তি বোস ত বললও। বংশী মারা গেছে বলেই সে আসতে পেরেছে, এসেছে। খুব ভাবনাচিন্তা ছাড়াই ঝিমলি মুক্তি বোসের এ-কাজেরও যেন একটা যুক্তি পেয়ে যায়—ঠিকই ত করেছে মুক্তি বোস, তার সঙ্গে ঝিমলির বিচ্ছেদের কারণই যখন নেই, তখনই সে এসেছে, প্রথম সুযোগেই এসেছে, ঝিমলি যাতে বিপদে না-পড়ে সে ভাবনাও তার হয়ত ছিল।

পিসিমা কথা বলে ওঠেন এমন এক মগ্ন স্বরে যে ঝিমলি চমকে উঠতে পারে না। পিসিমার গলার স্বর এই রাত্রি আর অনিদ্রার সঙ্গে এমনই মিশে ছিল যে ঝিমলির মনেও পড়ে না পিসিমার বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

'তা দুঃখ আমাদের থিক্যা অনেক বেশি ঘর নাই, বাড়ি নাই, বাদিয়ার মত দশ-দশটা বছর ঘুরতেছিস। আমাগ ত নিজেদের কিছু করার ছিল না, যা হইত আমরা দ্যাখতাম, শুনতাম। কিছুই করতি পারতাম না। কিছুই ঠেকাতি পারতাম না। মুক্তিই ত তর কাছে আইল দশ বছর বাদে। তুই ত আর যাস নাই। নিজেকে ত মানষি ভাবতি পারবি।

ঝিমলি চুপ করে থাকে। পিসিমাও কোনো জবাবের আশায় কথাগুলো বলেন নি। ঝিমলি যা ভাবছিল-পিসিমাও তাই বললেন--শেষ পর্যন্ত ত মুক্তি বোসই এল, কিন্তু দশ-দশটা বছর ত ঝিমলি বেদের মত ঘুরে বেড়ায় নি। এই দশ বছর ত সে হলদিয়ায় বংশীর সঙ্গে সংসার করেছে। মুক্তি বোসকে তার কাছে আনার জন্যে ত আর ঝিমলি গত দশ বছর কাটায়নি। তবু, গত দশ বছর ঝিমলি কি হলদিয়ায় বংশীর সঙ্গে সংসার করেছে ? তাদের বাড়ি ছিল, ঘর ছিল, তবু কি সেখানে তারা নিজেদের মত জীবন যাপন করতে পেরেছিল ? মুক্তি বোস যে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এল, এতেই কি ঝিমলির একটা জয়, একমাত্র জয়, নয় ?

প্রায় আচ্ছন্ন স্বরে পিসিমা বলে যান, যে-কোনো জায়গায় থেমে যেতে পারেন এমন ভঙ্গিতে পিসিমা বলে যান, 'আমাগো সময় এক-একটা ধুমসা ব্যাটাছেলের সঙ্গে কচি-কচি মাইয়াগুলার বিয়া হইত। বউ চাই সব ছোট-ছোট, কোলের বাচ্চা। আর বরগুলা হইবে বলিবর্দের মতন। তিনখান মাইয়া জোড়া দিলে একডা পুরুষ হয় না এমন মাপ। কী কষ্ট রে ঝিমলি, কী কষ্ট--'

পিসিমা খুব যে কাতরে ওঠেন তা নয়। কিন্তু সেই চাপা স্বরে, সেই আচ্ছন্নতাতেও কোথায় একটা যন্ত্রণার স্মৃতি মুচড়ে উঠেছিল। পিসিমা চুপ করে গেলেন, নাকি, পরের কথা শুরু করার জন্যে একটু দম নিচ্ছিলেন--ঝিমলি বুঝতে পারে না। সে-ও চুপ করে থাকে আর কোনো উদ্যম ছাড়াই পিসিমার কষ্টটা বুঝে ফেলে—কী অসম্ভব কষ্ট, শরীরের। শুধু শরীরের কষ্ট কী অসম্ভব !

'বিয়্যার পর তর পিস্যা ঘরে ঢুইকলেই আমি দৌড় দিয়্যা পলাইত্যাম। সে না-হয় দিনমান কাটাইলাম। কিন্তু রাত্তিরে। মনে হইত, ভগবান, রাত্তির আসে ক্যান ? রাত্তিরে আর পালানোর জায়গা কই। এক রাত্তিরে আর না-পাইর‍্যা খাটের তলায় লুকাইয়া ছিল্যাম। তর পিস্যা খাটের উপর উইঠা ঘুমাইয়া পইড়লে অনেক রাত্তিরে খাটে উইঠ্যা শুইল্যাম। রাত্তিরে আর জ্বালায় নাই। সকালে ত তর পিস্যা ঘুম থিক্যা ওঠার আগেই আমি পগাড় পার। তা তর পিস্যা ঘুম থিক্যা উইঠ্যা আমার শাশুড়িরে কইল, মা, তমার বউ ত খাটের তলায় শোয়। ব্যাস। আমার হইল কাল। সেইদিন থিক্যা আমার শাশুড়ি ঘরে আইস্যা বসি থাকত। তর পিস্যা আলি তার হাতে আমারে জমা দিয়্যা তবে যাইত—বলির পাঁঠার মত। কী যে কষ্ট রে ঝিমলি। ভাবত্যাম কোন দুঃখে মানষির বিয়্যা হয়।'

পিসিমা ঢোক গেলেন। ঢোক গেলার আওয়াজ হয়। এত রাত পর্যন্ত ত কোনো-দিন জেগে থাকেন না, এত কথাও খুব বলেন না। ঝিমলির মনে হয় পিসিমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে পিসিমাকে বলতে পারে না—আপনি এখন কথা বলবেন না, ঘুমিয়ে পড়ুন। গত দশ-দশটা বছরের মধ্যে ত কখনো পিসিমা এ-সব কথা, এত কথা বলেন নি। কাল মুক্তি বোস এসেছিল, আজ কৌশিক এসেছিল। ঝিমলির জীবনে পিসিমা একটা জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন বলেই কি তাঁর পরাজয়ের কথা মনে পড়ছে, তাঁর দীর্ঘ অতীতের এমন পরাজয়ের কথা যা কখনোই তিনি ভুলে যান নি। ঝিমলি যেন চায়, পিসিমা কথা বলুন।

ঝিমলি আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'পিসিমা, একটু জল খাবেন'

পিসিমা বোধহয় পাশ ফিরে কথা বলছিলেন। চিত হয়ে বলেন, 'দে ত একটু জিভডা শুকাইয়া গিছে'—

ঝিমলি উঠে পিসিমার মশারির পাশ দিয়ে ভিতরে ঢোকে। তাকে সাবধানে

ছবি □ সুব্রত চৌধুরী

ঢুকতে হয়, মশারি আবার উঠে না যায়। আলো না-জ্বালিয়ে কেটলিটা হাতে পায়। নিচু হয়ে ডান হাতে তুলে সে ফিরে আসে—ঘরের ভিতর আর ঢোকে না। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে যেখানে বসে ছিল, সেখানেই বসে মশারিটা তুলে পিসিমাকে ডাকে, 'পিসিমা, নিন, জল খান।'

উঠে বসার জন্যে পিসিমাকে আবার বাঁ কাত হয়ে, ডান হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠতে হয়। উঠে বসে পা দুটো ঠিক করতে হয়—বসার সুবিধের জন্যে। মশারির চাল পিসিমার মাথায় ঠেকে। ঝিমলি মশারির তলা দিয়ে কেটলিটা এগিয়ে দেয়, 'নিন'। পিসিমা কেটলিটা হাতে নিলে, ঝিমলি সোজা হয়ে বসে হাত দিয়ে মশারির চালটা একটু উঁচু করে ধরে। তাতে পিসিমার মাথা থেকে মশারির চালটা খুব উঠে আসে না, কিন্তু তার সামনেটা একটু উঁচু হয়—যাতে তিনি কেটলিটা তুলে উঁচু করে জল খেতে পারেন। পিসিমার গলায় কেটলির নল থেকে জল পড়ার কলকল আর পিসিমার গলার ঢকঢক আওয়াজ যেন ক্রমেই সেই রাত্রির নিস্তব্ধতাভরে তোলে। পিসিমা কেটলিটা সোজা করেন। ঘাড়টা নামান। একটু পরে মুখের জলটুকু গেলেন। তারও একটু পরে মশারিটার গায়ে হাত দিলে ঝিমলি মশারির চাল ছেড়ে নীচে হাত দিয়ে কেটলিটা বের করে নেয়। পিসিমা সোজা হয়ে একটা ঢেকুর তোলেন। ঝিমলি কেটলি থেকে কিছুটা জল মুখে ঢালে। জলের ঠাণ্ডায় তার মুখের ভিতরটাতে খুব আরাম লাগে। ঝিমলি জলটাকে মুখের ভিতরে খেলাতে থাকে, তারপর একটু একটু করে জলটা গিলতে থাকে। সেই চোঁয়ানো জলে তার গলাটা ভিজতে থাকে, একটু-একটু, ধীরে-ধীরে।

পিসিমা আবার কথা বলে ওঠেন। উঠে বসা, জলখাওয়া ইত্যাদির জন্যে পিসিমার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তার গলাতে সেই একই আচ্ছন্নতা। ঝিমলি বুঝতে পারে পিসিমা বসে-বসে কথা বলছেন। বুঝতে পারে, পিসিমাকে দেখে নয়, কথাগুলো শুনে। কথাগুলো তখন একটু ওপর থেকে আসছিল। ঝিমলি সেই একই ভঙ্গিতে, চৌকাঠে হেলান দিয়ে থাকে।

'আমার বিয়্যার বছর ঘুইরল। আমার প্যাটে বাচ্চা আসে না এদিকে আমার শাশুড়ি তখন আবার পোয়াতি হইছেন। সে যে কী লজ্জা! কী দুর্ভোগ। সবাই আইস্যা টিপ্যাটিপ্যা দ্যাখে। দ্যাখে, আমার কলকব্জা সব ঠিক আছে কি না। কেউ কয়—কোমরের যা ঢক, এ মাইয়্যার প্যাটে বাচ্চা রাখার জায়গাই নাই। কেই কয়, প্যাটে বাচ্চা আসে না তয় বুক এ রকম ভারি ক্যান। কয়, আমার বাপের বাড়ি নাকি খোঁজ নিবে। আর, আমার শাশুড়ি আমার সামনে প্যাট বাজাইয়া ঘুরি বেড়াত। মনে হইত, হে মা বসুন্ধরা, দ্বিখণ্ড হও, দ্বিখণ্ড হও। আমার শাশুড়ির প্যাট যত বাড়ে, আমার প্যাট যেন ভিতরে-ভিতরে তত শুকায়। হায় ভগবান, এত বড় একটা প্যাটে একটুখানি একটা বাচ্চার জায়গা হয় না। খাইতে লজ্জা কইরত। আমাগো শ্বশুর বাড়িতে সবাইয়ের একেবারে মুখস্ত ছিল—পোয়াতি হইলে কোন মাসে কী খাইতে মন চায়। শাশুড়ির নোলা বুইঝ্যা রান্না হইত আর আমার এদিকে দিনে দিনেই খাওয়া কমে। ক্, খাই ক্যামনে। যার প্যাট আস্ত একটা বাচ্চায় ভরা থাকার কথা, সে এত বড় একটা খালি প্যাট শুধু ভাত দিয়া ভরায় ক্যামনে ক। তর পিস্যা ত তাও ভাল মানুষ ছিল। একদিনও ওর জন্যি আমার গায়ে হাত তুলে নাই। কইত, সময় হইলি হব, হব, এত তাড়া কীসের?'

ঝিমলি টেরও পায় নি—কখন সে একটু আত্মবিস্মৃত ঢুকে গেছে পিসিমার গল্পের মধ্যে। একটু আগে সে পিসিমার কথা থেকে বুঝতে পারে প্রতিদিনের সেই ধর্ষণের যন্ত্রণা। কিন্তু তখনও সে বোঝে নি—এই ধর্ষণের পর আবার পিসিমাই অভিযুক্ত হবেন যথাসময়ে সন্তানধারণে অক্ষমতার দোষে। ঝিমলি যেন দেখতে পায়—একটি কিশোরী মেয়ে এক শত্রুপুরীতে তার ধ্বস্ত শরীর ও শরীরের অজ্ঞাত অভ্যন্তর নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে জানেই না তার কাছে কী প্রত্যাশিত, অথচ সেই প্রত্যাশা পূরণের দায় তাকে বইতে হচ্ছে। সে জানেই না তার ক্ষমতা কতটা, অথচ সেই অনিশ্চিত ক্ষমতার ভার তাকে বইতে হচ্ছে। পিসিমা যখন তাঁর কথা শুরু করলেন, তখন ঝিমলির পক্ষে সেই কথার নিহিত উদ্বেগ অনুমান করা সম্ভব হচ্ছিল না, কিছু আধমনেই সে শুনে যাচ্ছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে পিসিমা বললেন—তাঁর শাশুড়ির সন্তানসম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল অথচ পিসিমার বাচ্চা হচ্ছিল না, সেই মুহূর্তে পিসিমা যা বলতে চাইছেন সেটা একেবারে ছবি হয়ে তার চোখের সামনে ধরা পড়ে—বহুবার গর্ভিনী এক বয়সিনী নারীর সামনে এক কিশোরী, কি বালিকার, দ্বিধা, নিজের সম্পর্কে নিজেরই কাছে সংশয়।

পিসিমাই যেন এই সময়টুকু ঝিমলিকে দিয়েছিলেন, যাতে ঝিমলি তার অবস্থাটা বুঝে নিতে পারে। সেই সময়টুকু পার হয়ে গেলে পিসিমা ডাকেন, 'শুনলি, ঝিমলি?'

ঝিমলি সাড়া দেয়, 'উঁ?'

পিসিমা তার গলায় স্বর না তুলেই বলেন, 'আমি তর পিস্যারে কইছিলাম, আর-একটা বিয়া কর'—

'আপনিই বললেন?'

'হ্যাঁ। তখন এই রকম কইতে হইত। না কইলে ত আরো নিন্দা। একে আঁটকুড়ি তাতে আবার ভাতারখাগি—বাচ্চাও হইব না আবার সোয়ামিরেও ছাড়ব না— এ একেবারে মহাপাতক। কিন্তু আমি কি আর সহজে কইতে চাইছি। আমার শাশুড়ি রোজ সকাল-সইন্ধ্যা আমার কানের মধ্যে ফুসফুস করেন—বউমা, তোমার কি চোখ নাই, দেখ না আমার ছাওয়াল শুকায়্যা যাত্যাছে, এই বয়সে যদি পোলার মুখ না দেখে কুনো পুরুষ মানুষ স্থির থাইকতে পারে, তুমি না কলি কি পুরুষ মানুষ নিজের থিক্যা কবে, শুধু নিজের কথাডাই ভাববা, নিজের স্বামীর কথাডা ভাববা না। আর আমিও ঐ-রকম ভাইবত্যাম'

'কোন রকম?'

'শুইনলে তরা এ্যাখন হাসবি'

'শুনি'

'আমি ভাইবতাম, আর-একটা বৌ হলি মন্দ হয় না, আমি অন্তত এট্টু বাঁচি। নতুন বউ হইলে ত ভালই হয়—তারে লইয়াই থাকব। কিন্তু আমি কারে লইয়া থাকব? যদি একটা বাচ্চা থাইকত তাহালি তর পিস্যারে আর-একটা বিয়্যা দিতে পারত্যাম। কিন্তু আমার ত ঐ বাড়িতে ঐ লোকটার সঙ্গেই যা-সম্বন্ধ। সেটাও যদি না থাকে, তাহলি বাঁচব কী কইর‍্যা?'

'আপনি তা হলে বললেন কেন, পিসেমশাইকে?'

'আমার শাশুড়ির বুদ্ধি ছিল খুব। বলে কি, নতুন বৌয়ের প্যাটে যদি একটা বাচ্চাকাচ্চা হয়, তাহলি তোমারও ত একটা গতি হবে, তুমিও ত সেই ছাওয়াল নিয়্যা থাইকতে পারবা। এক ছাওয়াল দুই জনে ভাগ করি নিতে পারবা না? তুমি এমনি স্বার্থপর? আরো বইলতেন—স্বামীরে যদি এখন ভাগ করি নিতে না চাও তা হলি দেখবা তোমার স্বামী আর কয়দিন আঁটকুড়া বৌয়ের সঙ্গে থাইকবে? তখন বাজারের বারঘরের মেয়েছেলের সঙ্গে স্বামী ভাগ করতি হবে—

'আপনার শাশুড়িই আপনাকে এইসব বলতেন?'

'শাশুড়ি? একলা শাশুড়ি নাকি? কইতনাটা কে? শাশুড়ি ত দিবারাত্র অষ্টপ্রহর কইতই, পাড়ার বৌঝিরা কইত, আত্মীয়স্বজনরা কইত। য্যান, বিয়্যার বছর না-ঘুরতে বাচ্চা হয় না যে-বৌয়ের তার স্বামীর আর-একবার বিয়া না-দ্যাওনটা অপরাধ, মহা অপরাধ'

'শেষে'

'শ্যাষে একদিন তর পিস্যারে আমি কইয়্যা দিলাম'

'কী বললেন,'

'কী আর কব, কইল্যাম বিয়্যা কর'

শুনে, ঝিমলি খুক করে একটু হেসে ফেলে। পিসিমার পরিস্থিতির উদ্বেগ তার ভিতর সঞ্চারিত হয়ে গেলেও সে এই অবস্থাটা কল্পনা করতেই পিসিমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যেন, পিসিমা একটা এমন গল্প বলছেন, যা শুনতে ঝিমলির ভাল লাগছে— এইমাত্র। এক স্ত্রী স্বামীকে গিয়ে বলছে—তুমি একটা বিয়ে কর। স্বামীও কি স্ত্রীকে তাই বলতে পারত। ডিভোর্স নেই, মামলা নেই, মোকদ্দমা নেই, ঝুট-ঝামেলা কিছু নেই, শুধু বিয়ে করে ফেলা। ঝিমলি আবার খুক করে হাসে,

'আপনি গিয়ে বললেন যে বিয়ে কর'

'ঐ একটু ঘুরাইয়া-প্যাঁচাইয়া কইল্যাম আর কি। কইল্যাম মারও নাতির মুখ দেখার শখ, সবাই আমারে দুষতিছে। আমার জন্যি তুমি ক্যান কষ্ট পাবা। তুমি আর 'না' কইর না, আমরা মায়্যা দেখি'

'আপনিই মেয়ে দেখবেন?'

'তা কে দেখবে? বিয়া দিব আমার স্বামীর, সতীনের ঘর করব আমি, আর মাইয়া দেখবে কি পাড়া-পড়শি? মাইয়্যা দেইখতে আমি না গেলেও ত আমার দুর্ণাম হব, কইবে আমি না থিক্যা বিয়্যা দিতে চাইনা।'

খুক করে একটু হেসে ফেলে ঝিমলি। কিন্তু হাসিটা একবার হেসেই শেষ হয় না। সে আবারও হেসে ওঠে। আর বাঁ পাটা তুলে হাঁটুটা খাড়া করে হাত দুটো তার ওপর রাখে। বেশিক্ষণ টানটান করে রাখলে হাঁটুটা টনটন করে। কিন্তু, খাড়া করেও রাখতে পারে না—পেটে চাপ পড়ে। ঝিমলি যেন দু হাতে হাঁটুটা সামলে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই বিয়েতেও কি মেয়ে দেখাটাখা হত নাকি'

পিসিমা চুপ করে থাকেন। তারপর একটা আওয়াজ করেন মুখ দিয়ে। গলার আওয়াজ না তুলে বলেন, 'কস্ কী, এ বিয়ায় ত ধুমধাম আরো বেশি, এক-এক মাইয়্যা চারদফা দেইখতে হত—'

'চার দফা কেন ?' 'ধর কেন, পয়লা দফায় বাড়ির কর্তারা, শ্বশুর-ভাসুর'

'আপনার ভাসুর দেখতে গেলে ত নিজেই বিয়ে করে বসবে'

'তা ত কতই কইরত। এ ত ভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষ। ছাওয়ালের বিয়্যা দিতে যাইয়্যা নিজে বিয়্যা কইরল না আমার ভাসুর—'

'তাই ত বলছি'—ঝিমলির গলায় যেন একটু গল্পশোনার মজাই এসে যায়। কিন্তু পিসিমা গল্প না-বলে হঠাৎ চুপ করে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর পিসিমা শুয়ে পড়েন। ঝিমলি পা মেলে দিয়ে বাইরে তাকায়।

'কী আর কবি রে ঝিমলি, আমাগো জীবনের আর-কিছু কহনের নাই', পিসিমার গলার স্বর শুনে ঝিমলি বোঝে পিসিমা উল্টোদিকে পাশ ফিরেছেন।

পিসিমার বয়স কত সেটা হিসেব পত্র কষে বের করতে হয়। এখন তাঁকে দেখে বয়স ব্যাপারটাকেই অবান্তর ঠেকে। দুই হাতে সংসারটা কেমন ধরে রাখেন। তাই নিয়ে লক্ষ্মীর বোধহয় একটু রাগও আছে। শেষ পর্যন্ত ত এটা পিসিমার সংসার, লক্ষ্মীর নয়। কিন্তু লক্ষ্মী তা-ই নিয়ে ত কখনো কোনো কথা তুলবে না। ঝিমলি হলে থাকতই না। কিন্তু পিসিমাকে দেখে কী বোঝার জো আছে যে এই অনুকূল-লক্ষ্মী-বিপুলের সংসারটা তাঁর নিজের সংসার নয় ? ঝিমলিও গত দশ বছরে তার অংশ হয়ে আছে। পিসিমার সারা জীবন এমন এক অতীতে অস্পষ্ট যে সে-বিষয়ে শুধু গল্পকথা চলে, তার ভিতরকার কথা জানা যায় না। অথচ পিসিমা ত এই সারাটা জীবন যাপন করেই আজকের জায়গায় এসেছেন। যেন ধরেই নেয়া যে পিসিমাদের জীবনের অতীতটা এই বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত নয়। আজ এই মাঝরাতে এই দীর্ঘ-জীবন তার অতীত-বর্তমান সহ ঝিমলির সামনে এসে দাঁড়াল কেন। ঝিমলিরও দশ বছরের অতীত আজ সন্ধ্যায় নেহাতই-হঠাৎ তার বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বলে ? নাকি, ঝিমলির দশ বছরের অতীত কাল দুপুরে নেহাতই-হঠাৎ তার বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায় বলে ? মুক্তি বোসও কি সেই অস্থিরতাতেই এমন প্রায় অসহায়ের মতই ছুটে এসেছে ঝিমলির কাছে ? মুক্তি বোসের দশ বছরের ধারাবাহিকতা, সেটা তার আগে থেকেও চলে আসছে বটে, কাল দুপুরে কোর্টে শেষ হয়ে গেল বলে ? দশ বছরের বিবাহিত জীবনকে যদি দশ বছর মামলা করেও টিকিয়ে রাখা যায়, তা হলে, আরো দশ বছর জোড়া দিয়েই বা রাখা যাবে না কেন। ঝিমলি মুক্তি বোসের সঙ্গে কোনো বাঁধাবাঁধি তেমন করে বোধ করতে পারছে না কেন ? ডিভোর্সের রসিকতাটা তার লেগেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা তাকে এতদিনে মুক্তি বোসের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া গেল এমন কোনো বোধও দেয় নি। মুক্তি বোস ঝিমলিকে জব্দ করার জন্যে ছেলের সঙ্গে ঝিমলির দেখা পর্যন্ত হতে দেয় নি। তার ও ঝিমলির ছেলেকে নিজের কাছে রেখে মুক্তি বোস ঝিমলির সঙ্গেই বাঁধা থেকে গেছে। উল্টে, ছেলেকেও ছেড়ে আসতে পেরে ও ছেলেকেও না দেখে থাকতে পেরে ঝিমলি মুক্তি বোসের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্ত বন্ধন বাধ্য হয়ে উতরে গেছে মুক্তি বোস যদি ছেলে ঝিমলিকে ছেড়ে দিত আর ডিভোর্স না দিত তাহলে বংশীর মৃত্যুর পর হয়ত ঝিমলিকেই মুক্তি বোসের কাছে যেতে হত।

ঝিমলির মাথায় এ-বুদ্ধিটা এলো অথচ মুক্তি বোসের মাথায় ত এটা গত দশ বছরে একবারও আসে নি। মুক্তি বোস ঝিমলিকে জব্দ করতে চেয়েছে সোজা ভাবে—ডিভোর্স চেয়েছে, ডিভোর্স দেব না। ঝিমলিকে বাধ্য করার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না ? তার, স্ত্রী হয়ে থাকতে বাধ্য করার ? তা হয়ত ছিল—কিন্তু তা নিয়ে সে জোর খাটিয়েছে যতটা, সে-তুলনায় কৌশল প্রায় কিছুই করে নি। বরং বংশী আর ঝিমলি প্রথম দিকে, অন্তত দশ বছরের ভিতর বছর পাঁচ-সাত কত ভাবে কত কৌশলে চেষ্টা করেছে ডিভোর্স আদায়ের। শেষ দু-তিন বছর অবিশ্যি ওদের প্রায় কোনো উদ্যোগ ছিল না, এ যেন কোনোদিন মিটবে না, মেটার আগে তারা মরে যাবে। মরে ত গেলও একজন।

অথবা ছেলের ব্যাপারে মুক্তি বোস মামলা-মোকদ্দমা এই সব কোনো কিছু দিয়ে চালিত হয় নি। ছেলে ছাড়া তার ত আর কিছু নেই, তাই ছেলেকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। সেখানে, মুক্তি বোস ভেবে থাকতে পারে যে বংশী আর ঝিমলি মিলে ছেলেকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। ডিভোর্স না দেয়ার জন্যে তার এই দশ বছরের মামলা আসলে হয়ত ছেলে না দেয়ারই জন্যে। যদি বংশী আর ঝিমলি এ-রকম কোনো কথা কোনো এক সময় মুক্তি বোসের কানে তুলত যে ঝিমলি ছেলে দাবি করবে না, শুধু ডিভোর্সটা চায়—তা হলে হয়ত মুক্তি বোস আগ বাড়িয়ে রাজি হয়ে যেত।

বছর দু-চার আগে বংশীরও এইরকম ইঙ্গিতের পর ডিভোর্স নিয়ে তাদের মধ্যে আর-কোনো কথা হয় নি। বংশী বলেছিল—যাকে নিয়ে এত সে ত আর বছর পাঁচ-ছয় পর সাবালক হয়ে যাবে, তখন ত আর ছেলে মা পাবে, না, বাবা পাবে, এ নিয়ে মামলা চলবে না; তা হলে, ছেলে যখন বাপের কাছেই বড় হয়েছে সেটা অগত্যা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। ঝিমলি এর কোনো উত্তর দেয় নি। বংশীও এ নিয়ে আর-কোনো কথা কখনো তোলে নি। ডিভোর্সের মামলাটা যেন হয়ে দাঁড়ায় বছরে দু-একবার কোচবিহারে আসার উপলক্ষ। যদি সেদিন তাতে রাজি হত ঝিমলি, তা হলে ডিভোর্স পেয়ে যেত ? বংশীকে বিয়ে করতে পারত ? বাচ্চা আরো একটি হতে পারত ? কিন্তু ঝিমলি কি করত—কৌশিকের মা হিসেবে নিজেকে দাবি করবে না এটা মেনে নেয়ার পর ?

সেটা মানতে পারে নি বলে বংশীর সঙ্গে তার দশ-দশটি বছরের জীবনেরও কোনো ধারাবাহিকতা থাকল না। বংশী মারা গেল ও সে জীবন শেষ হয়ে গেল। সেটা করে নি বলেই মুক্তি বোস আজ তার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে কারণ ঝিমলিও ত গত দশ বছরে প্রমাণ করেছে যে সে তার ছেলের ওপর অধিকার ছাড়বে না। সেই নৈতিকতা কি বংশীর সঙ্গে জীবনটাকে করে তুলল না গ্রন্থিহীন, বিচ্ছিন্ন, অসংবদ্ধ ? কিন্তু সে-দায় ত ঝিমলির নয়। বংশীরও। বংশীরই। সে-সুযোগ এসেছিল। ঝিমলি কিছুতেই রাজি হয় নি অ্যাবর্শনে। কিন্তু বংশী ত শেষ পর্যন্ত সাহস পায় নি। যদি বংশী তাদের বাচ্চাকে রাখতে সাহস পেত তা হলে, আজ, বংশীর মৃত্যুর পর, কি মুক্তি বোস আসতে পারত ঝিমলিকে ফিরিয়ে নিতে ? আর এলে তাকে ত আসতে হত বংশীর উপস্থিতি স্বীকার করে।

বংশীর মৃত্যুর ফলে ঝিমলির অসহায়তার জন্যেই ত মুক্তি বোস এসেছে। বংশীর মৃত্যুর পর প্রথম সুযোগেই ঝিমলিকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে মুক্তি বোস—এই কথা ত শুধু ঝিমলি কেন, পিসিমাও বিশ্বাস করেছেন, লক্ষ্মীও মনে করেছে। মুক্তি বোসের ওপর ত সে কারণেই এই দায় আরো বেশি চেপেছে যে তাকে ছুটে এসে বলতে হয় সে তা করে নি, সে আপিল করতেও পারে, কিন্তু সে-সব থাক, ঝিমলি ফিরে চলুক।

দশ বছর ধরে ছেলের ওপর অধিকার নিয়ে মামলা লড়ে মুক্তি বোস আর ঝিমলি যেন এক-রকম বাঁধা পড়েও গেছে। ঝিমলি জানে না আজকের রায়ে ছেলের ব্যবস্থা কী হয়েছে। রায়-যাই থাকুক, ঝিমলি জানে কৌশিকের ওপর তার কোনো প্রকৃত অধিকার বর্তাবে না। সেপারেশনের মামলায় ত সে-রকম সব ব্যবস্থা ছিল। সেটা মুক্তি বোস মানেও নি, তাকে মানানো যায় নি। কাল মুক্তি বোস সেই চরম সুযোগটাই যাওয়ার আগে ঝিমলিকে দিয়েছিল। আজ কৌশিক এল আর মুক্তি বোস নিশ্চিত হয়ে গেল কৌশিকই ঝিমলিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুক্তি বোস যেন ঝিমলিকে স্বপ্নের ভিতর হাঁটার মত এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়ে গেছে। হাঁটা আছে কিন্তু কোথাও যাওয়া নেই। বংশী নেই বলেই কৌশিক আসতে পারল। 'ছাওয়ালের মুখা দেইখে সব ভোলা যায়, না রে ঝিমলি।

পিসিমার কথা শুনে ঝিমলি চমকে উঠছিল। কিন্তু সে চমকাতে পারে না পিসিমার কণ্ঠস্বরের জন্যে। এতক্ষণ যেন তাকে একা-একা ভাবনার সুযোগ দিলেন পিসিমা আর ভাবনার শেষ বুঝেই তাঁর প্রশ্নটা করলেন। কিন্তু কী জবাব দেবে ঝিমলি। সে কোনো কথা খুঁজে পায় না। না পেয়ে একটু নড়েচড়ে বসে। আর গলায় একটু শব্দ করে।

পিসিমা তাকে ডাকেন, 'ঝিমলি-ই'

নিজের গলা একটু পরিস্কার করে নিয়ে ঝিমলি বলে, 'হ্যাঁ, বলুন'

'কেমন লাগল রে তর ছাওয়ালডারে—

আগামী সংখ্যায় শেষ হবে

দাহনের জটিলতা

আফসার আমেদ

কাদা হড়কাতে হড়কাতে লোকটা এল। দেওয়ালের ছামরে পানি একহাঁটু। তার পাশ দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ করে ভেঙে ভেঙে নুয়ে এগনেয় উঠে এল বাপ জলিল খাঁ। পাশে পাশে এল লম্বা লোকটা। লোকটাকে নোয়াতে হল কোমর থেকে মচ্‌কে।

বাপ হাঁকড় দেয় 'কই মা সাকিলা।'

সাকিলা দেখছিল দূর থেকেই। চোখে কাজল আছে তার। হাটগেছের মোড়ে যখন ছিল তখন থেকে দেখছে। কাদায় এদিক ওদিক হতে হতে লোকটাকে নিয়ে আসছিল।

রান্না করার খোপটার ভেতর কেন জানি সাকিলা ঢুকে গেছে।

'ও মা সাকিলা কোতা গেলি ?'

সাকিলা উত্তর দিল না, টাটির ফাঁক দিয়ে দেখল না, মাটিতে খোঁচা দিয়ে আঁক কাটছিল বসে বসে।

লোকটা বলেছে 'কোতা গেচে বুধহয়।'

'গেলে যাবে।' বাপ বলে।

দুদিন ছাড়া বাপ একজন না একজনকে ধরে আনেই। বাদলার রাতে কেউ ফিরতে পারল না, নৌকো নদীতে উথালপাথাল মাতাল হলে হাটে মুগরী-পাং-আনা, হোগলা-বেচা-লোকগুলো হড়কা-হড়কাতে বাপের সঙ্গে চলে আসবেই। এই লোকটা অনেকবার এসেছে। থাকেনি একবারও। লোকটার কাজের কোনো ঠিক নেই। এই বর্ষায় বাঁকে করে চারাপোনার কাজ করে। শীতে ব্যাঙ ধরবে। লগিই সুতো বেঁধে বাঁকানো কাঁটা দিয়ে ব্যাঙ ধরবে ঝোলা ঝোলা। হোগলা বেচবে হাটে। আবার পৌষমাসে হাটে ধানের বস্তা বেচবে, তোলা নামা করবে নৌকোয়। কিংবা ইলিশ ধরবে। শুকোমাছের নৌকোয় তিনমাস চলে যাবে।

এগনেয় পানি ফেলার শব্দ হচ্ছে।

'ও মা সাকিলা গো।'—

সাকিলা কেমন খাড়া হয়ে যায়। টাটি সরিয়ে বেরিয়ে আসে এগনেয়। 'কেন কি হয়েছে ? সাকিলা সাকিলা করে মরে গেলে যে বাপ। হাটে মনু সাঁতের হোটেলে ছিলুনি ? বাদ্‌লায় দেল ভাঙচে, ছামরে পানি, জ্বালুনকুটো নেই—রেঁধে খাওয়াও, থাকতে দাও—আমি পারবুনি বলে দিনু।'

লম্বা লোকটা এগনের চালে লম্বা হতে পারছিল না, আরো নুয়ে পড়ল।

থর থর করে কাঁপছিল লোকটা। লুঙ্গি-গেঞ্জি-জামা সব ভিজে গেছে।

'ও সাকিলা রাগ-মাগ-করিসনি, লোকটা বিপদে পড়ল—আটচালার ঝাপটায় লোকটা ভিজছিল আর থর থর কাঁপছিল, গরিবউল্লাকে চিনিসনি, সিদিন আর বছরে যে লৌকো ডুবে গেল, মানুষজন একজনও বাঁচলুনি—মাঝি লৌকোর সাতে সাতে ডুবতে ডুবতে চলে গেল, আর ফিরলুনি—তহন গরিবউল্লা তুফানে উঠে এল, মোদের গরিবউল্লা, ব্যাঙ ধরে যে গো মা। কবিরপুরে ঘর।'

সাকিলা কোমর ভেঙে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বাপ টকটকে নতুন গামছাটাকে এনে দিল গরিবউল্লাকে। 'আগাশ আর ছাড়বেনি, যা ঝাপটা।'

লোকটা বলে 'আগের বছর পানি হয়নি, শোধ লিচ্ছে।'

'আগাশে জোড়া বর্ষার পানি ছেল।' বাপ জাড়ের চাদরটা পরে নিয়ে লুঙ্গি নিংড়োচ্ছে। 'গামছাটা পরে লও গো, ভিজে থামিতে আর থাকুনি।'

লোকটা সাকিলার দিকে একবার দেখল। সাকিলা তাকাবে না, কোথাকারের কে মানুষ—গা জ্বলে যায় !

'ও মা সাকিলা, কটা মোটা-মোটা করে রুটি করে লিবি, ব্যস—কি বল মল্লিকের পো।'

লোকটা মুখ দিয়ে শব্দ করল না।

'বাপ, মুই পারবুনি—খেতে হয় করে খাও।'

ঘরের ভেতর চলে আসে সাকিলা। দেওয়াল-ঘেঁষে কাঁথায় জড়ানো রুগিটা পাটিসাপ্‌টার মতো মুড়ে এতটুকু হয়ে নাকে পিন পিন করছে। তার মা। সাকিলা বাইরের আলো থেকে এসে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারটাকে খানিক ঘন দেখল। ঠাওর করে মাথার কাছে এল। সেই নাকের পিন পিন শব্দটা হচ্ছেই। একটুও জিরেন নেই। গাল দিয়ে ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌ করে শ্বাস ফেলছে। চোখ দুটো এই আঁধারেও জ্বলে। বাদলা হলে হাঁপ আরো বাড়ে। ডান হাতটা চেটায়ের সঙ্গে মিশিয়ে মায়ের পিঠের ভেতর নিয়ে যায়। পিঠটা চাগিয়ে তোলে। শিরের হাড়, পাঁজরার হাড় হাতের মাংসে প্রায় গেঁথে যায়। এখনও। চাগিয়ে তোলে। পিঠে একটা বালিশ দেয়। বুকটায় হাত বুলোয়।

'ও বাপ, ঘরকে এসো না !'—

লোকটার সঙ্গে বিড়ি খাচ্ছিল বাপ, বিড়ি খেতে খেতেই ঘরের ভেতর চলে এল।

'মাকে লিয়ে এট্টু বসতে তো পারো, সারাদিন

শুয়ে থাকে।'

বাপ জলিল খাঁ বসে পড়ে সাকিলার মায়ের মাথার কাছে।

সাকিলা মায়ের বুক থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়। 'মাগী মরবেও নি, ড্যাব-ড্যাব-করে চোক-চেয়ে এখুনো রয়েচে—সারাদিন মরে যাই একা, মুয়ের সামনে কাউরে কি পাই!' সাকিলার ঠোঁটদুটো বেঁকে যাচ্ছে। নাকের গভীরে, কপালের শিরায় শিরায় ঝন ঝন করে উঠল, বুকের ভেতর হু হু করে উঠল। 'মর মর।' আরো জোরে কাঁদছে সাকিলা 'ঘরে কাউরে পাইনি, একা একা মরে গেনু—কাউরে বলব লোক পাইনি—বাঁধের কোলে একটেরে ঘর। তোর ঘরে শুকনি বসবে বাপ—জ্বলে গেনু মরে গেনু, বুক ফেট্টে যাচ্ছে—লোক থাকলে বুক হালকা করে কতা বললে হালকা হয়, দেল ঠ্যাণ্ডা হয়—মোর জিন্‌গেনি করল হাক্‌হাকের জিন্‌গেনি—ঘরকে আগুন দিয়ে যিথা মন যায় চলে যাব দেখবি।'

সাকিলা কাঁদছে। হাউ হাউ করে। বুকের ভেতর ভার ভার। যতো উস্কোয় ততোই বেড়ে যাচ্ছে। হু হু করে উঠছে সাকিলা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেবার মতো এগনেয় খুঁটিটা ধরে বসে পড়ল। কাঁদছে ফিস ফিস করে।

কবিরপুরের লোকটা থ-হয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লম্বা-লম্বা হাত দুটো যেন পেনেক দিয়ে উঠছে। এই বুঝি সাকিলাকে হাত দুটো পেছন দিক দিয়ে ধরে তুলে ধরল। আর সাকিলার মাথাটা ঢ্যাঙা লোকটার বুকের কাছে।

সাকিলা হাউ হাউ করে কাঁদছে। রান্নার খোপটা থেকে ছাগল দুটো বেরিয়ে এসেছে। গুটিসুটি সাকিলার কাছে চলে এসেছে। সাকিলা কাঁদছিল হু হু করে। ছাগল দুটো মুখ বাড়িয়ে ধরেছে তার দিকে। একটা তো আঁচল ধরে টানল। ভিজে আঁচল, শাড়িটার সবটাই ভিজে। ভিজে শাড়িতে থাকাটাও যেন তার কান্নার অনেক কারণের একটা। যেমন জংঘা পায়ের ডিমে ভিজে শাড়িটা নেপটায় শুধু, কিংবা মাথায় দিলে আর খসতে চায় না, অথচ কতো চুল তার! আর বুকে শুধু জড়িয়ে ধরে—টানলে টুনলে ছাড়ে না। বুকে টান লাগে। সে তো বড় জ্বালাতন!

গরিবউল্লা ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে।

ছাগল দুটো সাকিলার দিকে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে। সাকিলা কাঁদতে কাঁদতে ডানদিক তাকাতেই ছাগল দুটোকে দেখে ফেলে। সাকিলা হেসে ফেলে। ছাগল দুটোকে বুকের কাছে টেনে নেয়—'ও আমার জানের কুদরত রে, জানের জান, বনের পঙ্খী, চাঁদের আলো, দেওয়ানার দেওয়ানা, পানির মাছ—হীরের দুল, মতির মালা।'

গরিবউল্লা শিরটা এবার টান টান করল। সোজা দাঁড়ায়। 'ছেনাল!'

সাকিলা ঠটকে গেল। মাটিতে মাথা ঠোকার তরাসে ছাগল দুটোকে দুহাতে সরিয়ে দিল রাগে দুঃখে। ঢ্যাঙা লোকটার দিকে কটমট তাকাচ্ছে। আনন্দের ছবিটা ভেঙে গেল। জখম দুটো হাত আর বুকটায় লাগা দাগা, কুঁদিমেরে ওঠার ভঙ্গিমায় হাত দুটোকে মেলে দিয়েছে দুদিকে, কোমর থেকে বুকটাকে এগিয়ে দিয়েছে সামনে। সাকিলা স্থির হল। কটমট তাকাল গরিবউল্লার দিকে। যেন সব পুরুষমানুষ এককাট্টা নির্দয় বা ধরন-ধারণে সাপের জাতের মধ্যে—এই বোধটা ফুটে উঠল সাকিলার নাকের পাটা ফোলানোয়, চোখের আগুনে। অথচ পোড়া বুকে আরো আগুন উসকে ওঠে। স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে সাপের জাত গরিবউল্লার দিকে। ডান নাকের কোঁচকানিতে ঘৃণা বিঁধে গেল। 'ঢ্যামন!'

গরিবউল্লা দুলে উঠল—'যাত্‌তারা কত্তে পারবি ভাল।'

'মোর নাম সাকিলা।'

'তাতে কী হয়েচে?'

'কেটে ফেলব এক্কেরে।'

'য়ু কি রূপের রূপ, মরে যাই তর জান্‌ না গুড়ায়।'

উঠে দাঁড়ায় সাকিলা। 'চিনিস সাকিলা খাতুনকে? ভাতার খেইচি, ছেলে খেইচি, মোর কেউ নেই, ভয় কাউরে করি নাই, কাতান দিয়ে বুক চারচির করে দোব—হাজুত যাব, জেলে যাব।'

সত্যিই সাকিলা চালের বাতা থেকে কাটারিটায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গরিবউল্লা মুহূর্তে টালমাটাল হয়ে গেল।

জলিল খাঁ বেরিয়ে এল খক্‌ খক্‌ করে কাশতে কাশতে।

সাকিলা টিপটিপিনি বৃষ্টির মধ্যেই এগনে থেকে লাফিয়ে উঠল উঁচু পাড়টায়, হাতে কাটারি নিয়ে। মাথায় কাপড় নেই। চুল খোলা। যেন তার কোনো শরমের আর দরকার নেই। কার কাছে লাজ-লজ্জা শরম-সহবত দেখাবে? ওই লোকটা? পিছোল মাটিতে টলতে টলতে আরো টলে সাকিলা। কাটারি ধরা হাতটা জ্বলে গেল। ঘাড় গড়িয়ে মোড়া বেয়ে কব্জিতে টন টন করছে একটা রাগ।

অশথগাছের তলায় গেলে সাকিলাকে একটু গড়ান বেয়ে নামতে হবে। এই সময় বেশি শাড়ির পাড় পায়ে বাধা টানে। ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে নামতে গেল সাকিলা। পিছোল মাটিতে পা হড়কে গেল। পাছাঠুকে পড়ে গেল। পিন পিন করে কোমরে একটা ব্যথা জেগে উঠল। চারদিকে দেখল কেউ নেই, কেউ তাকে দেখতে পায়নি। উঠতে পারছে না। গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরচ্ছে না। চারদিকে তাকাল সাকিলা। গলা নাক বুক কাঁপিয়ে মিহি কান্না বেরিয়ে এল। সত্যি কান্না।

ওদিকে বাপ হাঁকছে 'কোতায় গেলি মা সাকিলা—'

কাঁদার তার অনেকক্ষণ ইচ্ছে গিয়েছিল। কিন্তু একা এভাবে কাঁদা যায় না ভেবে উঠে দাঁড়াল হাঁটুতে ভর দিয়ে। কোমর খ্যাঁচ খ্যাঁচ করছে। বুকে নেপটে গেছে ভিজে শাড়িটা। জড়িয়ে ধরেছে। টান টান লাগে। এ-এক ব্যথা।

পেছন ফিরেই দেখল দাঁড়িয়ে রয়েছে কবিরপুরের ঢ্যাঙা লোকটা।

অশথগাছের ডালটা নুয়ে আছে। ডান হাতে কাটারি। বাঁ হাতটা তুলল শূন্যে। ঝাঁপিয়ে পড়ল, ডালটায়, কাটারির কোপ্‌ বসিয়েছে জোরসে। ব্যথাটা পেনিয়ে উঠল। অথচ তার ব্যথা লাগছে জানতে পারল না লোকটা। ডালটা কেটে পড়ল মাটিতে।

লোকটা সাকিলার সামনে এল। 'দাও কাটারিখানা, গাছে উঠে কেটে দিই।'

কাটারিটা তার বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরল সাকিলা 'বুক ফালা করে দুবো—খবরদার!'

লোকটা হাসছে খক খক করে। মেটে হাসি। 'তোর কী হল লো?'

'কিছু লয়!'

'শুধু মারতে মন যায়?'

সাকিলা আরো জ্বলে উঠছে। 'তোকে কিরে দিনু, মোর সনে কতা কইবিনি কবিরপুরের লোক।'

'কথা কইব না?'

'না!'

'কেন

সাকিলা আর কথা বলবে না। উঁচুটায় উঠে গেল। এক হাতে কাটারি অন্য হাতে অশথ ডাল। শাড়ি ন্যাপ্টাচ্ছে পায়ে। সে এখন এই লোকটার দিকে তাকাবে না। তার ভালো লাগছে না, তায়।

এগনে থেকে গলা বাড়িয়ে কান দুটো ছড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে ম্যা ম্যা করছে ছাগল দুটো। সাকিলা ডালটা খুঁটিতে বাঁধতে বাঁধতে চাদরে জুড়িসুড়ি বাপের দিকে বিষ চোখে তাকাল—'লোকটাকে আনলি কেন বাপ। কি ছিরির লোক—ঝ্যাঁটা মারি। মুই রাঁধবুনি খাওয়াবুনি, বলে দিনু।' একটা ছাগল খুঁটিতে বাঁধা পাতা খেতে খেতে সামনের পা-দুটো সাকিলার হাঁটুতে তুলে দেয়। সাকিলা টালমাটাল।

জলিল খাঁর কাশি শুরু হয়ে যায়। থামতে সাকিলা এগনের মাঝখানে চলে যায়। 'কেন, এমন করিস মা, লোকটা ভাল খুম।'

'ভাল?' সাকিলা দেখল লোকটা উঠে এসেছে এগনেয়। 'তুই ভাল লিয়ে থাক, তর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে তোকে বাঁধাব।' লোকটা কান খাড়া করে শুনছে দেখে সাকিলা রনঝনিয়ে রান্নার খুপরিটায় চলে যায়। টাঁটিটা টেনে দিল।

মেঝেয় খোঁচা দিয়ে আঁক কাটছে সে। সেই ভেতরে গুর গুর করছে। ভিজে শাড়িতে হিম হিম লাগে গা। শরীরের ভেতরের উত্তাপ বেরিয়ে আসছে। অনেক ভেতরের দাহ। সাকিলা চিড়বিড় করে।

বাপ সাঙাতের সঙ্গে কথা বলছে, কুটুমের সঙ্গে কথা বলছে।

সাকিলার যেতে এখন মন চাচ্ছে না। যাবে না। ছোট রান্নাঘরটায় বসে থাকবে কিছুক্ষণ। কেন যেতে মন চায় না, জানে না। এইটুকু মনে হয় ঐ লোকটার চোখের সামনে দাঁড়াবে না। লোকটাকে কতোবার দেখেছিল হাটে। নৌকোয়। ব্যাঙ ধরতে। এখন এই বাদলায় এল গা তো জ্বলেই।

কী চোখ ! সাকিলার যেন মনে হয় কিল ঘুঁষি মারে লোকটার সিনায় ।

অতো কিছু বোঝে না । সে-এখন লোকটার সামনে যাবে না । অশথ ডাল কাটতে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা দেখেছে । উঠেছে । ডাল কেটেছে । এখন লোকটা এগনেয় বসে আছে । চোখের সামনে যেতে পারবে না । গা তো জ্বলে ! লজ্জা ।

খস্ ।

সাকিলা পেছনের দিকে চোখ ফেরায় । তালপাতা নারকেল পাতার জঞ্জালের ভেতর থেকে একটা মুখ । একটা সাপ বিড়িশ পাকিয়ে রয়েছে । জাতসাপ । গা বেয়ে হিম বহে যায় সাকিলার । ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে এসেছে । এক হাত দূরে মরণ । সাকিলার ভেতরটা জমে যাচ্ছে । ভেতরে একটা শিহরণ । মরণ দেখে প্রাণটা হু হু করছে । সাপটা মুখ বাড়াচ্ছে । ফনার ডালিটা চুপসে আছে । কালো জিবটা বার করছে থেকে-থেকে । সাকিলা পাথর । এই সময় কতো সত্যি কান্না উথলে উঠছে । নিজের মরদ মরে যাবার শোক । নিজের ছেলে । গাছ থেকে পড়ে লোকটা ধড়ফড়িয়ে মরে গেল । পরের বছর ছেলেটা মরল ডুবে । সেও মরে যাবে ? না । ঠোঁট দুটো কাঁপছে । বুক গুর গুর করে উঠছে । গলা আঁঠা । এ-বছর পুঁইমাচা ভরে গেছে । ঢেঁড়স গাছগুলো এখনো ফলে । মরে যাবে ? কতোদিনের সাধ একরঙা নীল শাড়ি পরবে । কুঁচি দিয়ে । মরছে সে । মরছে । কান্না উথলে ভাঙাভাঙি করছে ভেতরে । সাকিলা নিথর । পাথর ।

বাপ জলিল খাঁ, গরিবউল্লা কী সুখে আছে ! কথা বলছে । হাসছে । সাকিলার খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে এখন । ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে । বেঁকে যাচ্ছে । শীতল শীতল ।

সাপটা এগিয়ে এল । এপাশ ওপাশ মুখটা নিয়ে যাচ্ছে । নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সাকিলার । কতো সুখ সরে সরে যায় । কান্না । এ জীবনে কিছু না পাওয়ার কান্না । মরবেই । মরে যাবে সে । আবার সাপটা বাঁদিকে এল । ডান দিকে যায় একবার ! না যাচ্ছে না । এক-চক্কর এলে ফোঁস করে লাফিয়ে ঠিক হাঁটুতে চোট বসাবে । ডান দিকে যাচ্ছে না । বাঁদিক ধরে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে ।

ভেতরে বুঝি কোকিল ডাকল 'কু' । তাই কি ! বুক থেকে উঠে এসে নাকে এসে জমে গেল কান্নার স্বর ।

বাঁদিকেই রয়েছে । এগোচ্ছে পিছোচ্ছে । হায় ! মানুষগুলো সব স্বার্থপর । সে-ই মরে যাবে ? একেই সোয়ামি ছেলে পেল না । আর ভাল বর পেল না, ঘর পেল না । তাতে কি ? হু হু করে কান্না আসছে । সাপটা বাঁদিকেই এগোচ্ছে পিছোচ্ছে । এক-চক্কর আর এগোলেই মৃত্যুকে ছোঁবে সাকিলা ।

সাপটা ডানদিকে যাচ্ছে । ডান দিক কিছুটা হটে আবার বাঁদিক । আবার ডানে । ডানেই । আরো । আরো, আরো একটু । সাপটা সরে যাচ্ছে বলে কান্না আরো উথলে উঠছে কেন আরো ? সরছে সাপটা । জঞ্জালের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে । সাকিলা 'কু' ধরে কঁকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টাটির ওপর । এগনেয় বেরিয়ে আসছে আওয়াকাউরানিতে । আলুথালু হয়ে সামনে খুঁটি না পেয়ে গরিবউল্লার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল । 'উ হু হু হু—মরে গেনু গো ।'—

গরিবউল্লা হঠাৎ আরো লম্বা হয়ে যায় । পেছু হটতে পারল না ।

সাকিলা ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকটার বুকে 'ওগো সাপ গো !'

বাপ এগনেয় নেই । বাগানে পাতা কুড়োতে গেছে ।

সাকিলা গরিবউল্লার বুকে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছিল । মুখ তুলল ।

লোকটা মিট মিট হাসছে ।

আরো কিছুক্ষণ গরিবউল্লার সিনায় থাকতে পারল না সাকিলা । দুপা পিছিয়ে গিয়ে আগুন চোখে তাকাল লোকটার দিকে ।

লোকটা হাসছে—'ছেনালি !'

সাকিলা কি করবে আর, ঘরের ভেতর গিয়ে লজ্জায় অপমানে ডুকরে কেঁদে উঠল । সত্যি কান্না ।

আর তখন বাইরে ঝড়ের সঙ্গে হু হু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ।

হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টির ছিটেয় চুলোর জ্বাল বার বার নিভে যাচ্ছিল । ভিজে পাতায় ধোঁয়া হয় বেশি ।

পরের রুটিটা বেলা হয়ে গেলে রুটিটা উল্টে দেয় । তখনই গরিবউল্লা পিটিয়ে-কোমর ভেঙে দেওয়া মৃত সাপটাকে ফেলে এসে রান্নার দরজায় মুখ বাড়াল ।

সাকিলা একবার শুধু দেখে নিয়েছে । 'যাও যাও ঘরকে যাও দিকি ।'

লোকটা নড়ল না ।

চুলোর আগুন নিভে গেল । লোকটা গেল না । 'অমন করে গায়ের পাশে দেঁয়ড়ে কেন—যাও যাও ।'

আবার নিভে গেল আগুন । 'যাবে কি-না ?'

'কেন, আর যদি সাপ এসে ?'

সাকিলার সারা-গা আবার ঝেমরে ওঠে । তবু বলল 'যাও, ঘরকে যাও ।'

গরিবউল্লা নড়ে চড়ে উঠল 'ঠ্যাণ্ডায় শরীল কাঁপচে লয় ।'

সাকিলা এবার পেছন ফিরে দেখল । লোকটা থর থর করে কাঁপছে । গায়ে কোনো বস্ত্র নেই । একটা ভিজে গামছা কোমরে জড়িয়ে থর থর কাঁপছে । নৌকোডুবিতে ফিরে এসে এমন করে সেদিনের কবিরপুরের লোকটা কেঁপেছিল ।

আবার আগুন নিভে যায় । চোঙা দিয়ে ফুঁ-দেয় ।

লোকটা চলে এল চুলোর মুখে ।

বাপ জলিল খাঁ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে । মুখ বাড়ায় 'কিগ থর থর কাঁপচু যে মল্লিকের পো । বিড়ি লও, গা গরম করো ।' জলিলও চুলোর মুখে এসে বসে ।

দুজনে বিড়ি টানছে ।

লোকটা বলল 'গওস মিঞার কাগুটা শুনলে তো গো চাচা !'

'লদীতে অতগুলা লৌকো, মানসে ট্যাকার গরমে কতো কি করে ।'

লোকটা বলল 'মোর কেউ নেইগ চাচা, মোর জ্যাল হাজুতের ডর নাই'—

সাকিলার কানের পাশ দিয়ে ফিসফিসিয়ে গেল গরিবউল্লার কথাটা ।

'খুন হয়ে যাব ।' লোকটা হাত ডুবিয়ে দিয়েছে আগুনের ভেতর ।

ঘরের ভেতর থেকে সাকিলার মায়ের হাঁপের শব্দের সঙ্গে নাকের কুঁই কুঁই শব্দটা বাড়ল । বাপবেটিতে চোখাচুখি । জলিল খাঁ যেন ভয়ে উঠে গেল ।

লোকটা আগুন সেঁকছে ।

আবার জ্বাল নিভে যাচ্ছে ।

সাকিলা তাকাল লোকটার দিকে । 'ঘরকে যাও কেনে ?'

'থাকি না ।' লোকটা আরো জাঁকিয়ে বসছে । 'মুই সি লোক লয় ।'

'লোকের মুয়ে আগুন, যাও দিকিনি ।'

'কেন কেন ?'

'কেন আবার, যাও দিকি ।'

'তোর রূপ আছে নাকি ?'

ধাঁ করে মুখ ফেরাল সাকিলা । চোখে চোখ । 'মান রাখ মল্লিকের পো ।'

খিক খিক করে হাসে গরিবউল্লা । 'মানি লোক তো লয় । এই উটচি ।' লোকটা উঠে দাঁড়ায় এমন যে চালে না মাথা ঠেকে, ওপরের দিকে হাত তুলে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে সারা শরীরে একটা মোচড় দিল । মট্‌মট্ । বেরিয়ে গেল লোকটা ।

সাকিলার আবার কান্না পায় । জ্বলে যাচ্ছে সারা শরীর ।

বাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এল । 'তর মায়ের অবস্তা আরো খারাপ ।'

মেয়েমানুষের কান্না বুকের ভেতর ঠেলেঠুলে উঠছে । বাইরে দমকা ঝড় আর বৃষ্টি পতনের জমাট শব্দ । হু হু করে কাঁপে সাকিলা, হু হু করে কাঁপছে বাইরের গাছপালা, মাটিতে এক-পা গেঁথে ।

টালির চাল আর সইতে পারল না । মচকে থাকা পুরনো বাখারি পাড় ঝড়ের দাপটে বসে গেল । দক্ষিণের ছাটে ছিটেবেড়ার দেওয়াল ধুয়ে ধুয়ে কঞ্চি দেখা যাচ্ছে । আর বাইরের অন্ধকার । চাল ফুটো হয়ে বৃষ্টি সারা মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে ।

বাপ জলিল খাঁ কাশছে । 'বিস্টির কি আটম্বরি ।'

লোকটাও ঘুমোতে পারে না । দেওয়ালে পিঠ

য় বসে। 'না আজ আর থামবেনি।'
'তুই ভিজচিস বাপ গরিবউল্লা?'
'উ কিছু হবেনি, তোমাদের বয়স গা চাচা।'
মায়ের মাথার কাছে চুপটি করে বসে সাকিলা
ক। 'গুণটা মাতাকে চাপ্‌পে লিলেই হয়।'
'থাক।'
সাকিলা আর অনুরোধ করতে পারে না। সে
য় তার মা উত্তর কোণের দেওয়াল ঘেঁষে আছে।
। সামনেটায়। পশ্চিম দেওয়াল ঠেসে
বউল্লা। চাল ফুটো হয়ে ছরছরিয়ে পানি পড়ছে
কটার সামনে। মাঝে মাঝে বদনাটা বসাচ্ছে
কটা। ভর্তি হয়ে গেলে ফেলে দিচ্ছে নুয়ে নুয়ে
া লোকটা।
সাকিলা বলে 'চালের পানিটা এবরে বেশি
চে লয়?'
লোকটাকে বলা অথচ লোকটা কোনো উত্তর
চ্ছে না।
সাকিলা বড় বড় নিশ্বাস ফেলে। এ-পাশ হয়
পাশ হয়। বসেও যেন সুখ নেই। 'তবে যে
রের দিকে ঝড়পানি থেমে যাবে?'
লোকটার কোনো উত্তর এল না।
সাকিলা গুমরে উঠছে।
সবাই চুপচাপ। নিথর। বাপও। লোকটাও।
য়র হাঁফ ও নাকের শব্দ। কল কল পানি পড়ছে
া ধরে। সাকিলার রাগ ধরছে। সাকিলার যেন
নেই গুণ নেই। সাকিলা যেন ডাগরটি নেই।
যেন মেয়েমানুষই নয়।
বাইরে গাছপালাগুলো হু হু করে ভিজে যায়।
যায়। মোচড় খায়। কতো গাছ বুঝি এই ঝড়ে
ড়াল, ভাঙল। ঝড়ের ঝাপটা শুধু বাইরে থাকে
ভেতরেও। এই রাত জেগে নীরবতার মধ্যে
র মাটি খসার শব্দ ঝুপ ঝুপ করে হয়েই চলে।
তে যেমন একূল জেগে ও-কূল ভাঙে। তখন
য়ারে পাড় ভাঙার শব্দ।
লোকটা ভূতের মতো বসে আছে দেওয়ালে
দিয়ে। টিমটিমের আলো বাতাসে কাঁপে।
ঘরের অন্ধকারটা এরকম কাঁপেই।
সাকিলা এখন সাকিলা নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে
ড়ছে। বাপ হাঁটুতে কপাল দিয়ে ঝিমচ্ছে। আর
কটা একটা ছায়া। ছায়াটা নিরেট হয় না কখনো
কলার মনে। হয়তো, হয়তো নয়। নয়তো,
তো নয়।
বাইরে ঝড়ের দাপট আরো বেড়েছে।
ঘরের নীরবতার মধ্যে হঠাৎ গোঙানো শুরু হয়ে
। একটা গোঙানির শব্দ।
তবুও লোকটা সেইভাবেই বসে আছে।
হঠাৎ নাক দিয়ে ভয়ানক সিটি বেরিয়ে আসে
কলার।
বাপ উঠে পড়ে। নাড়া দেয়। 'কি হল মা
র, সাকিলা?'
সাকিলা কোনো কথা বলছে না।
জলিল খাঁ চ্যাচালো—'গরিবউল্লা?'
লোকটা খাড়া হয় 'কি হল?'
ঝড়ের রাতে সাকিলার নাকের শব্দটা আরো
ভয়ার্ত রূপ নিল।
'ও মা সাকিলা, গরিবউল্লা?'
'কেন এমন করে?' নিস্পৃহ স্বর গরিবউল্লার।
জলিল খাঁ মেয়েকে নাড়াচ্ছে 'সাকিলা গো।'
মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায়।
হঠাৎ সাকিলা ধড়মড়িয়ে বসে। গোপন রূপ,
সমস্ত বয়েস উদোম হয়ে যায়। চোখ দুটো ঠেলে
বেরিয়ে এসেছে। হাত দুটো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল
অপ্রস্তুত জলিল খাঁর গলায়। জলিল খাঁর
কণ্ঠনালিতে হাত দুটো চেপে ধরেছে।
আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে গরিবউল্লা। ঝাঁপিয়ে
সরিয়ে দেয় জলিল খাঁকে সাকিলার হাত থেকে।
বাইরে ঝড়টা আরো বাড়ছে।
সাকিলার চোখ দুটো জ্বলছে। ঝাঁপিয়ে পড়ো
পড়ো মূর্তি। ঝাঁপিয়ে পড়ল গরিবউল্লার ওপর।
গরিবউল্লা কাত হয়ে গিয়েই ধাক্কা মেরেছে
সাকিলাকে। তাতে আরো ক্রোধ বেড়ে গেল
সাকিলার। হাত দুটো সাঁড়াশির মতো চেপে মুচড়ে
দেয় গরিবউল্লা। দেওয়ালে চেপে ধরল। 'এবার?
তুই কে?'
হা হা হি হি করে হাসছে সাকিলা। হাসছে।
কাঁদছে।
জলিল খাঁ উঠে বসেছে—'মেয়েকে জিন ধরল
গো।'
চোখে প্রাণ নিয়ে নির্জীব পড়ে থাকা সাকিলার
মা উসখুস করে।
গরিবউল্লা হাঁটুমুড়ে টান টান। 'তুই কে বল?'
'হি হি হি হি' হাসছে সাকিলা।
'বল, তুই কে?'
'বলব না, বলব না।' ছেলেমানুষের মতো
ইনোচ্ছে।
'তুই এয়েচিস কেন?'
'উ কেন বাইরে রুটি খাচ্চিল পেঁজ
দিয়ে—মোকে দিলুনি, তাই এনু।' হাসছে হি হি।
'তুই যাবি কি না বল?'
'বলবুনি।'
'তোর নাম কি বল?'
'আগে পানি দে।'
বাঁ হাতে চুলের মুঠি চেপে ধরে গরিবউল্লা।
'নাম বল।'
'উ উ উ হু হু হু—ছাড়, মুই মিদ্দেজের বউ,
মোকে মরদ গলা টিপে মারল—এট্টু পানি দিলুনি
গলায়—পানি-পানি— মোর জেবন বড়ো কষ্টের
গো, মোকে তমরা কষ্ট দিউনি—এট্টু পানি দেও।'
'পানি তোকে দুবনি—নরক খাবি? চলে
যা—কেন ভাল মেয়েটোরে ধরেচিস—অর দুঃখ
কত, সোয়ামি নাই, ছেলে মরেছে।' চুলের মুঠি
আরো মোচড়ায়।
'অর দুঃখু বলে তো এনু, কেউ অরে বে করেনি,
রূপ আছে যৈবন আছে, সাত গাঁয়ে এমন
মেয়েমানুষ খুঁজলে পাবেনি।'
'তাই অকে ধরেচিস? ছাড়।' চুলের মুঠি
মোচড়ায়।
'ছাড় ছাড়—পানি—পানি। উ উ উ হু হু হু।'
গরিবউল্লার বুকে ঢলে পড়ল সাকিলা। জ্ঞান
হারিয়েছে। দাঁতের পাটিতে আঙুল দেয়। চেপে
বসে আছে।
জলিল খাঁ কাঁপছে, 'কি হল?'
'ছেড়েচে।'
গরিবউল্লা এবার সাকিলাকে কোলে শুইয়ে
নেয়। ঘেমে নেয়ে একশা। শরীরে মুখে পাখা
টানছে। বদনার পানি মুখে ঝাপটা দিচ্ছে। 'ও
চাচা, মেয়েটো সত্যি দুখী লয়?'
'শুদু কাঁদে।'
'মেয়েমানুষের কান্না এমন পারা-ই।'
চেপে থাকা দুপাটি দাঁতে আঙুল ঢোকাচ্ছে
গরিবউল্লা। সাকিলা ভাবে দাঁত ফাঁক করে
আঙুলটা কামড়ে নেবে। কিন্তু না। আরো কিছুক্ষণ
গরিবউল্লার কোলে শুয়ে থাকবে। লোকটা
বাঁ-হাতে পাখা টানছে সারা শরীরে। আঙুলটা দিয়ে
চাপ দিচ্ছে। দাঁত কিড়মিড়। কতক্ষণ পারবে ওই
জোয়ান মরদটার সঙ্গে? আরো একটু লোকটার
কোলে শুয়ে থাকতে হলে আরো দাঁত চেপে
থাকতে হবে। লালায় মাখামাখি আঙুলটা আরো
একটু থাকুক। আরো একটু থাকুক। আঙুলটা
খেলছে। ঢুকে গেল গেল। এই। এবারেই।
দীর্ঘস্বর। চোখ মেলল। হাত দুটো হঠাৎ চেপে
ধরল 'কে কে?' কোল থেকে নেমে গেল
সাকিলা। পিছিয়ে যায় একহাত। মেয়েমানুষের
শরম থাকা দরকার।
'ও বাপ, মোর কি হয়েছিল?' স্বরটা কতো দূর
থেকে যেন বলছে। শরীরে মনে দিগন্তরেখার
আবেশ।
'উ কিছু লয়—দেখ-দিকি ফের ঝড়পানি
বাড়ল।'
ঘরের যেখানে বৃষ্টি পড়ছে সেখানে সরে গিয়ে
বসে গরিবউল্লা।
সাকিলা বলল, 'অমন করে ভিজবে?'
'কেন?' লোকটার মরদপান্না রাগটা আবার
চড়ে উঠছে।
'গায়ে পানি লাগচে যে।'
'লাগুক।' লোকটা ছায়া।
জলিল খাঁ ঝিমোচ্ছে। গরিবউল্লা ছায়া।
সাকিলা উঠে দাঁড়াল। চালের দিকে তাকাচ্ছে।
চুলগুলো উড়ছিল হাওয়ায়। খোঁপা গলিয়ে নিল।
লাদনার বাঁশে ঝুলে পড়ল। দেওয়ালে পা ঠেকিয়ে
উঠে বসল লাদনায়। ঝুল মাকড়সার জাল মুখে
ভরে উঠল। মচকে যাওয়া বাখারি, টালি ঠেলে
নেমে এসেছে। তা থেকে পানি পড়ছে কল কল।
'শুনচ, বাখারি সরিয়ে দিয়ে টালিগুলো
সরিয়ে-সরিয়ে দিলে হয়।'
লাদনায় বসে বসে পা দোলায় সাকিলা।
লোকটা উত্তর দিল না। 'শুনচ?' যেন সোয়ামিকে
ডাকে সাকিলা। অবার—'শুনচ?'
'কেন কী হল?' সেই পুরুষমানুষের রাগ।
'উঠে এসো দিকিনি।' নিপাট গৃহিণীপনা।
গরিবউল্লা ইড়িশবিড়িশ কাটে।
'এসো না।' অনুনয়।

লোকটা উঠে দাঁড়াল। সাকিলার বুকটা গুর গুর করছে। এক লাফে লাদনায় উঠে পড়ল। মুখোমুখি। চোখাচুখি। গরিবউল্লার নিশ্বাস লাগল সাকিলার বুকে। সাকিলা খোঁচা মারল, 'বাখারিটা ঠেলা মারো দিকি।'

গরিবউল্লা বসে বসে ঠেলা মারল, 'বাখারির আবস্তা!'

'কুনু-রকমে চাপাচুপি দাও দিকি।'

গরিবউল্লার পায়ের টিপনিতে বেঁকেচুরে যাওয়া শরীরটা চালটাকে চাগিয়ে তুলছে। গামছা পরা লোকটা। সারা শরীর আদুল। পিঠ-বুক-পা-হাঁটু-কোমর-কাঁকাল সবটা একসাথে কাজ করছে। যেমন নৌকোতে করে। টালিগুলো ঠিক করে দিল।

'দেখলে তো আর পানি পড়চেনি।'

গরিবউল্লা গামছায় মুখ মোছে।

'এখেনে বসে থাকতে বেশ লাগচে লয়?'

'কে বলল?'

গুম খেয়ে গেল সাকিলা।

লোকটাও নামছে না।

ঝড়ের দাপট আরো বাড়ছে। হয়তো প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

লোকটা বলল, 'চুড়িও পরনি। আওয়াজ হয়নি।'

'না।'

'ও।'

'ঘাড়টা ব্যতা করতেচে, চুলেও।'

'কই দেখি।' ঘাড়ে হাত দেয় গরিবউল্লা। 'কিছু হয়নি।' হাতটা সরিয়ে নিল।

'কবিরপুর গেরামটা বড় খুম?'

'বড়।'

'গা সব ভিজে কাঁপছি।'

'কাঁপছিস?'

'কেঁপে কেঁপেই মরনু।'

'শুদু শুদু কান্না পায়?'

'কাঁদি।'

'কেন?'

'কেন আবার।'

'বল্ না।'

'জানুনি!' কথাটা ফিসফিসিয়ে বেরল। যেমন বাতাস বয়। বাতাসে ফুলের গন্ধ বয়। আকাশের মেঘ দূরদেশে চলে যায়, তেমন।

পা ঝুলিয়ে দুজনে মুখোমুখি। চোখাচুখি। ঝড় বইছে।

আঁচলটা নিংড়োয় সাকিলা। 'দেখচ কতো পানি?'

'আঁচলটা দে, মাতাটা মুছি।' আঁচলটা টেনে নেয় গরিবউল্লা জন্তুর মতো।

'মাতা যে সব শপ্ শপ্ করচে—জ্বর হলে?'

আঁচলটা ফিরিয়ে দেয় গরিবউল্লা।

মাথায় হাত দিয়ে দেখে সাকিলা। 'আহা হলুনি—এখুনো ভিজে।' মাথায় আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়।

'থাক থাক, হয়েচে।'

সাকিলা পা দোলায়। 'এই র‍্যাতে কি নিদ এসে?'—

'গওস মিঞা পুলুস লাগগেচে জানো?'

'অ্যা!' আঁতকে ওঠে মেয়েমানুষের সব সময়ের তরাস তরাস শরীর।

'পায়লে পায়লে ঘুরচি, ই গাঁ সি গাঁ—ই জেলা সি জেলা। আগাশ ছাড়লেই চলে যাব।'

'কুথাকে যাবে?' ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠছে সাকিলার।

'সি কি ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে সাকিলা।

ঝড় বইছে বাইরে। বৃষ্টি পতনের শব্দ।

'আরে কাঁদে দ্যাক্—তুই মোর জন্যি কেন কাঁদবি?'

'যি-মরদরা মরণ বুকে লিয়ে ঘুরচে তার জন্যি কাঁদবুনি—জলজ্যান্ত মানুষ মরে যায়। সি লোকটা মরে গেল। ই-জানটা উসব শুনলেই কাঁদে কঁকায়। তহন দেলে বাছবিচার নাই, পেরেক-সাটা দেলটা কহন কাঁদে ঠিক নাই গ, রাত নাই, দিন নাই—পরানটা খাক খাক করে জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। তমার জন্যিও কাঁদচি।'

'ও, অত দরদ কেন?'

সাকিলার কান্নাটা থমকে গেল।

'কান্না থামা, ছেনালি!'

সাকিলা গুম মেরে গেছে।

লোকটা লাফিয়ে নীচে নামল।

'তুমি তো বড় নিদ্দয় লোক।'

'বললে, তাই।'

'মুই তমার জন্যি কি কাঁদচি?'

'তবে কাঁদ্।'

'ওরে ইবলিসের বংশ।'

দেওয়াল ঘেঁষে লোকটা শুয়ে আছে।

'শত্তুর, শত্তুর।'

লোকটা নিঃসাড়ে পড়ে আছে। দেওয়ালের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুঁয়ে যায় শরীরটা।

'এই সাপের বাচ্চা, বেইরে যা ঘর থিকে।'

লোকটা নাক ডাকাচ্ছে।

সাকিলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে।

সকালবেলা মেঘ কেটে এমন রোদ খেলবে কে ভেবেছিল! গাছে গাছে পাখ-পাখালির ছোটাছুটি ঝাঁপাঝাঁপি। হাটগেছের বাঁধে লোকের আনাগোনা। সাকিলার খুঁটি ধরে সেদিকে আনমনা হতে ভালো লাগে। একটু। তারপর রেগে যাক। তারও পর কাঁদুক। এই নিয়েই তো তার দিন কাটে। একটু আনমনা হলই।

গরিবউল্লা টেরি বাগাতে বাগাতে বেরিয়ে এল। 'কামিনী উদিক পানে তাকাকে কেন?'

সাকিলা কথা বলে না।

'ঠোঁট বলছে হাসি, তবু হাসিস না?'

মুখটা বুকে নামিয়ে নিল।

'সকালে দেখে মনে ধরে কতো কতো যেন তরে দেখেচি।'

সাকিলা গরিবউল্লার স্বতস্ফূর্ততাকে ছুঁয়ে দিল, 'কোতাকে দেখেচ?' মুখটা ফেরায়।

'তকে যেন চিনি।'

'লদীর ধারে ঘর মোর, দেখলে আগে দেখবে—আগেই যা এসুনি।'

'আবার কবে এসি।'

'কেন?'

'ডাঙায় ঘুরি, লদীতে ঘুরি, ঠিক তো নাই।'

'মোদের ঘর তো লদীর পাড়ে।'

সাকিলা আর কথা বলতে পারে না। খুঁটিতে বুক-মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁপে।

বাপ ঘরের ভেতর গরিবউল্লাকে নিয়ে গেল। দুজনে বাসি রুটি খাচ্ছে। হাসছে লোকটা কী বিকট। কতো কথা বলছে ফটফটিয়ে। সাকিলা খুঁটিটাকে আঁকড়ে ধরে। দূরে চোখ নিয়ে যায়। কতো দূর। চোখ ও মনে স্থিরতা। কতো দূরের আকাশে তার চোখ যেতে পারে। কতো অজানা-উদ্দেশ। কতো-কি!

গরিবউল্লা বেরিয়ে আসার আগে সাকিলা কাঁদালের দিকে চলে যায়। এক হালসি চুড়ি কিনে তুলে রেখেছিল। পরে নিয়েছে দুগাছা করে। এখন বাজে। এখনো ডিবের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে অনেকগুলো। লোকটা চলে যাবে। যাবার আগে খুঁজতে হবেই তাকে। দেওয়াল ঘেঁষে দেওয়ালের মাটি ছাড়ায় একা একা।

লোকটা বাপের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ফটফট করে কতো কথা বলছে। ছাগল দুটোর গায়ে হাত বুলোল। আবার ঘরে ফিরে গেল মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকা মায়ের কাছে। আবার বেরিয়ে এল। বুকটা কাঁপছে সাকিলার। খুঁজতে খুঁজতে এদিকে আসবে। তখন! বুকের ভিতর ধুপ ধুপ শব্দ। ছুটে পালাবে না। আবার দাঁড়াতেও কেমন লজ্জা করছে। লোকটা বাপকে তাড়া দিচ্ছে। হয়তো ভুলে গেল। যাবার জন্যে পাগল। না ভুলেই গেছে। সাকিলা বেরিয়ে আসে চুপি চুপি এগনেয়। গরিবউল্লা তখন লুঙ্গি তুলে দেওয়াল ঘেঁষে উঠে আসা পানিতে নামার জন্যে ব্যস্ত, তখন ঠোঁট চেপে সাকিলা এগনেয় এসে দাঁড়াল ফিসফাস। তবুও লোকটা ফিরল না। সাকিলা বেহায়ার মতো গলা ঝাড়ল। তবুও গরিবউল্লা নেমে গেল পানিতে। বাপের সঙ্গে ছপ্ ছপ্ পার হচ্ছে।

সাকিলা খুঁটিটা বুকে চেপে ধরল জোরে। ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। লোকটা চলে যাচ্ছে। যদি একবার ফিরেও তাকায়। না। ঠোঁট বেঁকেচুরে যায়।

নতুন পরা হাতের চুড়ি খুঁটিতে চেপে ধরে। রক্তের ভেতর ঢুকে গেছে কাঁচের চুড়ি। দুটো দুটো কাঁচের চুড়ি ভাঙল।

ডিবেয় আরো অনেকগুলো চুড়ি আছে ভেবে সাকিলা খানিক বাদে আশ্বস্ত হবে, কিন্তু এখন সে কান্না থামাবে না। কাঁদতে কাঁদতে এই লোকটাকেও গাল দেয় 'ড্যামন।' আর বিকেলবেলা যে চোখে কাজল টানবে, তার জন্যে এখন কান্নাটা কমাতে পারবে না। বরং চোখ দুটোতে সেঁক দিয়ে নেবে। □

অন্য আলাউদ্দিন

সঞ্জয় সেন

মাইহার স্টেট
ভীন্দ্র প্রদেশ
১-১২-৫১

গবর—
র
ন দাদু, তুমার পত্র এই মাত্র পাইলাম, তুমার মঙ্গল জেনে সুখি হলেম দয়াময় প্রভু ইকে কুশল রাখুন এই প্রার্থনা করি। আবার যে কবে এমোন সংযোগ হবে কবে ভগবানই যানেন, যদি ভাজ্ঞে থাকে তবে সাক্ষাৎ হবে। আমার বয়স হয়েছে ৮২ রর বুড়ো কখন কি হয় তা বলা যায় না, য় রহিলাম ভগবান আবার তুমাদের সঙ্গে দেখা ৎ করান এই আশা করি। দিতিয় পক্ষ হল আমি হলেম বুড়ো, যৌবন আর বুড়োতে যা হয় আমার তাই চলছে। অলঙ্কারে বেশ দেখতে কিন্তু তার নাজ নখরাতে বিরক্ত হয়ে কখন ২ যেন সুর বেশ মনেহয়, গরমে চামড়া. গেলে বাজাতে ইচ্ছা করে না। যৌবন প্রাপ্ত বুড়ো পতির সঙ্গে যেমন ঝগরা হয় আমারই অবস্তা ঘটে। যখন তার মিজাজ ভাল থাকে আনন্দ দেয়। ছেলে যামাতার যোগল বন্দি শুনে আনন্দ পেয়েছ জেনে সুখি হলেম। নাতি আমি যোগল বন্দ বাদ্য রূজ ৮ ঘন্টা করে য়ে থাকি দুইবেলা সকাল আর বিকালে। ই সঙ্গে বাজাতে হয় তার শিক্ষার জন্য র্ব্বাদ করিবে নাতিটি যেন বাজাতে পাড়ে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে এস নাতি দাদুর যোগ বন্দ যাও, সকলে এলে সন্তুষ্ট হব। শ্রীমান সন্তোষ ঠাকুর নাতিটির পুত্র পেয়েছি এতে আনন্দ পেলেম ভগবান তাহাধিগকে সুখে রাখুন। তুমার দাদা দাদুকে, ও তুমার বন্ধুবান্ধব সকল কে আমার স্নেহ আশির্ব্বাদ জানাবে।

এক প্রকার আছি তুমাদের সকলের কুশল কামনা করি ইতি

দাদু

আলাউদ্দিন খাঁ
মাইহার স্টেট

হিন্দী লিখা ঐভ্যাষ করিতেছি
দাদু ডা· আলাউদ্দিন খাঁ

পুন তুমার দিদি মার আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিও
নাতি নাতিনদের নমস্কার গ্রহণ করিও—

দাদু

হালকা নীল কাগজে লেখা একগুচ্ছ চিঠিতে ভারতীয় সংগীতের কিংবদন্তী প্রতীম মানুষটির এক টুকরো ভিন্নতর সত্তা উঁকি দিয়ে যায়। কখনও বাৎসল্যে উচ্ছল, কখনও রসিকতায় উজ্জ্বল। যিনি 'দাদু'র সঙ্গে রঙ্গ করেন 'সুন্দরী দিতিয় পক্ষের' নাজ নখরা আর গরবিনী মেজাজ নিয়ে। এই রঙ্গের রহস্যের মধ্যে দিয়েই আবার মাঝে মধ্যে এক পা, দু'পা করে চকিতে হেঁটে যান সুরের নেশায় ঘরছাড়া চিরকালের তাপস মানুষটি। বয়সের দুর্মর বোঝাটাকে অনায়াসে অস্বীকার করে যিনি দু'বেলা আট ঘণ্টা করে যুগলবন্দীর রেওয়াজ করেন নাতির সঙ্গে। নাতি, আলী আকবরপুত্র ধ্যাণেশ। এবং 'শ্রীমান দাদু' রেবতীনন্দন দাসমহাপাত্র। যে পরিচয়ের সূত্র ধরে এই একগুচ্ছ চিঠির উন্মোচন সে পর্বটুকুও আকস্মিকতায় মোড়া।

১৯৫১ সালের মারচ মাস। অল ইনডিয়া রেডিও-র কটক কেন্দ্র থেকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র সরোদ শোনাবার ব্যবস্থা করা হল। শুধু বেতারেই বাজনা শোনানো নয়, একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর সরোদ পরিবেশনেরও আয়োজন করলেন রেডিওর কর্তারা। দিন ঠিক হল মারচের শেষাশেষি। রেবতীনন্দন নিজেও কটক কেন্দ্রেরই কর্মী। প্রোগ্রাম অ্যাসিসট্যান্ট। তাঁর জবানীতেই তুলে দিই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি।

সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। ভুলবোও না হয়ত কোন দিনই। তারিখ এই মুহূর্তে মনে না পড়লেও ১৯৫১-র মারচের শেষ সপ্তাহই হবে। অল ইনডিয়া রেডিও তখনও 'আকাশবাণী' হয়নি। এমনই একদিন কাকভোরে একটা রিকশা এসে দাঁড়াল কটক হোটেলের দরজায়। এক বৃদ্ধ সওয়ারী বসে আছেন। পায়ের কাছে একটা হোলডঅল আর সুটকেস। আর বুকের কাছে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরা মখমলের কাঁথায় ঢাকা তারের যন্ত্র!

পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াতেই হল। এ তো সেই পরিচিত মুখ। ছোট্ট এক চিলতে শুভ্র শ্মশ্রু থুতনি ছুঁয়ে রয়েছে। সাদাসিধে পোশাক! আর যাওয়া হল না।—দাদু, আপনিই কি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ?
—হাঁ, কেন? তুমি কে?
পরিচয় দিতেই একটু যেন উন্মনা হলেন। চোখের তারায় চলকে উঠল স্মৃতির আভাস।

—তুমি কি যাদুদার কেউ হও নাকি? আমার গুরুভাই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যাদবেন্দ্র নন্দনের পদবীও ছিল দাসমহাপাত্র। তুমি কি তাঁর কেউ?

এবার চমকের পালা আমার। মেদিনীপুরের পঁচেট গড়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুণী যাদবেন্দ্র নন্দন তো আমারই ঠাকুরদা যোগেন্দ্র নন্দনেরই অগ্রজ। সুরের নেশাতে তিনিও একদিন ঘর-ছুট হয়েছিলেন। জমিদারি রাজস্বের টাকা নিয়ে সোজা উধাও রামপুরে। সঙ্গী বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক হাবু দত্ত। বিবেকানন্দের জ্ঞাতি ভ্রাতা। রামপুরে সেনী ঘরানার বীণকার বংশের অদ্বিতীয় শিল্পী ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ-র কাছে নাড়া বেঁধে তিনি তালিম নেন সুরবাহারের। তিনিই ছিলেন পূর্ব ভারতের প্রথম সঙ্গীতগুণী যিনি তানসেনের সরাসরি বংশধরের কাছে তালিম পান। কিন্তু সেতো অনেক আগের ঘটনা! ওস্তাদ আলাউদ্দিনের তালিম নেওয়ার অন্তত বছর কুড়ি আগের কথা। এত তীক্ষ্ণ ওঁর স্মৃতিশক্তি!

পরিচয় মিলতেই খুশির হাসিতে ভরে গেল বৃদ্ধের মুখ। রিকশা থেকে নেমে পড়েছেন ততক্ষণে। বুকের কাছে জড়ানো মখমলে ঢাকা সরোদ।

—তুমি তো তাহলে আমারও নাতিভাই! যাদুদাও যে আমারই মত রামপুরের ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ সাহেবের শিষ্য!

কথা হচ্ছিল হোটেলের গেটের সামনে দাঁড়িয়েই। আশায় বুক বেঁধে আমিই বললাম এক গোপন বাসনার কথা।

—যদি অসুবিধা না মনে করেন, আপনি হোটেলে না থেকে আমার বাড়িতে যদি থাকতেন—

রাজি হয়ে গেলেন এক কথায়।

—কত দূর বাড়ি তুমার?

হোটেল থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। হেঁটেই চললেন। রিকশায় মালপত্তর। বুকের কাছে ধরে রেখেছেন সরোদটিকে। বার কয়েক নেবার চেষ্টাও করেছি। কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে রাজি হননি।

—উহুঁ ওটি হচ্ছে না। এ আমার তৃতীয় পক্ষ!

একটু ঘাবড়ে গিয়ে হাল ছাড়লাম। কি বলতে চান উনি? এক টুকরো হালকা হাসি ছাড়া ওঁর তেমন কোন ভাবান্তর নেই। বাধ্য হয়েই কৌতূহল চেপে রাখলাম।

বাড়ি গিয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রামের পর সবাই মিলে গল্পগুজব করতে বসেছি। বেশ হাসি ঠাট্টার পরিবেশ। বয়সের বোঝা যেন এক রাশ তারুণ্যের সবুজ ছড়িয়ে দিয়েছে বৃদ্ধ সঙ্গীত সাধকের মনে। কথাবার্তার ফাঁকেই হঠাৎ সেই সকাল বেলার কৌতূহলটা মাথা চাড়া দিল!

—দাদু, তোমার সরোদটাকে তৃতীয় পক্ষ বললে কেন?

—সকালের কথাডা তুমার মনে আছে? এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে তিনি জানালেন, 'এই সরোদটা কয়েক দিন আগে আমাকে রবু (পণ্ডিত রবিশঙ্কর) এনে দিয়েছে। একদম নতুনই বলতে পার। আমার প্রথম পক্ষ প্রথম সরোদ মানে পুরানোটা, তারপর তোমার দিদু, সে হল গে দ্বিতীয় পক্ষ আর এই নতুনটা তৃতীয় পক্ষ। বয়সটা কম তাই বুড়ো বয়সে একে হাতছাড়া করি না। তোমার মত যুবার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি তো করতে পারে!

—ওই নীরস কাঠ কি আর ফষ্টিনষ্টি করবে! আমি একটু হেসে সওয়াল করতেই বৃদ্ধ সুর সাধকের ওস্তাদী জবাব আসে—'কে বলেছে ওটা নীরস! রসে টইটম্বুর। বয়স কম হলে কি হবে তাকে যেমন নাড়াবে তেমনি নড়বে। রস জমলে সেও রসীয়া হবে!'

কটকে কাটানো দিনগুলির স্মৃতি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র জীবনের শেষ দিনগুলির মাঝখানের অনেকটাই যে জুড়ে ছিল এর পরের চিঠিগুলিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে পরম স্নেহময় এক দাদুর তাঁর নাতির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার পরিচয়ের সৌরভ। যে গুরুভাইকে তিনি নিজে কোনদিন দেখেননি; শুধু গুরুর কাছে শুনেছেন তাঁর প্রথম বাঙালি শিষ্যের কথা, সেই অদেখা মানুষটির আত্মীয়কে বুকের গভীরে ঠাঁই দিয়েছেন তিনি। যে সম্পর্ক রক্তের চেয়ে গাঢ়, গভীর। এমনই একটি আন্তরিক চিঠি:

মাইহার ষ্টেট
ভীন্দ প্রদেশ
২১-১০-৫১

কল্যাণবর,

আমার অতি স্নেহের দাদু, তুমার আন্তরীক "বিজয়ার নমস্কার গ্রহণ করিলাম বুড় দাদুর ও বুড়ি দিদিমার "বিজয়ার স্নেহ আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, বড় নাতি স্নেহের দাদুকে ও তুমার বন্ধু দাদু ও নাৎ বৌ দিদি সকলকে উভয়ের বিজয়ার স্নেহ আসির্ব্বাদ জানাবে। আমি আসিবার সময় আমাকে তুমি তুমার নাম ঠিকানা কিছু লিখে দেও নাই, এখানে এসে অনেক চিন্তা করে রেডিও ষ্টেসনে কটকে তুমাকে পত্র লিখি জমিদার অফিসার ও যার বাসায় ছিলেম এ সব পরিচয় দিয়ে মনে করিছিলেম তুমি নির্চ্চয় আমার পত্র পেয়েছে, আমাকে বুধহয় ভুলে গেছ এই

সব মনে করে মনকে সান্ত করি, মা স্বরস্বতীর দিব্বি করে বলিতেছি পত্র লিখেছিলেম, তুমার উত্তর পাই নাই বলে আর লিখি নাই। তুমি যা কিছু যত্ন সেবা করেছ তাহা ইহজিবনে ভূলিব না, তুমার বন্ধুর বাটিতে নিয়ে যা খাইয়েছ তার ঋণ জিবনে শুধ করিতে পারিব না আসির্ব্বাদ ছারা আমার কাছে আর কিছু নেই তুমরা সকল দীর্ঘ জিবন লাভ করে সুখে থাক এই প্রার্থনা করি। মায়ের অসুখ করেছে জেনে চিন্তিত হলেম পত্র কুশল সংবাদ জানিয়ে চিন্তা দুর করিবে। মা ও বাবার আদেশ পালন করে বিবাহ কর বাবা মা আত্যিয় সজন সুখি হবে।

যে সময় বিবাহ করিবে আমাকে জানাবে আমি এসে ফুল সজ্জার অর্দ্ধভাগ দর্শনে লাভ করিতে ইচ্ছা করি ঐন্যথা করিবে না। সব বন্ধুদের নাম ঠিকানা লিখে জানাবে।

তুমার দিদি মায়ের ও আমার পুন: আসির্ব্বাদ গ্রহণ কর দয়াময় ভগবানের কৃপাতে যেন শিঘ্র তুমার বিবাহের নিমন্ত্রণ লাভ করি, বিবাহ করে সুখি হও এই আসির্ব্বাদ করি। বাবা ও মা কাকাবাবুকে বিজয়া দসমির নমস্কার জানাবে।

এক প্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি

দাদু

আলাউদ্দিন

এই স্নেহের সূত্র ধরেই টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি চারণা ঘুরে ফিরে এসেছে নানা ভাবে, নানা বার। রসিক দাদু তাঁর স্নেহের নাতির সঙ্গে ঠাট্টা মসকরা করেছেন বিরানব্বই বছর বয়সে পৌঁছেও। সেই তৃতীয় পক্ষের প্রসঙ্গও এসেছে বৃদ্ধা তৃতীয় পক্ষের 'মাথার মুকুটও' নাকি জোড়াতালি দিয়ে রেখেছেন। এ সবই স্মৃতির টান, ভালবাসা আর শ্রদ্ধার স্মরণ।

কটকে থাকার সময়েই 'রবুর' দেওয়া যুবতী সরোদের মাথায় বসানো রুপোর কলসের উপর কটকের বিখ্যাত তারকষির কাজ করা আবরণ তৈরি করে দিয়েছিলেন শ্রীমান রেবতীনন্দন। খুব খুশী হয়েছিলেন দাদু। মুহূর্তের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষের মাথায় উঠেছিল নাতির দেওয়া রুপোর মুকুট।

—বাঃ! দারুণ লাগছে তো! শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, 'কেমন মানিয়েছে বল! সুন্দরী তো!'

—নতুন গয়না পরে তোমার সুন্দরী তৃতীয় পক্ষ কথা বলবে তো? নাতির সহাস্য রসিকতার জবাবে দাদুর জবাব—'কেন? বলবে না কেন?' সঙ্গে সঙ্গেই কোলের উপর তুলে আঙুল বোলালেন কিন্তু এ কি কাণ্ড! সরোদের তারের আওয়াজ ছাপিয়ে ঝনঝন্ করে উঠল মুকুটের তারের শব্দ!

কিন্তু এতেও হার মানবার পাত্র নন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে সরস মন্তব্য করলেন, 'গহনা পরে গরবিনী হয়েছেন উনি! গহনা না খুললে কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে না!' এই সময়েই তোলা সেই সরোদের ফটোর উলটো দিকে রসিক দাদু লিখে দিয়েছেন গোটা গোটা অক্ষরে 'আমার তৃতিয় পক্ষ'

জীবনের শেষ দিনগুলির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই স্মৃতির কথা নতুন

করে মনে পড়েছে তাঁর। তিনি লিখেছেন—

মাইহার

মদ্ধ প্রদেশ

১৪-১১-৫৯

কল্যাণবর,

স্নেহের দাদু শ্রীমান রেবতীনন্দন দাস মহাপাত্র তুমার পত্র ও তুমার রহস্ব লিপি লিখা পাইলাম, সব পাঠ করে বেশ আনন্দ পাইলাম, শ্রীশ্রী জগন্নাথ ভগবানের কৃপায় কটকে যাওয়া ভাজ্ঞে ঘইটেছিল। ভগবানের কৃপায় তুমাকে পেয়েছিলাম, তুমাকে পেয়ে তুমার বাসায় কয়েক দিন বাস করে কত যে আনন্দ পেয়েছিলেম তাহা চির স্বরনিয়। তুমার পত্র.........রহস্ব লিপি পাঠ করে,......সব বিষয় নতুন হয়ে আবার যেগে উঠেছে। তুমার লিখা সব পাঠ করে বর আনন্দ পাইলাম, পুরান কথা আবার নতুন হয়ে ভেষে উঠেছে। তুমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে, তুমার লিখা আমার রহস্ব নির্চ্চয় ছাপাবে। আনন্দ চিত্যে তুমাকে জানাইতেছি নির্চ্চিন্তে তুমি ছাপাবে। তুমারও বিয়ে হয়েছে আমার নাৎ বৌটি কেমন তুমার মনের মতন হয়েছে কি না, তাও জানাও নাই, তুমার ঘর গৃহস্তী সুখ সান্তী জান্তে ইচ্ছা করি।

আমার বয়সের সঙ্গে আমার তৃতিয় পক্ষও বুড়া হয়েছে, তাহার মাথার মুকুট যে তৈয়ার করে দিয়েছিলে, তাহাও এক প্রকার খারাপ হয়ে গেছে

কটকের শ্রীতিটি জুরা তারা দিয়ে এখনও রেখেছি, তুমার শ্রীতি নষ্ট করি নাই। এখন আমি ৯২ বৎস্বরের বুড়ো, গত পুজার অস্টমি দিবস হতে আমার ৯২ বৎস্বর বয়স আরম্ভ হল। এখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় সব দুর্ব্বল হয়ে পরেছে........আসির্ব্বাদ করি তুমাধিগকে.....করুন। এক প্রকার তুমাদের কুশল কামনা করি ইতি দাদু পদ্মভূষণ ডঃ আলাউদ্দিন খাঁ

কটকের দিনগুলির সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে

আছে সুর তাপস মানুষটির আড়ম্বরহীন হৃদয় খোলা মানসিকতার পাশাপাশি আর একটি অনুপম ব্যক্তিত্বের দিক। স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকা এমনই একটি দিন—

সেদিন নেমন্তন্ন ছিল কটকের রেডিও-র বড়কর্তার বাড়ি। দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন। ভদ্রলোক ত্রিপুরার মানুষ, দেশের গর্ব সংগীতগুণী ওস্তাদজীকে তাই ঘরোয়া খানার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ওস্তাদজী আছেন রেবতীবাবুর বাসায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপরেই দায়িত্ব বর্তাল ওঁকে নিয়ে যাওয়ার। সকাল সকাল স্নানটানও সেরে নিলেন। ঠিক ছিল রেডিও স্টেশনে যাবার পথে রেবতীবাবুই তাঁকে নামিয়ে দেবেন স্টেশন ডিরেকটরের বাড়িতে। বাসা থেকে বের হতে গিয়েই রেবতীবাবুকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমারে কইছে ?

বিব্রত হলেন রেবতীবাবু। হাজার হোক বড়কর্তা, তিনি তো মর্যাদায় ছোট মাপের কর্মীকে নিমন্ত্রণ করেননি, করার কথা হয়ত ভাবেনওনি।

যেই শুনেছেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি অমনি বেঁকে বসলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ—আমি যামু না। আমি যামু না! আমি তুমার বাসায় আছি আর হে তুমারেই কয় নাই! আমি যামু না!

সত্যি সত্যিই তিনি গেলেন না। তাঁকে নিয়ে যাওয়া গেল না। একগুঁয়ে মানুষটির মুখে একই কথা, 'তুমারে কয় নাই! এমন অবিবেচক। আমি যামু না।' বাধ্য হয়ে একাই অফিসে চলে গেলেন রেবতীবাবু।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আর এক বিপত্তি। ডিরেকটর সাহেব শুনলেন ওস্তাদজী আসেন নি। 'আপনার বাড়িতেই উনি আছেন, ওঁকে আনতে পারলেন না! শিগগির যান। সবাই বসে আছে!'

আবার ফিরতেই হল বাসায়। অনেক বোঝানোর পর মুখ ভার করে উঠে বসলেন গাড়িতে। কিন্তু সোজা পথে কিছুতেই গেলেন না। এখানে ওখানে ঘুরে ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছালেন। ততক্ষণে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে। ফিরে গেছেন অন্য আমন্ত্রিতরাও। এমনই তীক্ষ্ণ তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ!

কিন্তু কটকে কাটানো শেষদিনটির স্মৃতির ছবি এক সুর তাপসের সাধনার জগতটির মুখোমুখি করে দেয় আমাদের। 'ওঁর বাজনায়, ওঁর মেধায় যে একটা তপস্যার ভাব' তারই সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র গড়ে ওঠে। যন্ত্র হাতে নিয়ে বসলে নিমিলিত চক্ষু ছোট্টখাটো আড়ম্বরহীন মানুষটির গোটা সত্তাটাই মিশে যেত সুরের সঙ্গে। তখন তাঁর রক্তে রাগ, শিরায় শিরায় রাগ, জীবনের সমস্ত ব্যথা বেদনা আকুতি যেন মূর্ত হয়ে উঠত ওই সুর, ওই রাগের পরতে পরতে। রাগের রঞ্জনী মহিমায় রঙিন হয়ে উঠত চারপাশের চরাচর। বাহ্যজ্ঞানহীন ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা চলত তাঁর সুর সাধনা।

সেদিন কাকভোরে অন্যদিনের মতই রেওয়াজে বসেছিলেন তিনি। কটকের প্রোগ্রাম শেষ। সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে যাবেন। ছোট্ট ঘরে সরোদ নিয়ে বসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুর আর সাধক মিলে মিশে একাকার।

চোখ বুঁজে গেছে কখন। হাতের আঙুলের নড়াচড়া আর সুরের ভুবনমোহিনী মায়া ছাড়া আর কিছুই নেই যেন বিশ্ব চরাচরে! আত্মমগ্ন যোগীর সাধনাকে ধরে রাখতে পারে না সময়ের গণ্ডী। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর ছুঁই ছুঁই! কিন্তু ধ্যানভাঙার কোন লক্ষণই নেই!

ঠিক সেই সময়েই স্থানীয় একটি স্কুলের এক দল শিক্ষিকা এলেন ওস্তাদজীকে আমন্ত্রণ জানাতে। বিকেলে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় ওঁকে সংবর্ধনা জানাতে চান তাঁরা।

এ ঘরে বাজনা চলছে। ও ঘরে ওঁরা রয়েছেন প্রতীক্ষায়। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় কিন্তু ধ্যানভাঙার কোন লক্ষণই নেই।

'বাধ্য হয়েই ঘরের ভিতরে ঢুকতে হয় আমাকে। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া যাঁরা এসেছেন তাঁরাই বা আর কতক্ষণ বসে থাকবেন!

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরলাম। চৌকির চারপাশে বার কয়েক ঘুরলাম। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপও নেই আত্মমগ্ন শিল্পীর। পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা ফতুয়া। কোলের উপর সরোদ। সামনের খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। তাঁর মন কোন সুরলোকে উধাও কে জানে!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পিছন থেকে কাঁধে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে ডাকলাম, '....দাদু।'

ধ্যান ভেঙে উঠলেন তিনি, '...কে? কে? কি চাই? যাও বেরিয়ে যাও....'

তপোমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভেঙে ক্রোধের আগুনে ভস্ম হয়েছিলেন পুরা কাহিনীর মদন। ঠিক তেমনই ক্রোধ যেন চকিতে জ্বলে উঠল তাঁর চোখে!

'ভয়ে পালিয়ে এলাম। এক্কেবারে অফিসে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরেছি; উনি একটা কথাও বললেন না। শুনলাম দুপুরে নাকি ভাল করে খাননি পর্যন্ত!

সন্ধ্যে বেলায় ট্রেন। কটক থেকেই একটা বগি জোড়া হয়। সেই বগিতেই তুলে বিছানা করে দিলাম। উনি একটা কথাও বললেন না। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে সাইডিং থেকে সেই বগি প্ল্যাটফরমে টেনে এনে জুড়ে দেওয়া হল।

হঠাৎই আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি। আমার কাঁধে মুখ ঘষছেন আর কাঁদছেন....আমি তুমার উপর খুব অত্যাচার করছি....দাদুভাই তুমারে কত কষ্ট দিছি...সে অনুভব কি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব?' ভুলতে পারেননি বৃদ্ধ সুর সাধক ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। স্নেহের নাতিকে লেখা চিঠিগুলিতে ছড়িয়ে আছে সেই না ভোলা স্মৃতির সৌরভ....

মাইহার ষ্টেট
সান্তী কুঠির
৯-১-৫২

কল্যাণবর,

স্নেহের নাতি শ্রীমান মানু তুমার পত্র পরে সুখি হলেম দয়াময় প্রভূ তুমাকে সুখে রাখুন দীর্ঘজীবন দান করুন এই প্রার্থনা করি।

দাদু তুমি আমাকে যে রূপ খাতির যত্ন করেছ তাহা বাকি জীবনে ভূলিব না, তুমি রাজা, আমি দিনহীন ভিকারী তুমার দাদু। তুমি একবার এসে যোগল রূপ দাদু দিদিকে দর্ষন দিয়ে যাবে, আমরা পাহারে জঙ্গলে বাস করি তুমার উপযুক্ত স্থান দিতে পারিব না তবোও নাতি দাদুর সম্পর্ক বড় মধুর ও স্নেহের, এই সর্ত্তে তুমাকে স্নেহের জুরে আভ্যান করিতে সাহস করি।

এখানে এলে আশাকরি তুমি আনন্দ পাবে তার কারণ চতুর ধিকে পাহার দৃশ্য খুব ভাল এখানে বড় ২ মহাত্মারা এসে বাস করেন, এখানে মাতা স্বারদা দেবীর মন্দির আছে। আমার গুরুর ফট আমার কাছে দিতীয় নেই, তুমি যখন আসিবে কেমেরা নিয়ে আসিবে যে ফট আমার কাছে আছে তাহা ফট করে নিতে হবে। তুমার দাদা ও বন্ধুবান্দ সকলকে আমার স্নেহ আসির্ব্বাদ জানাবে। তুমার দিদিমায়ের আসির্ব্বাদ গ্রহণ করিও নাতিদের নমস্কার নিবে। তুমি আসিলে নাতি দাদুর যোগলবন্দ বাদ্য শুনিবে। এক প্রকার তোমার কুশল কামনা করি।

ইতি
দাদু।

সুরভি ছড়ানো সেই মানুষটি আজ আর নেই। কিন্তু এই গুচ্ছ চিঠিতে তিনি বেঁচে আছেন আর এক সংগীতগুণী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্রের পরিবারের মানুষজনের কাছে। নিবিড় মমতায় তাঁরা বুকের গভীরে বয়ে চলেছেন সেই স্মৃতির নির্যাস। □

কাজলি ছাই

শেখর সেনগুপ্ত

যখন ফ্যাকাশে রাতটা মেঘে মোড়া, মোড়ক য়ে মাথার ওপর টুপটাপ অনুত্তাপ বৃষ্টি, চোরেরা ন্যত্র—সম্ভবত ফার্লং কয়েক দূরত্বে স্-ওয়াগনে ফাঁকা-কাটার ধান্ধায়, তখন সে ধরা ড়লো।

ধরা পড়লো এমন এক জায়গায়, যার সামনে শীর্ণ নদী আগতপ্রায় প্রসন্ন আর উজ্জ্বল বর্ষার ত্যাশা নিয়ে কোনক্রমে হেলে-দুলে চলেছে এবং বাদ, ঐ জলের দিকে চেয়ে কেউ নাকি কোনদিন থ্যে বলতে পারে না। কে আর যাচাই করতে াছে, প্রবাদটা বাংলা-বাজার-এর কিনা!

তবে কিন্তু সে—যার মুখে কুয়াশার ার—নদীর দিকে, জলের দিকে না তাকিয়ে কটা হাত মুখের সামনে কাঁপাতে কাঁপাতে াণপণে কবুল করেছে, 'বাবুরা, আমার মা-বাপ, ট্টাসনি মাথার ওপর। তাপ্পি লয়, আমি লাশ হাতাতে আসিনি, নিজের কুদিকে মাটি চাপা দিবো বলে এয়েচি।'

কে শুনছে কার কথা।...

চুস্ত পাজামা ও পাট পাট গোটানো লুঙ্গি পরে তাবড় তাবড় জোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে লাঠি বাগিয়ে; অনেক শৌখিন স্বপ্নকে পায়ের তলায় দাবিয়ে বহুৎ ঝিম্‌ঝিম্ রাত কাবার করে তবে আজ শালাকে পাকড়েছে, আর ধুর বনতে রাজি নয়,—'পিটিয়ে হারামীকে খোবরা কইরবো আজ।'

মাথার ওপর একসঙ্গে তিনজোড়া লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ, পালাবার আর পথ নেই দেখে কোলের ন্যাতাটা হাত থেকে গড়িয়ে দেয় সে। থ্যাক করে শব্দ ওঠে।

ভেজা মাটিতে শরকাঠির মতন একটা শিশু হাত-পা মুঠ করে টলটল নিরিবিলি চোখে যেন চেয়ে আছে; তার মনে হয়, পাপড়ি মেলে হাসছে বুঝি কুদি।

এ মুলুকের তুলনা নাই, সন্ধ্যার পর কাজের দায়ে যে কেউ এলে বিলকুল ভড়কে যাবে। এ গোরস্থানে দৈত্য-দানো-জিন-পরী কত কিছুই নিবিড় হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারে। কাজলি ছাই ও তার গম্ভীর ছায়া যখন ছড়িয়ে পড়ে, পাড়ার পহেলা মস্তানও গোর টপকাতে ভয় পায়।

গোরস্থানের পাশে যদিও তুলঘপীরের দরগা, যেখানে সারাদিনের তোড়জোরের সাক্ষী একগুচ্ছ মোম সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা-সাতটা অব্দি জ্বলতে জ্বলতে প্রায় একসঙ্গেই নিভে যায়, নিভে যাবার আগে জনাকয়েক বোরখা-বিবি ও কুল-বধূরা এসে সিন্নি সাজায়, টকটকে জোয়ান দরগাদার মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে দুর্গতি-নাশে জলপড়া দেয় তাবিজ-তুবিজ দেয়, কবরখানা কিন্তু তার প্রেতায়িত চরিত্র হারায় না,—দিনের বেলা

যেমন-তেমন, রাতে-উঃ! ভাবাও যায় না! হিজড়ারাও তখন নির্ঘাৎ ওখানে ঢুঁ মারতে ভয় পাবে। শেয়ালরা শোরগোল তোলে, শ্বাপদরা অস্তিত্বের যুদ্ধে জয়ী হয় এবং সরীসৃপ নিরাপদে বংশবৃদ্ধি করে।

এককালে অর্থাৎ সেই শের আফগান যখন বর্ধমান শাসন করতেন, এখানে নাকি জনাকয়েক খানদানী আমলাকে কবর দেওয়া হয়েছিল কুশ ঘাসে ছাওয়া জটিল ঝোপের ভেতর দৃষ্টি গলালে শ্বেতপাথরের টুকরো-টাকরা দেখা যায়। সেই শের আফগান—মেহেরুন্নিসার কালে আতর-সুগন্ধিতে বাতাস ছিল ম ম, গাছের ছায়ায় চোখে সুর্মা টেনে মোহময় নিরালায় রাম-সীতারাও বসে বসে বিশ্রম্ভালাপ করতো ভরদুপুরে। এখন ঐ সান বাঁধানো চত্বরগুলি, যার চারপাশে বাঁশবনের গা-ভাঙা ফটফট আওয়াজ, বেশ্যাদের খালিকুটিও হয় না। ফেটে ফুটে চৌচির, আঁতকা আঁতকা পাগলা হাওয়া বয়, সরীসৃপরা শিষ দেয়; ছ্যাতলা শেওলার ওপর বুড়ো বুড়ো শামুক রস চুষে চুষে খায়, পাতা-পচা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ, কোন ইমানদারের গোর আর এখানে হয় না; এ পাড়ায় বে-পাড়ায় যেসব শিশুরা মরে, তারাই ওখানে গোর পায় সেইসব ঘরের শিশু, যারা হা-ভাতে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ব্যাপারটার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সাবেকী গোরস্থানে লাশ থাকে না! ঐ জংলী ডিহিতে কী এক অদ্ভুত উপদ্রবের আবির্ভাব ঘটেছে! কবর ফুঁড়ে লাশ লোপাট। লাশ!

মাটি কুপিয়ে লাশ হাতানো—খোদার তালুকে এতবড় অনাচার!

পড়শীদের চোখে আগুন, রক্তে হল্‌কা।

'কোন ঘেউয়া মড়া তুলে বইঠি দৈছে! তোরা কি সব মেকুরি বনে বইসে থাকবি?'

—পাড়ার খুড়ি সলেমা খাতুন আধময়লা ওড়নার ডল বাতাসে মেলে ছেলে-বুড়ো সকলকে উত্তেজিত করে বেড়ায়। গলা খুব কর্কশ, গায়ের রোমে রোমে কাঁটা দেয়। তমাম মহল্লাময় হৈ-চৈ। এতবড় অপমান নিয়ে দরদস্তুর চলে না।

'শেয়াল-টেয়ালের কারবার লয়। ইন্ধারে-ইন্ধারে কোদাল-গাঁইতা চালাইছে শালা। পাকড়াতে পাইরলে হারামীকে চড়ুতে চড়াইবো।'

এই মরসুমে পাড়ার এক মাতব্বর মতলেব মিঞা, যার হাতে খিড়ি, পকেটে গিল্‌লি, ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দেয়। চোরাই পণ্য বিকিয়ে সে রাজনীতি করবার মতন ফয়দা তুলে নিয়েছে। আগামী পুরনির্বাচনে তার প্রতীক হলো হাসিমুখ শিশু। কাজেই মওকা বুঝে সে খুব তৎপর,—লোক্যাল পত্রিকা ও জেলা শাসকের কাছে দরবার করে এসেছে,—মড়ার প্রটেকসান চাই! কিন্তু সাধারণ লোক অতশত বোঝে না, তাদের কাছে সলেমাচাচির আক্রমণ ও যুক্তিগুলিই আদৃত।

শেষ যখন ব্যাপারটা ঘটে, তখন আর একটা নয়, একসঙ্গে তিন-তিনটে লাশ লোপাট। তাজা কবর, তাজা মড়া, এমনকি কবরের পাশে রেখে-যাওয়া একটুকরো পবিত্র চাঁদির কণিকাও আবিষ্কৃত হলো।

হাড়-মাস কিচ্ছুটির চিহ্ন নেই। শেয়াল-কুকুর বা, বিদেহী ড্রাকুলার কম্ম নয়, নিশ্চয় কোন মানুষ শয়তানের কেরামতি।...

চুস্ত পাজামা ও পাট পাট লুঙ্গি পরা তিনজোড়া মানুষ, লাঠি হাতে, মোটা ব্যাটারির টর্চ হাতে, চোখের কোণে কোণে রক্তের ছিট—কবর-চোরের জান খিচে লেবে ওরা! শপথ আর আক্রোশে সব যেন হলদে জ্বরের রুগী!

খোঁজতল্লাসে পরপর কয়েক রাত ঘাপটি মেরে থাকে, তক্কে তক্কে ঘুরছে এ কবর থেকে সে কবর। বাতাসে ভুর ভুর পচা গন্ধ, গাছ-গাছালিতে সর-সর তর-তর, আকাশ-মুখো শেয়ালের ডাক, দুর্মদ আগ্রহে টর্চের আলো ঘোরে, সেই আলোয় ঘাবড়ে গিয়ে শ্বাপদরা ঘন ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে, কিন্তু কাউকে অন্ধকার চিরে দেখা গেল না।

পাকা চোর, খুব হুঁশিয়ার, কোন ছুতোয় এসে ঠিক হালহকিকৎ জেনে গেছে।... স্বর বিলোল করে গোরস্থানে কে যেন ডাকে। রাত যত বাড়ে, জায়গাটা যেন সীমাবদ্ধ হতে হতে একটা কুণ্ডলীপাকানো অজগর হয়। অসংখ্য পরবশ আত্মা ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিচুটিপাতার ঘষা লেগে ঘাড়-বুক চুলকায়। লাঠিহাতের জোয়ানরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, রাগের চোটে নিজের কপালেই গুঁতো মারে। তাদের নিজের নিজের ডেরাতে এখন অন্ধকারের রূপকথা। ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে যার যার গিরিগুহাবাসিনী ভারি আঁখ মিছরি; শুয়ে-শুয়ে ছটফট করছে গো, ছটফটানিতে রঙছুট হয়ে যাচ্ছে তারা—হায়, বুক খুলবার ও কাপড় তুলবার মদ্দরারা নেই আজ ক'দিন!

মরদ মদ্দরারা তখন শান-বাঁধানো ফাটা কবরে মাদুর বিছিয়ে ঝিমুচ্ছে; মশার কামড়ে অতিষ্ঠ, বিস্বাদে মুখের ভেতরটা কৈ কৈ, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে, নিজেদের করুণ ব্যর্থতার নির্গলিতার্থ টের পেয়ে রক্তে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

সকলের খরসান জিভের অভিশাপ মাথায় নিয়ে নিঃশব্দ মড়া-চোর ঠিক গন্ধ পেয়েছিল। কেউ এত্তেলা পাঠায়নি। নিজেই হাঁটি হাঁটি পরখ করে এসেছে। তার তো কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও বেড়ালের গতি। ভর সন্ধ্যায় একটুখানি তল্লানি গলায় ঢেলে ঘুর ঘুর দেখে গেছে, পাড়ার বাছাই মরদরা লাঠি হাতে কবরখানায় ঢুকছে, দরগাদার তার বুজরুকিময় হাত তুলে খোদার দোয়া মাঙছে,—এ শালাদের ফাঁকি দিয়ে নলচে আড়াল করে নেশা করবার মতন লাশ নিয়ে জান্‌টান্‌-আন্‌টান্‌ করবে, এমন সাধ্যি বাপের নাই। আচ্ছা ফেরফার হলো বটে। বানচো—দের কেঁচেগণ্ডুষী কারবার কবে যে শেষ হবে, খোদায় মালুম।

তার অস্বস্তির চেয়ে অনিশ্চয়তাবোধ অনেক বেশি। জিল জিল বুক, খাঁজকাটা কপাল, শুকনো চুল, ঘুম-নাই চোখ, হাত-পার হাড়ে হাড়ে কট কট আওয়াজ—সবটা মিলিয়ে যেন হটযোগীর সিদ্ধাই নিয়ে অব্যক্ত ভাষায় সে কয় আমার মড়া চাই। মড়া চাই না, আস্ত কংকাল চাই।

যে বাবুরা ডাক্তারি পড়েন [বর্ধমানে একটা ডাক্তারি কলেজ খুলবার পর কপালে আমার ফুল-চন্দন], তেনাদের চোখের সামনে একটা আস্ত কংকাল থাকলে কত সুবিধা। স্কেল মেপে সেই কংকালটার চুল-চেরা বিচার করেন তেনারা।

কার কাঠামো বটে তুমি? হিন্দু না, মুসলমান? পুরুষ না, নারী? রোগে মরলে না, না খেয়ে মরলে, নাকি বিষ খেয়েছিলে? অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোন পদ্ধতিতে হয়েছিল? বাবুরা এসব কিছু জানেন না। কিছু কিছু জানে কেবল কবর-চোর।

মর্গ থেকেও কংকাল আসে, কিন্তু তার দাম অনেক। হবু ডাক্তাররা তাই হা পিত্যেশ করে চেয়ে থাকেন আমা পানে। কানাঘুষাতেও ছড়ান না, কংকাল কে দেয় এবং কতডে দেয়! কংকাল তো মাগ্‌গি নয়; হিন্দুরা পুড়িয়ে ছাই করে, মুসলমানরা তবু গোর দেয়। হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ ছাড়া কংকাল মিলবে কোত্থেকে?

'এখুন বলুন, একী জ্বালা-গঞ্জনা।

আমার হাতে কাঁকন পরাইতে চায় ক্যানে উয়ারা?...'

'আবার মুদ্দা কথা হলো, কংকাল না জুটলে আমার ঘরকে হাড়ি চাইপো না। সানকিতে গন্ধ ভাত-আমানি শুকিয়ে চটপট কইর্‌বো। আমার ট্যাঁকে একটা ক্যালকাটা পুলিসও জুটবেক নাই। আমি তো আর বর্ধমান-মহারাজার ছ্যাকড়াগাড়ি চালাইনা যে বুসে বুসে মাস-মাইনে গুইনবো। আমার তাই শালা চুকলি দিয়ে হোক, যা করে হোক গোর-কুড়ানো লাশ চাই-ই।....'

ঘরে ওর দেড় বছরের মেয়ে কুদি, যার খাবলা খাবলা জটা-চুলে মাঞ্জা-করা সোনালী লেস স্বপ্নে আসা-যাওয়া করে, নোংরা দু'খানা হাত দিয়ে টুসকীর চিমসে মাই খামচে ধরে আছে, বিবর্ণ ঠোঁটে বুভুক্ষায় চুষে চুষে মায়ের শরীরের রক্ত টেনে আনতে চায়। কিন্তু দুধ নাই।

মাইয়ে দুধ নাই।

পান্তরে আমানি নাই।

কংকাল চাই।

এক-একটা কংকালের দাম, রোগা-পটকা বা গালপাট্টাবাবুরা যেমন দেন, ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ। খচ্‌ খচ্‌ নোটের ঝাঁজালো তার পৌরুষ তৃপ্ত হয়, টুসকীর দিকে চেয়ে খাড়া খাড়া গোঁফে আঙুল বোলায়।

পর পর তিনটা লাশ হাতিয়ে মাস-নাড়ি-চর্বি-শিরা খসিয়ে ছোট ছোট তিনখানা ফুটফুটে কংকাল পাওয়া গেছে। আহ্‌, মানুষের শরীর একটা ভাঁড়ার হে! সেই ভাঁড়ার সাফ করো,

ম দামী শাদা বস্ত্র মিলবে। তোমার যদি রসবোধ ক, হাতে হাতে তালি বাজিয়ে আদিম নাচ চা। আর তুমি যদি ভয় পাও, ছাইপাশ বিবেক কামড়ায়, জগদ্দল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো। নরম নরম পেছল পেছল হাড়, সে নিজেই ন মট করে ভেঙ্গে দিতে পারে। জীবদ্দশায় দের দাম কানাকড়িও ছিল কিনা সন্দেহ, কবর কে তুলে আনবার পর তাদেরই দাম বাড়ছে, শই বাড়ছে।

একশ' একুশ টাকা!

একশ' একুশ টাকা!

টুসকীর পরনে উঠলো লাল ডুরে শাড়ি। কুদির আহ্লাদ! অ-অ-অ চুক্-চুক্···।

'মিয়াটা এখুনো হাঁটতে লারে। পেটে বাটি বাটি না-ভাত পড়ুক, ঠিক হাঁইটবো গুটি গুটি। এখন ায় আওয়াজ লাই; তখুন একধামা মুখ লেড়ে লবে—মা-আ-আ, মা-ই-ই, বা-বা-বা···'

কুদি যখন টুসকীর পেটে, কোত্থেকে একদল ড়া ঘুরে গেছে তার বাড়ির উঠোনে, কাপড় ন ঢোল বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে য়েছে

রঙগিলি পাতিলিখা, ই মরদের দুলা রী হল,

হাম সিলেগাদের টোন্ছা ছমকাতে।

তারপর কুদি হয়েছে। হিজড়ারাও আর একবার চ গেছে। পোয়া মেপে চাল দিয়েছিল টুসকী।

এখন কাম নাই।

টুসকীর মাইয়ে দুধ নাই।

কুদির চলার ক্ষমতা নাই, গলায় আওয়াজ ই।

সে এখন মড়া হাতাবে না তো কি হাতাবে?

মিউনিসিপ্যালটির বাবুদের অ্যাটুলিগিরি অনেক করেছে, ভাত জোটে নি। গোরস্থানে লাশ হাতিয়ে দেখেছে, এর চেয়ে বাঁচার সহজ পথ আর হয় না।

···সেদিন মাঝ রাতে মাজা-ঘষা তিনটে কংকাল পর পর সাজিয়ে ক্লিষ্টমুখ টুসকীর হাত ধরে টেনে এনেছে সে, 'উ দ্যাখ, টুসকী, উ দ্যাখ; উগুলো আমাদের জান, আমাদের লক্ষ্মী। উনানের উপর শুকুবি দেখবি, যেন শালা মাছিতেও টেইর না পায়।'

টুসকী আঁতকেছে, 'ই বাপ! উ কী গো! আমার যে ডইর লাগে!'

টুসকীর চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখে সে গুলতি-ছোঁড়া ঢিলের মতন একরোখা লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু স্বর খুব চাপা, 'তুর নাপিতে মাইরবো এক নাথ। শুনে মইরে যাই,—মাগীর আমার ডইর লাগে! সাতকাহন পথ মাইড়ে কবরে আরচা ঠেইলে মড়া আইনলেম; আর উনার ডইর লাইগলো। উঃ! কী বড়লোকের সুহাগী বিটারে!'

'ডর লাইগলে বইলবো না?'

'না। খুমে আঁঠা দে। ইধার-উধার চিল্লাবি তো তুকেই কংকাল কইরে দেবো।'

টুসকীর শরীরে কাঁটা দেয়। এ মরদ সব পারে। রাগের মাথায় কখন লক্কর চালিয়ে দেবে। অভুক্ত পেটের ব্যথা, কাতরানি, ফোঁপানি—সব প্রাণপণে চাপতে চাপতে টুসকী তার লাল ভেজা চোখে কংকালগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। চামড়া নাই, অথচ শাদা শাদা হাত-পা; চক্ষু নাই, কিন্তু গর্ত চিরে দৃষ্টি গিলতে চাইছে; ঠোঁট নাই, তবু মুখময় ভয়ংকর হাসি।

টুসকী দু'হাতে মুখ ঢেকে বিড় বিড় করে, 'ও টুসকী, অভাগীর বেটি, খোমা দ্যাখাসনি, চেহারা কোরে লেবে। তুর লিজের ভিতর একটা কংকাল রইছে হে!···'

আর দেরি না করে কাপড় বদলে গামছা পরে টুসকী। আশ্চর্য, এখনো ওর মাজা মাজা রঙের তনু ও তলপেট চক্মাদারি; যা দেখে অমন যে কঠিন মরদ, সেও বিড়ি ঠোঁটে গুঁজে সোহাগ জানাবে। ঐ একটা সময়, মরদটাকে যখন হাতের তালুতে এনে বসায় টুসকী; মরদ তখন যেন গরম শরীর নিয়ে এক ডেলা কাদা।

কংকালগুলিকে রশিতে বেঁধে উনানের ওপর ঝুলিয়ে দেয় টুসকী। অল্প বাতাসেই ওরা নাচে, ঘুরে ঘুরে নাচে, কেমন একটা তিসিক্ তিসিক্ আওয়াজ। হাতের চেটোয় চোখ ঢেকে কিছুক্ষণ গোঙাতে থাকে টুসকী। ঠিক সেই সময় কুদি, তার দেড় বছরের পেট-পচা মেয়ে এক কাঁথা জলের মতন মলে হাপুস-খাপুস, চিঁ চিঁ রব টানতেই কাহিল। টুসকীর মায়ের কান,—শুনতে পেয়েছে ঠিক, কিন্তু উঠতে পারছে না,—চৌকাঠে হুঁশিয়ার মরদ, আর মাথার ওপর তিন কংকালের নাচ।···

তার পেটে আমানি নাই, তার পরনের ন্যাতাটা ছিঁড়ে ফালা ফালা, একটা ফালতু কুকুরের মতন সে হাঁ করে বাতাস টানে। ক্ষিধের প্রভাবে মাতালের মতন টলতে থাকে তার পা।

চোর হিসাবে তার কোন দুর্নাম ছিল না। সে যে কবরখানায় ঢুকে লাশ হাতায়, এমত সবুদ আজ অব্দি এ তল্লাটে কেউ পায় নাই। আর ওকে চেনেই বা কে! সৌজন্যশীল ভদ্রলোকদের বাড়ির বারান্দায় রাতে যারা কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে, সে বুঝি সেই সব বেওয়ারিশদেরই একজন।

বার বার আগু-পিছু করেও কবরখানায় ঢুকতে

সে সাহস পায় না। টিকুয়া নিয়ে মস্তানরা চক্কর দিচ্ছে। প্রতিটি কাঁচা কবর ওদের আয়ত্তে। ওদের ফাঁকি দিয়ে লাশ নিয়ে চম্পুল দেবে, এমন ক্ষমতা তার নাই। পাড়ার মোড়ে মোড়ে বুড়ো-বুড়ির আরেলা। কবর-চোরের খুন চাইছে ওরা।...

'কি কইরবো বাপ, পরশু রেতে টুসকীর ঝুলকিটা এক চাঁই সুদীকে বেইচে দিয়ে পোয়া দেড়েক চাল...তার পরদিন আমানি ; তারপর ? আর গয়না কুথা ? সব ছেইরে ছুড়ে ফাটারু হইয়ে যাইবো, মাইরি। টুসকীটা আবার ওয়াক্ কইরছে। আবার ওয়াক ! তিনটা কংকাল, সেই তিনটা কংকাল বেইচে এক কাড়ি টাকা যখন ট্যাঁকে এইলো,—আমি মাইরি অত টাকা একসাথে দেখি লাই, আহ্লাদে আমার শরীল গরম হইয়ে উঠলো ; আমি তখন টুসকীর তলপেট দেইখলুম, উর বুকের কাপড় সরাইলুম, উর নাপির তলায় চেইপে ধরে থাবড়া থাবড়া আলোতেই হিস্ হিস্ ফুর্তি...। তাইতে আল্লার আবার গুঁসা হইলো। তাই টুসকী 'ওয়াক্' কইরছে। এক ছানা কুদি খেইতে পায় না, আবার 'ওয়াক্-ওয়াক্...' টুসকী, তুর পেট আমি চিরে ফালা কইরবো !

কুদিটার গলায় আওয়াজ লাই।

মিয়াটা কি গুণ্ডা হইবে নাকি ?

হে বাপ, বাপজান কসম খাই, সইরে যা।

আমায় একটা কংকাল দে।

চালার তলায় ঢুকতেই পোয়াতি টুসকীর ফোঁস ফোঁসানি, 'মরদ, তু' কাম কইরতে লারিস ?'

'কাম কুথা ?'

'কুথা আমি কী খুলে দিখাবো ? না পারিস তো আমায় বিলাখানায় পৌঁছে দে। আমি পয়সা আইনবো।...মিয়াটার গলায় স্বর লাই। ডাক্তারকে পয়সা দিবে কে ?'

আর মেজাজ রাখা যায় না, 'তুর বাপ দিবে। তুর জন্ম বিলাখানায়। তু নিজেই গিয়ে দাঁড়া না ক্যানে বিলাখানায়। কাপড় তুলে দাঁড়া। মাইরবো পেটে এক লাথ।' মেঝেতে মাথা কুটতে কুটতে টুসকী বলে, 'মার না ক্যানে, মার। তুর হাত থেকে রুক্ষা পাই।'

কিন্তু টুসকীর মরণ নাই। পুরনো ভিখিরিনীর মতন সে এই পরিতৃপ্ত নিরুদ্বেগ পৃথিবীর পথে পথে রোদে-জলে টো টো করে, কলের জল খেয়ে হেঁচকি টানে। সামনে হিন্দুদের বড় পুজো আসছে বলে তুলকালাম কাণ্ড। আসছে প্রখর মহরমও,—পুরনোচক এলাকায় একটা বিরাট সোনা রং তাজকে ঘষে মেজে চক চকে করে তোলা হচ্ছে। ডুম্ ডুম্ ঢোল বাজে। এই পুলকঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে চলতে টুসকী আবার তার মরদের ডেরাতেই ফিরে এলো ; বিলাখানায় দাঁড়িয়ে শরীর বেচার সাহস তার নাই।

এবং টুসকী যখন টলতে টলতে চৌকাঠ পার হচ্ছে, তাদের পুরনো ঘরকন্নার চৌখুপিতে তখন কুদি রক্ত-পায়খানা সেরে আচমকা হিম হয়ে যায়। মেয়েটাকে ছোঁব ছোঁব করেও অনেকক্ষণ ছুঁতে ভয় পেয়েছে টুসকী। তারপর হাত ঠেকাতেই বিদ্যুৎ-চুল্লীতে বুঝি দেহ-মন পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। নিশি-পাওয়া গলায় টুসকী ডাকে, 'ওগো, তুমি কুথা ? দেইখে যাও।' মরদ তখন হঠাৎই আত্মস্থ হয়ে আকাশের মুখ দেখছিল। টুসকীর অনিবার্য ডাক শুনে নিজের প্রাণের শব্দ নিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালো। দেখলো, টুসকী কুদিকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে ভয় পাচ্ছে। ভেজা কাঁথা, রক্ত-মূত্র-মলে মাখামাখি কুদির সর্বাঙ্গে ঈশ্বরের হিম আঙুল ঘুরছে।

দেখার কিছুই নাই, করার কিছুই নাই ; কুদি মড়া হয়ে গেছে। ঈশ্বরের হিম নীল আঙুল ওর গোমড়া মুখখানাকে কেমন সুন্দর করে তুলেছে। দেড় বছরের লিকলিকে শরীর-বৃন্তে হঠাৎ বিপ্লব—কুদি এখন কাঠপুতুল। সম্পূর্ণ অচেনা দুটো চোখ মেলে দেখছে পারিপার্শ্বিকতা।

সেই নিথর কুদির দিকে তাকিয়ে কবর-চোর শিহরিত। তার বুকের ভেতর ঘুর ঘুরে পোকার মতন একটা বিশেষ তৎপরতা ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠতে থাকে।

এই—এই তো সেই তিন কংকালের একটি। মাংস-মজ্জা-শিরা-উপশিরা পেঁয়াজের খোসার মতন একে একে সরাতে পারলে একটা আস্ত কংকাল। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ,—বাবুদের যেমন মর্জি।

'উ মইরে গেছে। দে, আমি মাটিতে পুইতে দি আসি।'

'না, না, মইরে নাই। অমুন কথা বলিস নাই। শংকর ডাক্তারকে ডাইকে আন।'

'থাম শালী। মইরে কখুন বরফ হইয়ে গেছে।'

'ওরে কুদি ! তু কুথা গেলিরে !'

টুসকীর কান্না শুরু হলো। ঠিক কান্না নয়, অস্পষ্ট গোঙানি। আর্তস্বর তোলার মতন শক্তি তার ফাঁপা শরীরে নাই।

এই সংকটময় মুহূর্তে, এই নতুন আশার ঝলকানিতে আসল মানুষটা কিন্তু নিজের দায়িত্ব ভোলে না।

পড়শিরা ছুটে আসবার আগেই রক্ত-পায়খানায় ভেজা কাঁথাতে মুড়ে কুদিকে নিয়ে সে একরকম দৌড়ে বেরিয়ে আসে।

তারপর এ পথ সে পথ ঘুরে কবরখানার দিকে। কুদির শেষ আবর্জনার বড় দুর্গন্ধ, তার অভুক্ত শরীর ঘোলায়। কুদির চোখ দুটো মেলা, কেমন টলটল করে চেয়ে আছে ! সে একবার বিষম খেলো ; নাকের সামনে ঈষৎ উষ্ণতা,—দু'ফোঁটা রক্ত গড়ায়। কুদিটা পলকহীন চোখে চেয়ে আছে ! মরেছে তো ? না মরলে, সে অথবা টুসকী—দু'জনের একজনকে মরতে হবে। তারপর বাবুদের যেমন মর্জি,—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ,—হাতছাড়া করবে না সে। কিছুতেই নয়।

উত্তেজনায় কুদির বরফ শরীরটার বিশেষ বিশেষ জায়গায় চাপ দিতে থাকে সে। সে কোন সন্দেহের মধ্যে থাকতে চায় না। যেন যাবতীয় অনিশ্চয়তাকেই খুন করতে সে মৃত কুদির টুঁটি চেপে ধরে।

...এবং তখন কী আশ্চর্য। আজো দৈব কত অনিবার্য ও অমোঘ হয়ে ওঠে। মড়া কোলে নিয়ে নিজের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কখন যেন সে এসে দাঁড়িয়েছে গোরস্থানে। এখানে ঢুকবার কোন দরকার বা, পরিকল্পনা তার ছিল না। তবু এসেছে। কেন এসেছে, তা সে সঠিক জানে না।

তখন মাথার ওপর আচমকা রাত-জাগা পাখি ডেকে ওঠে। তখন বেমক্কা হাঁক-ডাক ছাড়ে শেয়ালের পাল। তখন ফ্যাকাশে রাতটা মেঘে মোড়া। তখন মেঘের মোড়ক চুঁইয়ে মাথার ওপর টুপটাপ অনুতাপ বৃষ্টি। তখন সে ধরা পড়লো।

ধরা পড়লো এমন একটা জায়গায়, যার সামনে বিশীর্ণ নদী আগতপ্রায় প্রসন্ন আর উজ্জ্বল বর্ষার প্রত্যাশা নিয়ে কোনক্রমে হেলেদুলে চলেছে এবং প্রবাদ, ঐ জলের দিকে চেয়ে কেউ নাকি কোনদিন মিথ্যে বলতে পারে না।

কে আর যাচাই করতে গেছে, প্রবাদটা বাংলা-বাজার কি না !

তবু কিন্তু সে—যার মুখে কুয়াশার ঘোর—নদীর দিকে, জলের দিকে না তাকিয়ে একটা হাত মুখের সামনে কাঁপাতে কাঁপাতে প্রাণপণে কবুল করেছে, 'বাবুরা, আমার মা-বাপ, ভট্টাসনি মাথার ওপর। তাল্পি লয়, আমি লাশ হাতাতে আসিনি, নিজের কুদিকে মাটি-চাপা দিবো বলে এয়েচি।'

কে শুনছে কার কথা !

শহর-বর্ধমানের পশ্চিমে কবরাঞ্চলে প্রচলিত কিছু কিছু শব্দ এই গল্পে অনিবার্যভাবেই চলে এসেছে, যা, যদিও গল্পে 'ফুটনোট' সৌন্দর্যের পরিপন্থী, আমি অর্থসহ এখানে তুলে ধরছি পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার্থে :—

কাজলিছাই = অন্ধকার রাত ২· ফাঁকা কাটা = গরাদ ভেঙে চুরি-ডাকাতি। ৩· মেকুরি = বিড়াল ৪· রাম-সিতা = প্রেমিকযুগল। ৫· বাংলা-বাজার = ধাপ্পা ৬· খালিকুটি = বেশ্যাদের ঘর। ৭· ভট্টা = মার দেওয়া ৮· ধুর = প্রতারিত। পাপড়ি = ঠোঁট ১০· ঘেউয়া = কুকুর। তাল্পি = মিথ্যা ১২· খোবরা = গো-মাংসের কিমা ১৩· ফেরফার = শাস্তি ১৪· চুককি = ফাঁকি। ১৫· জানটান-আনটান = যাওয়া-আসা ১৬· চড়ু = ফাঁসি কাঠ ১৭· বিলাখানা = বেশ্যাদের পাড়া ১৮· ভারি-আখ = নিটোল স্তন। ১৯· ক্যালকাটা পুলিশ = বিড়ি ২০· মিছরি = প্রিয়দর্শিনী। মহুয়া = প্রেমিক ২২· কাঁকন = হাতকড়া। খোমা দেখাস না চেহারা কোরে লেবে = মুখ দেখাস না, তোকে গিলে খাবে। ২৪· খুম = মুখ ২৫· অ্যাটুলি = তোষামদ ২৬· হিজড়াদের গানটির অর্থ—

আয়লো সখী, খালো পান
এই সোগিনীর পেটে সন্তান।
সেই ছেলে হাসবে যখন
আমরাও আসবো তখন।
চাল-কাপড় রেখে, বাজিয়ে ঢোল
গাইব মোরা গান।

২৭· টিকুয়া = ডাণ্ডা ২৮· আরেলা = আড্ডা ২৯· চম্পুল = চম্পট দেওয়া ৩০· ঝুলকি = নাকছাবি ৩১· ফাটারু = বিবাগী।
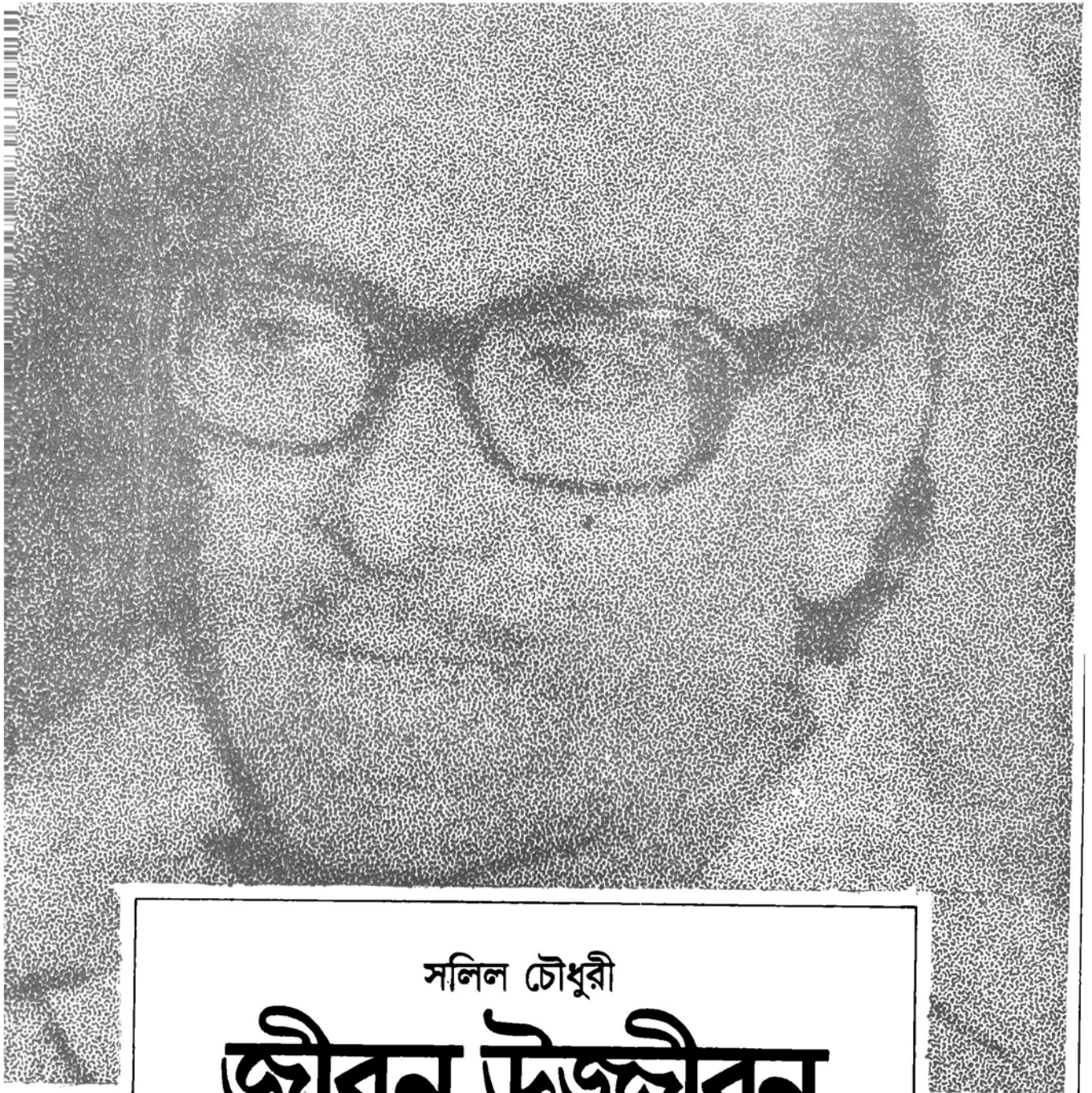
সলিল চৌধুরী

জীবন উজ্জীবন

একুশ

হাটে পৌঁছেই আমি মিকিরদের অঞ্চলটায় গিয়ে খুঁজতে লাগলাম কোথায় আছে সুখিয়া। তাকে কোথাও দেখলাম না। দু'দুবার চক্কর মেরে ঘোরার পর দেখলাম একটি মিকির মেয়ে, মাথায় নীল কাপড় বাঁধা। আমাকে দেখে উঠেই হাঁটতে শুরু করল। মিকির মেয়েদের মতো বুকে কাপড় বাঁধা; পরনে নীল স্কার্ট। কিন্তু হাঁটা দেখে চিনলাম, সুখিয়া। অল্পদূরেই সেই ঠক্‌ঠকি। ঠক্‌ঠকি পেরিয়ে আগে গেলেই জঙ্গল। ও সেই দিকে চলল। আমি চারদিক একবার দেখে নিয়ে ওর পিছু নিলাম। জঙ্গলে ঢুকে ওকে আর খুঁজে পাই না। চারদিক তাকাচ্ছি। তারপর ওর আওয়াজ পেলাম, 'নখিন্দর'। দেখি একটা গাছের আড়ালে ও দাঁড়িয়ে। আমি কাছে যেতেই ও আমাকে পাগলের মত দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'তু কেনে হামাকে এতো দুখ্ দিলি। হামি রোজ গিয়েছি তুর জন্যে। তু একবারও কেনে এলি না? তুকে ভগ্‌মান ভেবেছি তাই কি তু গুস্‌সা করলি?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় তুই গিয়েছিস? আমি তো ঐ তালাবের ধারে রোজ তোর জন্যে সকাল বিকেল গিয়েছি। তুই তো আসিসনি?' সুখিয়া অবাক হয়ে বলল, 'তালাবের ধারে? কেনে? হামি তো রোজ ঐ গুফার মধ্যে তুর জন্যে বসে থেকেছি।

তু আসবি—বানশুরি বাজাবি! হা ভগবান ! আমার নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে করল। প্রায় তিন মাইল পথ পাহাড় ভেঙে প্রচণ্ড গরমে এ মেয়েটা এসে প্রতিদিন ঐ গুহায় আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে, আর আমি আর বাঁশি বাজাবো না বলে ঐ গুহার ধারেই যাই নি। ওকে খুঁজেছি হ্রদের ধারে। আর মিছিমিছি ওর ওপর রাগ করেছি। ও বলল,—"সুন, হামি ইতিয়া (মানে এখন) যাছি—উরা সক্ (সন্দেহ) করবেক। তু আজ চারবাজে গুফায় আসবি। হামি থাকব। আসবি তো ? না ভুলে যাবি ?" বললাম, "নারে ভুলব কি করে ? ও আমাকে একটা ছোট্ট চুমো খেয়ে ছুটে চলে গেল, "আসবি ঠিক্ নখিন্দর"—এই কথা বলে।

চারটে বাজার কিছু আগেই গুহার মধ্যে গিয়ে আমি সেই পাথরটায় বসলাম। এটাই ছিল আমার বাঁশি বাজাবার আসন। বিশাল বড় গুহা। সামনের কিছুটা জায়গায় আলো, ভিতরটা থমথমে অন্ধকার। একটা ফাটল থেকে অনবরত ছড়ছড় শব্দ করে জল পড়ে পড়ে ছোট ঝরনার মতো হয়ে সেই জল পাহাড় গড়িয়ে নীচে পড়ে। স্যাঁতলা প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ। কতদিন ভেবেছি একটা টর্চ নিয়ে আসব ভিতরটায় কী আছে দেখব। কিন্তু শেষ অবধি সাহস হয়নি। গুহাটা যে গভীর তা শব্দের দূর থেকে আসা প্রতিধ্বনি থেকে বোঝা যায়। হয়তো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বেরোবার পথও আছে, নয়তো শব্দটা গুহা ভেদ করে বেরিয়ে দূরে চলে যায় কি করে ? এ প্রশ্নের উত্তর এ জীবনে আর কোনোদিন জানা হবে না। খসখস শব্দে মুখ তুলে দেখি গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সুখিয়া। পরনে মিকির পোশাক। "সুখিয়া !" বলে উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধরে বুকে টানতে যেতেই ও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিক থেকে এল সেই কুলকুল হাসি। সুখিয়া হেসে সামনে এসে দাঁড়াল—"উটা তুমার সুখিয়া নয় গো।—ও হামার সই বটে—উর নাম লমফো—" বলে 'লমফো' 'লমফো' বলে ডাকল সুখিয়া। লমফো কাছে এল। এবার লমফোর মুখটা দেখলাম। জাপানি মেয়ের মতো দেখতে। এসে হেসে সুখিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়ল লমফো। সুখিয়া বলল—"ও ভগমান দেখতে এসেছে আর বানশুরি শুনতে। তু আজ বাজাবি না বানশুরি ?" সুখিয়া একা না এসে আর একজনকে সঙ্গে এনেছে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেন আনল সঙ্গে ? ওকে ভগমান দেখিয়ে আর বানশুরি শুনিয়ে ওর নিশ্চয় কিছুটা গর্ব হবে। কিন্তু সেইটাই বড়ো হল ? মেয়েদের মন বোঝে কার বাপের সাধ্যি। বললুম, "চল্ শোনাবো বানশুরি।" ওরা দুজনে পাশাপাশি বসল আর সেই পাথরটার ওপর বসে চলল আমার বাঁশির আলাপ। চোখ বড়ো বড়ো করে শুনতে শুনতে ওরা মাঝে মধ্যে কানে কানে কি সব ফিসফিস করতে লাগল। তারপর আবার শুনতে লাগল। এক সময় আমি থামলুম। কিন্তু প্রতিধ্বনিটা চলতে লাগল প্রায় মিনিট খানেক ধরে। হঠাৎ লমফো হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে

মাথা ঠেকিয়ে আমাকে গড় করল। তারপর সুখিয়া কানে কানে ওকে কিছু বলতে ও উঠে বাইরে চলে গেল। এবার সুখিয়া উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসল আমার পাশে—"হামার উপর গুস্সা করছিস নারে নখিন্দর ?"—বলে মুখে কপালে গালে চুমো খেতে লাগল—'সুন কেনে—হামি সব বলছি তুকে।' সুখিয়া যা বলল তা হচ্ছে এই যে পাহাড়ের ওপারেও মিকির গাঁয়ে নিশুতি দুপুরে আমার বাঁশি শোনা যায়। ওরাও ভাবে কোনো দেওতা বাঁশি বাজায়—আমার সঙ্গে দেখা হবার পর সুখিয়া গিয়ে ওদের বলে যে ও ভগমানকে দেখেছে এবং সামনে বসে বাঁশি শুনেছে। স্বভাবতই কেউ বিশ্বাস করে নি। তখন ও বলেছে—"চল তোদের দেখাব।" তাই যে কদিনই ও এসেছে ওর সঙ্গে এসেছে একটি দুটি মেয়ে এবং কোনোদিনই আমার দেখা না পেয়ে সবাই ধরে নিয়েছে ও মিথ্যেবাদী। মিথ্যে কথা বলা মিকিরদের মধ্যে পাপ। ওর হয়ে গেছে ভীষণ বদনাম। তাই আজ ও লমফোকে সঙ্গে এনেছে ভগমান দেখাবে আর বাঁশি শোনাবে বলে। আমি যেন ওকে ক্ষমা করি। "তু হামার মান বাঁচালি—বল তু হামাকে মাপ করলি। কালসে কোই আসবেক নাই। হামি একা আসব। বল, তু আসবি ?" বললাম, "আসব রে নিশ্চয় আসব।" ও আমাকে আর একবার জড়িয়ে ধরে "আজ হামি যাচ্ছি। কাল তিন বাজে—হাঁ ?"—বলে চলে গেল।

এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে তখন আসামে এসে আমার থাকার প্রায় তিনমাস পেরিয়ে গেছে। ওদিকে যুদ্ধের মোড় ফিরেছে, মিত্রপক্ষ প্রচণ্ড আঘাতে ফ্যাসিস্টদের কোনঠাসা করছে। কলকাতায় লোকজন ফিরে আসছে। বোমা পড়ার ভয় আর নেই। কিছুদিন আগেই আমি মাকে বলতাম, 'মা তুমি বাবাকে বল—আমি এবার কলকাতায় ফিরে যাই। নতুন ফোর্থ ইয়ার ক্লাস শুরু হবে।' মা বলতেন, 'এসেছিস যখন কিছুদিন থাক না বাবা। তোর ভাইবোনেরা সবাই কত খুশি তোরা এসেছিস বলে। গেলে তো আবার কতদিন তোদের দেখব না।' কথাটা সত্যি। তাই চুপ করে যেতাম। সেদিন বাড়ি ফেরার পর রাত্রে বাবা হঠাৎ বললেন, 'বাচ্চু, তোমাদের কলকাতা যাবার টিকেট কনফার্মড। ২৪ শে মে সকাল নটায় ট্রেন ছাড়বে।'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। ২৪ শে মানে আর তো মাত্র দশ দিন বাকি। আজ পনের তারিখ, সুখিয়াকে ফেলে আমায় চলে যেতে হবে ? কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, 'কি খুশি তো এবার ?' ফিকে একটু হাসার চেষ্টা করে ঘাড় নাড়লাম। টিকেট করা ব্যাপারটা হাতীখুলী থেকে সোজা ছিল না। ৫০ কিলোমিটার দূরে নওগাঁ স্টেশনে লোক পাঠিয়ে টিকেট করতে হোত। ক্যানসেল করতে গেলেও আবার সেই লোক পাঠানো। তখন ওদিকে বাস ছিল না—ম্যানেজার সাহেবকে অনুরোধ করে কোম্পানির চাপাতা বইবার লরি ধার করতে হোত, কিংবা সাইকেলে যেতে হোত। আমার অত সাহস ছিল না যে বাবাকে বলব, 'ক্যানসেল করুন। আমি এখন যাব না।' ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। প্রথম প্রেম যাঁরা করেছেন তাঁরা আমার বেদনাটা বুঝবেন। পরদিন তিনটে বাজার একটু আগেই পৌঁছে দেখি দিব্বি স্নানটান করে গোছা করে লাল চুলে খোঁপা বেঁধে গুছিয়ে শাড়ি পরে সুখিয়া বসে আছে। খোঁপায় জড়িয়েছে কি এক বেগনি ফুল। সামনে একরাশ পাহাড়ি সুগন্ধী শাদা ফুল, আর ও মালা গাঁথছে। আমাকে আসতে দেখে একটু সলজ্জ হেসে মালা গাঁথতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, এ সব কি হচ্ছে রে সুখিয়া ? সুখিয়া বলল, "হার বানাছি।" বলে মাথা নিচু করে মালা গাঁথতে লাগল। 'কেন ? আজ কি তোদের পরব-টরব কিছু আছে ?' 'হাঁ তো বটে ! পূজা আছে।'—বলে সুখিয়া বলল, 'কেনে তু জানিস না ?'—ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমি কি করে জানব ?' বললাম। সুখিয়া মালা গাঁথা বন্ধ করে ফুলটা মাটিতে রেখে কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'তু হামার দেওতা বটে। আগে তুকে গলায় হার দিব, পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করব, তারপর'—চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি এনে বলল, 'তারপর তু যো কুছ মাঙ্গবি তাই দিব।'

আমি ওকে ধরতে গেলাম, ছিটকে সরে গেল !

—'না এখন হামাকে ছুঁবি না।'

সত্যিই সুখিয়াকে আমি ভালোবেসেছিলাম। ওর জন্য আমি জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত ছিলাম। আজ চারদশকেরও বেশি বছর পেরিয়ে গেছে, ও হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। কিন্তু এখনও আমি ইচ্ছে করলে ওর ছোঁয়া পেতে পারি, ওর গন্ধ পেতে পারি, ওর গলার স্বর শুনতে পারি। 'নখিন্দর !' এই সুর আমি হারমোনিয়মে বাজাতে পারি। ও আমার রক্তে মিশে গিয়ে ওর নিঃস্বার্থ-একেবারে আদিম ভালোবাসা দিয়ে আমাকে বহুগুণে ধনী করেছে। আমাকে বলত, 'তুকে তো হামি কোনোদিন পাব না, উতো হামি জানি ! শুন, হামাকে একটা বেটা দিবি যে তুর মত দেখতে হবেক ? উকে হামি পালব পেলে বড় করব। উ হামাকে মা বলবেক। বাস, উকে নিয়ে হামার দিন গুজার হয়ে যাবেক।'

সত্যি ওর ভালোবাসা ছিল খাঁটি সোনা। শুধু উজাড় করে দিতে জানত, চাইত না কিছু। তখনও ওকে বলি নি, যে আর আট দিনের মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে। একদিন দুদিন অন্তর ও আসত। নিজের হাতে রান্না করে

াসত কোনো দিন হরিণের মাংস, কোনোদিন জংলি মুরগি বা তিতিরের কতবার যে ওকে কিছু আমি দিতে চাইতাম, বলতাম 'তোর কি চাই কিছুতেই কিছু নিতে চাইত না। 'তু কি হামার কর্জ্জা, সব শোধ করে —জিজ্ঞেস করত হেসে। বলতাম, 'দুর, তোর ঋণ কি আমি জীবনে রতে পারব ? তবু তুই যেমন আমায় দিস আমারও তো তোকে তেমনি তে ইচ্ছে করে।' বলত, 'তুকে তো বলেছি—হামার কি চাই', বলতাম, দিতে চাইলেই আমি দিতে পারি ? নাকি, নিতে চাইলেই তুই নিতে ? যদি পারিস তো নে…।' ম্লান হেসে বলত, 'এতো নসিব হামার নেই, জানি।' তারপরেই সুর পালটে বলত, 'আরে খানা তো ঠাণ্ডা হয়ে চল্ খানা খা লে।'

ন আর আমরা গুহায় যেতাম না। গিয়ে বসতাম সেই দুটো পাথরের সবুজ গালিচায়। ও খাবার নিয়ে আসত কাঁসার বাসনে কাপড় বেঁধে। হাত লাগাতে দিত না। নিজের হাতে খাইয়ে দিত আর বকর বকর করে জীবনের সব গল্প বলত। ওর মা এখনো আছে, রাঙ্গাজানের কাছে জমি আর কাঠের বাড়ি বানিয়ে দিয়ে গেছে সাহেব। গাঁয়ে আছে মহিষ, য়োর মুরগি, সব আছে। ও থাকে না কেন মার কাছে ? কারণ মা আবার রেছে। আর ওর সেই বাপটা একদিন ওকে জোর করে ওর ইজ্জত নষ্ট দায়ের এক কোপে তার একটা হাত কেটে দিয়ে সুখিয়া পালায়। বাগানে য়। তখন ওর বয়স চোদ্দ। কিন্তু ওর বয়সী মেয়ের বাগানে একা থাকা য়। সবাই পিছনে লাগে। তাই ও ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক কুলি 'মরদ' ধরল। লোকটা ছিল ভীষণ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আর মাতাল। প্রায়ই প্রচণ্ড মার মারত। কিন্তু দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় কোথায় যাবে, কী করবে ? লোকটা আবার ওকে ভালোও বাসত। আদর সাধ্যমত শাড়ি গন্ধতেল চুড়ি বালা কিনে দিত, আবার মারত। এমনি চ বছর তার সঙ্গে ঘর করল। সেই সময়ই ওর সঙ্গে আমার দেখা পালা করতে এসে। সেই সময়ই ও পড়ে গেল বাগানের নতুন সাহেব রের চোখে। জানা লোক মারফৎ প্রস্তাব আসতে লাগল, 'সায়েব সাদি করবে, বিলেত লিয়ে যাবে।' কিন্তু ওর তাতে এতটুকু স্পৃহা ছিল ওর মাকে দেখে জানত যে কি লজ্জার এবং অপমানের জীবন এই কুলি। ওর মাকে ওর সাহেব-বাবা মদ খেয়ে আরও সব সাহেব বন্ধুদের ন্যাংটো হয়ে নাচতে বাধ্য করত, যে চাইত তার সঙ্গে শুতে বাধ্য করত। গর মেয়ে তা ওর মা-ই জানে না। বড় হয়ে বুঝতে শিখে ও নিজেকে রতে শিখল, আর সাদা চামড়ার লোকদের। ওর বাপ কে তা যদি ও তাকে গিয়ে ও খুন করত, তারপর ফাঁসি যেত। মিকির মেয়েদের দেখে ণ ভালো লাগত। ওরা কারও গুলামি করে না, নিজেরা খেতিবাড়ি করে নে, হপ্তায় হপ্তায় সওদা করে গাঁয়ে ফিরে যায়। কত স্বাধীন, কত সুন্দর মন হতে পারত। ওর বরাবরই ছিল স্বপ্ন। একজন বুড়ো মিকির ওকে ালোবাসত। তার নাকি ওর মতো দেখতে এক মেয়ে ছিল, সে মারা াই ওকে ও চাইত নিয়ে যেতে। কিন্তু ও ভাবতে পারত না কি করে যাকে ও মরদ করেছে তাকে বেইমানি তো করতে পারে না ! কিন্তু বেইমানি করল ওর সেই মরদ। সায়েবের কাছে অনেক টাকা খেয়ে ও মদ খেয়ে একদিন ওর মুখ-হাত বেঁধে মাঝরাত্তিরে তার গাড়িতে য় এল। কাকপক্ষীও টের পেল না। চৌকিদার আর বেয়ারাদের কড়া ওর বন্দীজীবন শুরু হল সায়েবের বাংলোর দোতলায়। তবে সায়েব ক কোনোদিন জোর করে নি। ওকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জয় চেষ্টা করত। ভালো ভালো খাবার, নতুন নতুন জামা কাপড়, খাঁটি গয়না, ভালো ভালো সেন্ট কত কী ওর জন্য আনত। ও ছুঁতো না এমনিভাবে ২। ৩ হপ্তা কেটে গেল। একরাত্রে সায়েব যখন কেলাবে মাঝরাত্রে ওর শোবার ঘরের জানালা দিয়ে চাদর বেঁধে ঝুলিয়ে নীচের নমে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর গিয়ে একটা ছোট গাছে চড়ে সারারাত ও জানত পরদিন রবিবার—হাটদিন। সকাল হতেই ও হাটে এসে করকে অসমীয়ায় বলল, বাবা আপোনাক ময় বাবা কহিছোঁ—আপনি শ্রয় দিঅক' (আপনাকে আমি বাবা বলেছি—আপনি আমাকে আশ্রয় ন্দে ওকে গ্রহণ করল ওর সেই মিকির বাবা। মিকিরদের গায়ে হাত দেবে এমন কোনো লোক নেই, সেটা ও জানত। রামদাও-এর এক কোপে ওরা বাঘকে পর্যন্ত দুটুকরো করে ছাড়ে। ওর এই মিকির বাবা ওকে আশ্রয় দিল। সে আজ বছর দুয়েক আগেকার কথা। তারপর থেকেই ও থাকে মিকির বস্তিতে। ওর মার সাহেব মরদ যাবার আগে বিটিয়ার জন্য দুহাজার টাকা আলাদা দিয়েছিল। সেই টাকা ওকে মা দিয়েছে। তাই দিয়ে ও অনেক জমি জিরেত কিনেছে। গরু ছাগল হাঁস মুরগি সব আছে। মিকিরদের মতো না করে ওর জমিতে ও ফুলকপি বাঁধাকপি আলু বেগুন টম্যাটো সব চাষ করায়। তাই দেখে এখন মিকিররাও কেউ কেউ তা শুরু করেছে। তাই নিয়ে ওর বেশ একটু গর্ব আছে মনে হল।

বললাম, 'তাহলে তো তোর কাছে গিয়ে থাকলে আমার আর খাওয়াপরার কথা ভাবতে হবে না ?' সুখিয়া বলে উঠল, 'উরে হামার মরদরে, তু যাবি হামার কাছে ? থাকবি হামার সঙ্গে ? আর ডাগদার বাবুটা হামার গলাটা চাকু দিয়ে কাটি দিবেক'—গলার কাছে হাতটা নেড়ে মুখে শব্দ করল—'খচাং'। বলে হাসতে হাসতে আমার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তখন ওকে বললাম যাবার কথা। বললাম,'সুখিয়া আর চারদিন পরে চলে যাচ্ছিরে।' সুখিয়া যেন চমকে উঠে বলল, 'কুথা ?'—

'কলকাতা। এই সামনের মঙ্গলবার। শুক্র শনি রবি সোম, বাস এই চারদিন বাকি।' সুখিয়া বলল, 'আজ তো শুকরবার, তিন দিন বল।'

তারপর বলল, 'আগে কেনে বলিসনি, তাহলে হামি রোজ তুর কাছে আসতাম।' বললাম, 'ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে রোজ আসা, কত তোর কষ্ট হয়, তাই বলিনিরে।' ওর মুখ রাগে থমথমে লাল হয়ে উঠল। বলল, 'কোসটো ! আর তু চলে গেলে হামি খুব আরামে থাকব—বটে ?'—বলে উঠে কিছুদূর গিয়ে আমার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে রইল। আজ ও মিকির পোষাক পরে এসেছে।—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেকক্ষণ আসছে না দেখে ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে ওকে সামনে ফেরাতে দেখি দুগাল বেয়ে চোখের জলের ঢল নেমেছে। তাই দেখে আমার যেন বুক ভেঙে কান্না এল। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলুম। তারপর একসময় ও সামলে নিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে আমার মাথাটা ওর কোলে নিয়ে বসল। সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে, ও আমার চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতে লাগল। আর মাঝে মধ্যে আমার কপালে চুমো খেতে লাগল। হঠাৎ সেই ফেউটা যেন খুব কাছেই ডেকে উঠল। আমি চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি যে জঙ্গলে অন্ধকার নেমে এসেছে। সুখিয়া আমার হাত ধরে বলল, 'চল্, দের হইয়ে গেছে।'

বললাম, 'বাঘ বেরিয়েছে।'

সুখিয়া বলল, 'ডর নেই চল। বাতাসটা পুবে বইছেক তো আর উ আছে পচ্ছিমে হামাদের বাস পাবেক নাই।'

—'কিন্তু তুই একা কি করে ফিরে যাবি ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

'—ফিরবক নাই—মার লগে থাকব। রাঙ্গাজানে।' রাঙ্গাজান আমাদের হাতীখুলি বাগান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূর—(আমার বাবার এলাকার মধ্যেই।)

—'কিন্তু তোর বাপ ?—জিজ্ঞেস করলুম,'উ এখন একদম বুঢ়া হইয়ে গেছে, চোখে ভি দেখে না, হামাকে বলে, যো হইয়ে গেছে সো হইয়ে গেছে। তু ফিরে আ সুখিয়া।' —বলে হাসল সুখিয়া। তারপর বল্ল, 'ই কদিন আর গাঁয়ে ফিরবক নাই। তালে তুকে রোজ পাব।' হাসপাতালটার কাছ বরাবর এসে ও একটু আদর করে বলল, 'যা। কাল ঠিক এক বাজে, হাঁ ?'—বলে ও বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। সারা পাহাড় কাঁপিয়ে সেই ফেউ তখন চিৎকার করছে—ফেউ ! ফেউ ! ফেউ !

ধারাবাহিক

আর্ট কালেকশনের অষ্টপ্রহর

সুভো ঠাকুর

সাত

শান্তিনিকেতনী মার্কা স্বর্গীয় শান্তিময় সৌন্দর্য ওর হাতে আসবে কি জোনো. কেমন কোরে

ইতিমধ্যে আর্ট স্কুলের সম্মুখস্থিত চৌরঙ্গীর চত্বর বেয়ে গঙ্গার জোয়ার-ভাটার মতোই কতো না স্রোত এসেছে আর গেছে। কখনও থমকে দাঁড়িয়েছে, আবার কখনও হোয়েছে খেলায় মত্ত। কখনও আবার ঘোমটা টেনে খ্যামটা নাচের আড়ালে বাইজীদের মতো ঘুঙুর পায়ে ঘাগরা উড়িয়ে একপাক নাচ দেখিয়ে, যেন দ্রুতগতিতে বোয়ে গ্যাছে।

কতোই না বিচিত্র ছিলো সেই সব জনজীবন ! তবে ওদের আর্ট স্কুলের জীবনধারায় সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘোটেছিলো যা, তা হোলো নতুন প্রিন্সিপালের পদার্পণ।

গাঙ্গুলীমশাই, অর্থাৎ শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী তখন ইস্কুলের অফিসিয়ালি প্রিন্সিপালের পদ থেকে স্বততই পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছেন—নতুন প্রিন্সিপালের শুভাগমনের সম্ভাবনায় সবাই তখন উত্তেজনায় উদ্‌ব্যস্ত।

এতোদিন কলকাতার এই সরকারি আর্ট স্কুলের একটা কৌলিন্য ছিলো—ওই সব গোরা প্রিন্সিপালদের দৌলতে। এতোদিন এই আর্ট স্কুলের ট্র্যাডিশান ছিলো—ভাইস প্রিন্সিপাল অব্দি দেশী লোক হোতে পারে—এমন কি অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপালও হোতে পারে, কিন্তু প্রিন্সিপাল নৈব নৈব চ। আর সেই প্রিন্সিপালের পোস্টে কিনা এবার একজন দিশী লোক ! তারওপর সে কিনা আবার কালো বাঙালি। ছাত্র থেকে মাস্টার—সবাইয়ের ধারণা, এবার স্কুলের বারোটা বেজে গেল। স্কুল আর বাঁচবে বোলে তো মোনে হয় না। ধরাতল রসাতলে যেতে বোসেছে।

তবে অনেকটা সান্ত্বনা পেলো ওরা, যেদিন শুনলো—দিনে দুপুরে খাবার সময় প্রিন্সিপাল সাহেব খাঁটি সাহেবের মতোই বিয়ার খুলে খান। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যেবেলায় স্কচ খোলেন ট্যাঁক ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে নয়, খাঁটি গোরা ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে আড্ডা জমাতে। এছাড়া নতুন প্রিন্সিপাল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আওতায় আবাল্য বর্ধিত এবং অবনীন্দ্রনাথের স্নেহসিঞ্চনে হোয়েছে তাঁর শিল্প-শিক্ষার প্রথম পর্ব পল্লবিত।

এই প্রিন্সিপাল সাহেব, তথা মুকুল চন্দ্র দে (এ· আর· সি· এ·) এবার সকলের চোখে তাক লাগিয়ে এই সর্বপ্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপালের পদাধিকারী। বহুদিন বিলেতে অবস্থানের পর স্বদেশে এসেই এহেন রাজ্য জয়। স্বভাবতই ভারসাম্য যদি এদিক-ওদিক হয়, তবে তা স্বাভাবিক বোলেই মেনে নেয়া উচিত নয় কি ?

ছাত্রমহলে তখন গুজবের গম্বুজ তৈরি হোয়েছে যেন। দিনের বেলায় যিনি মাছের ঝোল-ভাত খাওয়ার সময় বিয়ার খান, ট্যাঁস ফিরিঙ্গীদের চোখ টেরিয়ে খাঁটি সাহেবদের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় যিনি স্কচ খোলেন, রাত্তির বেলা ডিনারের সঙ্গে যিনি শুয়োর-গরু খান, তিনি যতোই কালো হোন আর যতোই দিশী হোন, তিনি আদতে ছাত্র ও শিক্ষক মহলের কাছে সাহেবের চেয়েও সাহেব। তাঁর একটা হুংকার, সোঁদরবনের বাঘের সে যেন হালুম-ডাক। পেয়াদা-পিওন থেকে শুরু কোরে হেডমাস্টার, শিক্ষক আর তাবড় তাবড় সিনিয়ার ছাত্ররাও একেবারে তটস্থ। তটস্থ শুধুই কি ?—ধরাশায়ী, পপাত ধরণীতল্প।

এহেন প্রিন্সিপাল সাহেব—মুকুল চন্দ্র দে (এ·আর·সি·এ) তথা সর্ট-কাটে মুকুল দে, নতুন প্রিন্সিপাল হোয়েছেন যখন, তখন একটা নতুন কিছু তো দেখাতেই হবে বা কোরতেই হবে। সবচেয়েও সোজা ছাগশিশুর মতো এই আর্ট স্কুলের নিরীহ ছাত্রদের ঘাড়ে কোপ মারা। তিনি প্রিন্সিপাল হোয়েই একটা নতুন কিছু করার তাগিদেই হয়তো বা ছাত্ররা ইস্কুলের তরফ থেকে যে কাঠের একটি বোর্ড পেতেন, যার ওপর কাগজ সেঁটে আবহমানকাল থেকে অভ্যস্ত কাজ করতে তাঁরা, সেইটেই সর্বপ্রথম বাজেয়াপ্ত করলেন—এরপর থেকে ছাত্ররা আর সরকারের তরফ থেকে বোর্ড পাবেন না।

অনেক ছাত্র, যাঁরা ছিলেন স্বাধীনচেতা—অন্যায়কে বরদাস্ত কোরতে সদাই বিন্দুমাত্র রাজি নন, তাঁরা সবাই একজোট হোয়ে স্ট্রাইক ডাকার বন্দোবস্ত কোরতে ব্যস্ত হোলেন।

এর মোধ্যে সেই সুন্দর স্বাস্থ্যবান দেহের যে ছেলেটি মালিক ছিলো, সেই রেণু রায়ের মুখটা সুভো ঠাকুরের আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর্ট স্কুলের লবঙ্গ-লতিকা ল্যাকপেকে মার্কা
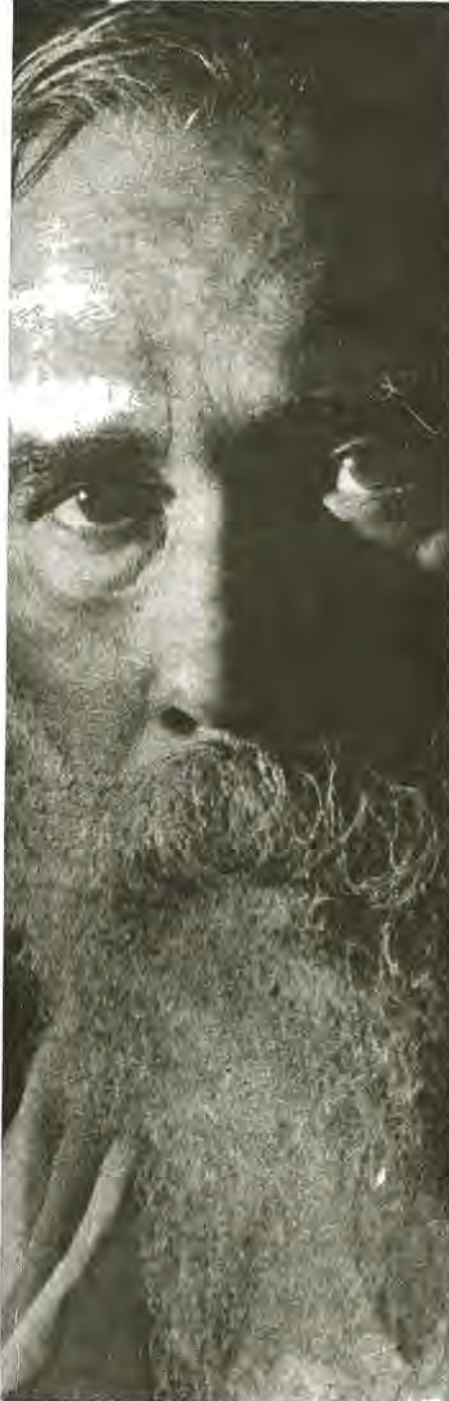
সুভো ঠাকুরের মোনে পড়ে যামিনীদা গল্পের ছলে একদিন ওকে বোলেছিলেন, তুমি কি 'আর্ট অফ সুভো টেগোর'-এর লেখা আদায়ের জোন্যে এদিক-ওদিক আদা-ছোলা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ ! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই শেষ বয়েসে তাঁর ছবির সার্টিফিকেট আদায়ের আশায় তোমার চেয়েও অনেক বেশি ঘোরাঘুরি রপ্ত কোরেছিলেন, সেই বয়েসেও।

[illegible]ক্কুর স্ট্যাণ্ডের ওপর কাঁচের দোয়াত

[illegible]দের মোধ্যে ওর সুন্দর পেশীবহুল চেহারা [illegible] একটা ব্যতিক্রম। দমদমার দিকে ঘুঘুডাঙা [illegible] কোনো জায়গার জমিদার-তনয় ছিলো ও। [illegible] রায়ই এই স্ট্রাইকে লিডারের পদ আপনা হোতে [illegible]কার কোরে বোসেছে। সুভো ঠাকুর আজও [illegible] আঁকা নানা ভঙ্গীর বীর হনুমানের ছবিগুলো [illegible]টার পর একটা যেন মোনে মোনে দেখতে [illegible]

রেণু রায় তখন মহাউদ্যমে ওর নিজস্ব মোটর বাইকে চোড়ে উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রভাবশালী সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন প্রিন্সিপালের নিরীহ-দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি এইরূপ অত্যাচারের কথা বুঝিয়ে বোলতে সদাই ব্যস্ত।

ছাত্রদের তরফে রেণু রায়ের এইরূপ উৎসাহ এবং উদ্যমে যখন অনেকটা কাজ সফলতার দিকে এগিয়েছে, তখন এক অপরাহ্নে মর্মান্তিক সেই খবর ছাত্রমহলে এসে হাজির। রেণু রায় আর নেই। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে দ্যাখা কোরতে যাওয়ার সময় এ্যাকসিডেন্টে মোটর বাইক সমেত তার মৃত্যু ঘোটেছে। স্পট ডেড। আর্ট স্কুলের ইতিহাসে সেই ছিলো বোধহয় ছাত্রদের তরফে সর্বপ্রথম আন্দোলন। এ আন্দোলনের মেরুদণ্ড রেণু রায়ের অবর্তমানে স্বভাবতই ভেঙে গেছিলো।

এরপরেই তো মুকুল দে মহাশয়ের আন্দোলনের হোলো সূত্রপাত। তিনি নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথকে

তাঁর অতিথি কোরে। রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে বিরাট সভা হোলো ডাকা। সুভো ঠাকুরদের সেই ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাসের বিশাল হল বাঙালি, সাহেব এবং অন্যান্য প্রদেশের সুধি সমাজের বিশিষ্ট মানুষ, যাঁরা তখন কলকাতায় অবস্থিত ছিলেন, সকলেই নির্বিচারে সে সভায় উপস্থিত হন। তাঁদের মোধ্যে যাঁদের যাঁদের সুভো ঠাকুর চিনতো, তাঁদের মোধ্যে গুটিকয়েক মুখ আজও ওর মোনে পড়ে। তাঁদের মোধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু কোরে অবনীন্দ্রনাথ, স্যার পি· সি· রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি নানা জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব-বিশেষ। সত্যিই শ্রদ্ধাস্পদ মুকুল দে মহাশয়ের এই সকল বিশ্ববিশ্রুত লোকদের টেনে আনার ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার্য।

তারপর এখানেই তো শুরু হোয়েছিলো খুড়ো আর ভাইপোর সেই ঐতিহাসিক মতাদ্বৈধতা।

অবনীন্দ্রনাথ বলাবাহুল্য ছিলেন ছাত্রদের তরফে। খুড়ো, অর্থে রবীন্দ্রনাথ যতোই না কেন ছাত্রদের প্রতি বিষোদগার পূর্বক তাদের এইরূপ ইনডিসিপ্লিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, ভাইপো তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে এবং ভাষায় যা বোললেন, তার শব্দ কয়েকটি আজও সুভো ঠাকুরের মোনে পড়ে। যথা—বোলেছিলেন, এ কি কোরেস মুকুল! ছেলেদের নেমন্তন্ন কোরে পংক্তি ভোজে বোসিয়ে পিঁড়ে কেড়ে নিয়েস যে তুমি।' এরপর ভাষণের কথাগুলো আর মোনে নেই। কিন্তু সুভো ঠাকুরেরা তখন সবাই রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথের জয়গানে মত্ত। ছাত্ররা তখন সবাই বোলতে লেগেছে—রবীন্দ্রনাথ একচোখো হরিণের মতো শুধু মুকুল দে-র দিকটাই দেখলেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দুঃখ-দৈন্য অনুভব কোরেই বোর্ডের জায়গায় পিঁড়ে কেড়ে নেয়ার কথাই উল্লেখ কোরেছেন।

এরপর শ্রদ্ধেয় মুকুলচন্দ্র মহাশয় ওঁর প্রতি ঈশ্বরের একান্ত অনুরাগের কথা উল্লেখ কোরে বোললেন, ওঁর বিরুদ্ধে যে যাবে, অপঘাত-মৃত্যুতে তার অবসান অবশ্যম্ভাবী। আগেকার দিনের পুরোহিতদের মতোই ওঁর এই সাবধান-বাণী বুঝি প্রতিধ্বনিত হোলো।

স্ট্রাইকের অবসান ঘোটেছে। আর্ট স্কুলের এই পংক্তি ভোজে আমন্ত্রিত হওয়ার পরও অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পিঁড়ে' আর ছাত্রদের ভাগ্যে জোটেনি।

সুভো ঠাকুরের আর্ট স্কুলে যাওয়া আসার কাহিনী সেই একই রকম। ওর আর আর্ট স্কুল ভালো লাগছে না। ও স্বপ্ন দেখছে বিলেত যাওয়ার। বোম্বের আরব সাগরের পিঠে ওর জাহাজ জল কেটে যেন রাজহাঁসের মতোই এগিয়ে চোলেছে। ওর মুখে সিগার, ডেকেতে কোন্ সে ইতালিয় সুন্দরীর মুখ ক্যানভাসে ধোরে রাখতে ও যেন তখন তৎপর। ইজেলটা এক হাতে ধোরে, আর এক হাতে তুলি সমেত রঙের প্যালেটটা ধরা। ও নিজেকে নিজের মোনে ওই রকম অবস্থায় কল্পনা কোরে এমনই বেহুঁশ যে, একদিন ইয়া বড় একটা সিগার মুখে ইস্কুলে এসে হাজির। সুমুখে পোড়লেন শ্রদ্ধেয় শিল্প-শিক্ষক কুশল মুখার্জি। তিনি ওকে দেখে বোলে উঠলেন, একি কোরেছ টেগোর! তোমার মুখের অনুপাতে সিগারটি যে বড্ড ভারি। কুশলবাবু এরপর তাঁর ক্লাসে চোলে যান। তাঁর সে নিখুঁত চেহারা, তাঁর সে বিলিতি ভদ্রতা পরিপাটি-পরিচ্ছদ বেশভূষা, উপরন্তু গলায় সেই প্রজাপতির মতো বো-টি বাঁধা। আজও ওঁর কথা সুভো ঠাকুরের প্রায়ই মোনে পড়ে।
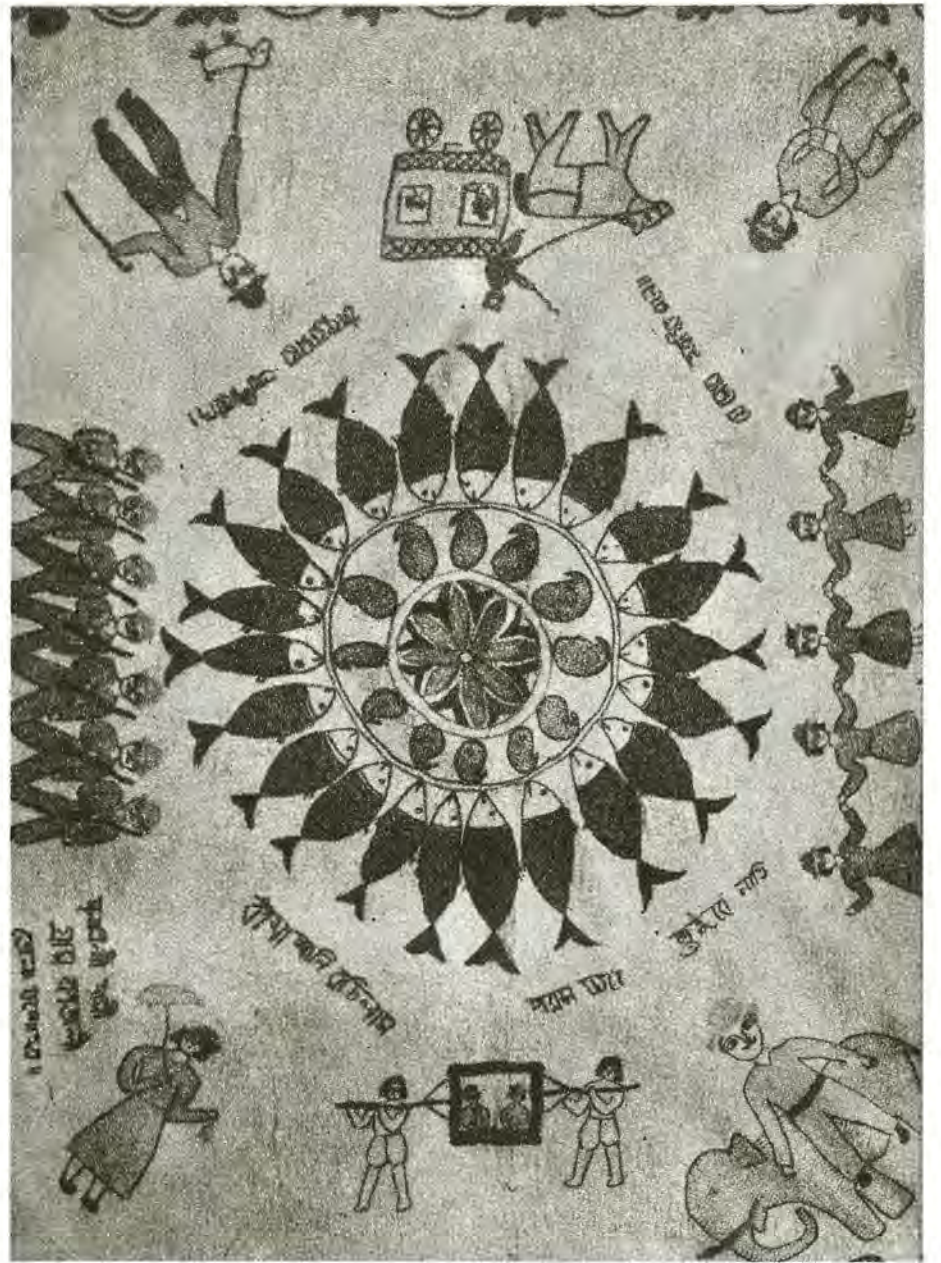
এরপরই তো আচারিয়া, অর্থাৎ হেডমাস্টারের সঙ্গে সুভো ঠাকুরের হয় মুখোমুখি দ্যাখা। যার ফলে ও বিতাড়িত হোয়েছিলো, কি রাসটিকেটেড হোয়েছিলো, মোনে নেই। সেই কারণে স্কুল থেকে ও বিতাড়িত হোয়েছে না বোলে ও নিজেই ইস্কুল পরিত্যাগ কোরেছে, এই কথা প্রচার কোরে বেড়াতে লাগলো।

ও বলে ঈশ্বরীবাবুর ক্লাসেও ও আর যাবে না।

সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের জোন্যে পিতার দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বকনিষ্ঠ, অথবা শেষ সৃষ্টিশীল প্রায়াস চিত্র-অঙ্কন নয় কি?

সেই কারণে তাঁর সৃষ্ট এই চিত্রশিল্পকে যদি নিজ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে চেয়ে থাকেন, তবে কি এমোন অন্যায় হোয়েছে? তাঁর এই সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের মতোই তাঁর সৃষ্ট চিত্রকলার জোন্যে যদি কিছু হেনস্তা, অথবা ই-কার ইঙ্গিতে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন তাঁর মতোন লোকের যদিচ হোতে হোয়েছিলো, তবে তা তিনি মোনে হয় সন্তান

তপাথরের চীনে দোয়াত

হে একান্ত অন্ধ হোয়ে অবনত মস্তককেই সহ্য ারে নিয়েছিলেন।

সুভো ঠাকুর বলে সাত সকালে উঠেই কমলা বুর সরবতে প্রাতঃকালীন উপোসভাঙা, অর্থাৎ ন্য ব্রেকফাস্ট হিসেবে গ্রহণ করার পরই সেই কে মুসোলিনির উপহার প্রদত্ত কূর্মাকৃতি উসমার্কা ধ্যাবড়ামুখো ফিয়াট গাড়িতে চোড়ে থায় 'আর্ট ও আহিতাগ্নি'-র লেখক যামিনী নের বাড়ি, কোথায় বা আর্ট হিস্টোরিয়ান প্রবীণ সি গাঙ্গুলীর বাড়ি, আর কোথায় বা াগবাজারের গলিস্য গলির মোধ্যে শিল্পী যামিনী ায়ের বাড়ি। তাঁদের মতামত সংগ্রহের দরুন কাথায় না কোথায় ছোটাছুটি কোরতে কমতি কারেছেন কি তিনি কিছু?

সুভো ঠাকুরের মোনে পড়ে যামিনীদা (শিল্পী যামিনী রায়) গল্পের ছলে একদিন ওকে বোলেছিলেন, তুমি কি 'আর্ট অফ সুভো টেগোর'-এর লেখা আদায়ের জোন্যে এদিক-ওদিক আদা-ছোলা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই শেষ বয়েসে তাঁর ছবির সার্টিফিকেট আদায়ের আশায় তোমার চেয়েও অনেক বেশি ঘোরাঘুরি রপ্ত কোরেছিলেন, সেই বয়েসেও। এক দিন সকালে মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে তুলি হাতে আমি যখন আসনে বোসেছি, ছবির ওপোর একটা নোতুন পোচ দেবার আশা নিয়ে। এমন সময় কিনা সশরীরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির—ভাবা যায়! একেবারে অপ্রত্যাশিত! আকাশ থেকে পড়ার মতো! হাতে তাঁর নিজের আঁকা ছবির বাণ্ডিল। ঘরের চারপাশে আমার আঁকা ছবিগুলি সপ্রশংস নয়নে দেখে উনি কবিজনোচিত উচ্ছ্বাস-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছবিগুলো সামনের নিচু টুলটায় মেলে ধোরেছেন। তাঁর সেই সরল শিশুসুলভ ছবিগুলি বলাবাহুল্য আমার চিত্তহরণ কোরতে বিন্দুমাত্র সময় নেয় নি। আমি তাঁর ছবিগুলি দেখার পর তাঁকে শুধু একটা কথাই শুধিয়েছিলুম, আপনি আপনার এই ছবিতে যদি বিশ্বাস করেন, তবে শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষা অন্য পথে বা বিপথে কার নির্দেশে ভুল পথের পাথারে বানচাল হোতে বসেছে

এই সাংঘাতিক প্রশ্নে কিরূপ সমাধান সহকারে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন, সে কথা যামিনীদার কাছ থেকে সুভো ঠাকুর শুনেছিলো কিনা, তা আজ আর ওর স্মরণ পথে পড়ে না।

এই ঘটনার অনেক পূর্বেই ওদের আর্ট স্কুলে মহা

সমারোহে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী তখন রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের নতুন প্রিন্সিপাল মুকুল দে (এ· আর· সি· এ) মহাশয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হোতে চোলেছে। তখনকার দিনে কলেজ না হোলেও আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল কলকাতা তথা ভারতবর্ষের শিল্পজগতে কেউকেটা, অবশ্যই কেষ্টবিষ্টু হিসেবেই সর্বজনপরিচিত।

সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ছবি সরকারি আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপালের মতো বিশেষজ্ঞের উদ্যোগে প্রদর্শিত হোলে তার যে শিল্প জগতে একটি বিশেষ মূল্য আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

প্রিন্সিপাল শ্রীমুকুল দে মহাশয়ও এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্কুলের ধর্মঘট বা স্ট্রাইক ভাঙার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ তাঁর আঁকা ছবির এই এগজিবিশন অনুষ্ঠিত কোরে কিছু তো অন্তত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কোরেছিলেন বোলেই ছাত্রমহলে গুঞ্জন হয়। উপরোক্ত তদানীন্তন বৃটিশ সরকার-বাহাদুরের কাছেও রবীন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত 'স্যার' উপাধি তাঁর নামের সঙ্গে নিযুক্ত হোয়ে পত্র-পত্রাদি এবং প্রচারপত্রে মুদ্রিত হোয়ে প্রচারিত হওয়ায় তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের কাছেও তাঁর, অর্থাৎ শ্রী মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের যথেষ্ট সুনাম সঞ্চারিত হয় বোলে শোনা যায়।

ওপরিত্যাগ কোরলো সরকারি আর্ট স্কুল। ওর এমনতিরো অহমিকার অহমিকায়, ওর এমনতিরো অবিমৃষ্যকারিতায় সবাই হতবাক। ও কিন্তু মোনের দিক থেকে অনেক বেশি হোয়ে উঠেছে সাহসী। অনেক বেশি স্টেবল। বাড়িতে বোসে নিজের মোনে ছবি আঁকে। নিজের সম্পাদিত 'ভবিষ্যৎ' নামের কাগজে ওর তখনকার দু'একটি ছবিও ছাপা হোয়েছে। তারপর 'অগ্রগতি' সাপ্তাহিকে লিখলো একটা প্রবন্ধ, ওয়াল্টার হুইটম্যানের সেই বিখ্যাত লাইন কোট কোরে—'আই সেলিব্রেট মাই সেলফ।' তার সঙ্গে ওর আঁকা ছবির যে নিদর্শন ছিলো, তাতে নিও বেঙ্গল স্কুলের পথে কাঁটা দিয়ে নোতুন পথের দিশারী হওয়ার প্রস্তুতি পর্বের সোচ্চার ঘোষণা অবশ্যই ঘোষিত হোয়েছিলো। তারপর ওর প্রথম ওয়ান ম্যান শো দেখা যায় অধুনালুপ্ত সেই কন্টিনেন্টাল হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোর হলে। তাতে টোটেম পোলের কম্পোজিশনে কলাগাছ, একটি বিরাটাকায় মর্কট আর তার সামনে একটি গ্যাস মাস্ক পরা মানুষ। সেই গ্যাস মাস্ক পরা মানুষটি সঙ্গে সেই মর্কটটির কি অদ্ভুতই না সাদৃশ্য।

সুভো ঠাকুর ওইসব চিত্রকলায় আধুনিক এক্সপেরিমেন্ট কোরতে যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন ক্যালকাটা গ্রুপের অস্তিত্ব ভ্রূণ অবস্থাতেও ছিলো উহ্য। এটা সুভো ঠাকুরের শুধু মোনের কথা নয়, এর নিদর্শন সেদিনের দৈনিক অনেক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রসহ প্রতিবেদনে যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারে।

সুভো ঠাকুর বলে আর্ট কালেকশানের অষ্টপ্রহরে মানুষই তো শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ। আর তাকে ঘিরেই তো এই অষ্টপ্রহরের নাম বদনামের শত নামের সংকীর্তন। মানুষ ছাড়া ওর মোনের নজরে কিছুই যে আর নামতে চায় না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', কিন্তু ওর মতে তাহার ওপরেও একটুখানি আছে। সেটা হোচ্ছে মানুষের ভাগ্য। সেই হিসেবে এ অষ্টপ্রহরের এই প্রথম পাঠ ওর নিজের সঙ্গে নিজের অলক্ষ্যে ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশত যে বিচিত্র মানুষের মিছিল, অজান্তে কখন যে গেট ক্র্যাশ কোরে ঢুকে পোড়েছে, সে খবর অবান্তর হোলেও অবশ্যই স্বীকার্য। এ কথা 'আমাদের দাবী মানতে হবে'-র মতোই 'মানতে হবে, মানতে হবে'।

শেক্সপীঅর-রচিত

অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা

অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অঙ্ক দুই

[দূতের সঙ্গে অ্যান্টনির প্রবেশ]

লভিয়া, আপনার স্ত্রী রণাঙ্গনে প্রথমে আসেন ।
কার বিপক্ষে ? আমার ভাই লুসিঅস-এর ?
জ্ঞে হাঁ ।
ব সে-যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হয়, আর কালক্রমে
জারের সাথে যুদ্ধে সসৈন্যে উভয়ে মেলেন
থম সংঘর্ষে সীজারের জয় হয়, তার ফলে
গলি ছেড়ে তাঁরা পলাতক ।
ভালো, আছে আরো খারাপ কিছু ?
-খবর এমনই খারাপ যা বক্তাকে সংক্রামিত করে ।
বক্তা যদি কাপুরুষ অথবা নির্বোধ হয় । বলে যাও ।
আমি বুঝি ঘটেছে যা—যাক । তাই জেনো,
যে আমাকে সত্য বলে, তাতে যদি জীবনও যায়,
তার কথা শুনি যেন করছে সে তোষণ ।
বিএন্যাস—
দারুণ এ সংবাদ—তার পার্থীয় বাহিনী নিয়ে
শয়ায় অধিকার করেছে বিস্তার ; ইউফ্রেটিস থেকে
ক দিকে উড়ছে তার বিজয় পতাকা, সিরিয়া থেকে
বিয়ায়, সেইসঙ্গে আইওনিয়ায়
চ—
লতে চাও—অ্যান্টনি তখন—
প্রভু !

অ্যান্ট । অকপটে বল, জনমত চাপতে যেও না
রোমে ক্লিওপেট্রাকে সবাই যা বলে তাকে তাই বল
ফুলভিয়ার বাক্যবান হানো, আমাকে বিদ্রূপ কর
দোষত্রুটি নিয়ে এমন অবাধে—সত্য ও বিদ্বেষ মিলে
যতটা তা করতে পারে । আমাদের কাজের মন
আলস্যে ভরে আগাছায়, ত্রুটিগুলো বলা মানে
নিড়ানো মনের জমি । আপাতত যেতে পারো ।
দূত । যথা আজ্ঞা ।

[প্রস্থান]

[আরেক দূতের প্রবেশ]

অ্যান্ট । কি খবর সিসিঅন থেকে ? কী বলবে বল ।
প্রথম দূত । সিসিঅনথেকে কে—কেউ কি এসেছে ?
দ্বিতীয় দূত । আপনার অভিরুচি অপেক্ষায় আছে ।
অ্যান্ট । আসতে বল তাকে ।
আমি ভাঙবো এই সুকঠিন মিশরী শিকল
নইলে আমি মোহবশে নিজেকে হারাবো ।

[আরেক দূত একটি চিঠি নিয়ে প্রবেশ]

কে তুমি ?
তৃতীয় দূত । আপনার স্ত্রী ফুলভিয়ার মৃত্যু হয়েছে ।
অ্যান্ট । কোনখানে ?
তৃতীয় দূত । সিসিঅন-এ
কতদিন রোগভোগ করেছেন, সেইসঙ্গে গুরুতর
আপনার আরো যা জানবার, এতে লেখা আছে ।

[একটি চিঠি দিল]

অ্যান্ট । আচ্ছা এসো ।

[দূতের প্রস্থান]

চলে গেল মহীয়সী এক ! আমারও তো কাম্য ছিল এই
ঘৃণাভরে আমরা যা ফেলে দিই দূরে, আবার তা
ফিরে পেতে চাই । আজ যা আনন্দ জোগায়
অবস্থার চক্রে তাই হেয় হতে থাকে, শেষকালে
হয়ে যায় তার বিপরীত ; সে ভালো যেহেতু নেই,
যে হাতে ঠেলেছি দূরে সে হাত কাঙাল তাকে পেতে ।
মায়াবী মিশরিনীর মোহবন্ধ ভাঙবই আমি,
যত দোষে দোষী আমি জানি, তার শতগুণ দোষ
জন্ম নিচ্ছে আলস্যে আমার । এই এনোবার্বস, শোনো !

[এনোবার্বস'এর পুনঃপ্রবেশ]

এনো । বলুন কি অভিরুচি ?

অ্যান্ট । আমাকে এখনি এখান থেকে যেতে হবে ।

এনো । তাহলে যে আমরা আমাদের নারীকুলের ঘাতক হব ।
আমরা তো দেখেছি সোহাগের একটু ঘাটতিতে তাদের জান
কি রকম যায়-যায় ; আমরা চলে গেলে বিরহে
তাদের মৃত্যু অনিবার্য ।

অ্যান্ট । আমাকে যেতেই হবে ।

এনো । সেরকম অনিবার্য অবস্থায় মেয়েদের মরতে হলে
তারা তো মরবেই ; তবে অযথা তাদের পরিত্যাগ করাটা
খুবই আফশোষের ব্যাপার, বিশেষ করে যখন মহৎ কোনো
উদ্দেশ্য ও তারা—এ দুয়ের মাঝখানে তাদের অস্তিত্ব
নেই বললেই চলে । এই খবরের রেশমাত্র ক্লিওপেট্রার
কানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যাবে । এর চেয়ে
অনেক অনেক তুচ্ছ ব্যাপারে আমি তাকে কমপক্ষে
বিশবার মরতে দেখেছি । আমার তো মনে হয়, মরণ ওর
রসের নাগর, তার সঙ্গে ওর কিছু লটঘট চলেছে, তাই
ও অত ঘন ঘন মরতে চায় ।

অ্যান্ট । পুরুষের সাধ্য নেই ওর ছলচাতুরী বোঝে ।

এনো । ছিঃ ছিঃ ও কথা বলবেন না : তার পিরীতিতে
সাচ্চা প্রেমের সবচেয়ে মিহিভাগ ছাড়া আর কিছু নেই ।
আমরা তার হাহুতাশ তার অঝোর ধারাকে শুধু
দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল বলে উড়িয়ে দিতে পারি না ;
পাঁজিতে যে সব ঝড় জলের খবর দেওয়া থাকে
এরা তার চেয়ে অনেক বড় দরের । এ তার ছলচাতুরী
হতে পারে না ; তাই যদি হয় তবে তো সে
বরুণদেবের মতোই অঝোর বাদল ঝরাবার শক্তি রাখে ।

অ্যান্ট । তার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভালো হত ।

এনো । তাহলে তো তাজ্জব হবার মতো বলিহারি একটা
কাজ আপনার না দেখাই থেকে যেত, আর দেখে
ধন্য না হতে পারলে আপনার দেশ বেড়ানই ব্যর্থ হত ।

অ্যান্ট । জানো, ফুলভিয়া মারা গেছে ।

এনো । কি বললেন ?

অ্যান্ট । ফুলভিয়া মারা গেছে ।

এনো । ফুলভিয়া ?

অ্যান্ট । মারা গেছে ।

এনো । তাহলে কৃতার্থ হয়ে দেবতাদের দরগায় পুজো
দিন । দেবতারা খুশি হয়ে যখন কোনো মরদের
আওরাতকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেন, মরদটাকে
তাঁরা দেখিয়ে দেন তাঁরা খাস দুনিয়ার দর্জি
তাতে ভরসা থাকে পুরনো সাজপোশাক
রদ্দি হয়ে ছিঁড়ে গেলে নতুন সাজপোশাকের
যোগানদার মজুত আছে । ফুলভিয়া ছাড়া
আর কোনো মেয়েমানুষ যদি না থাকত তাহলে
সত্যিই আপনি খুব দাগা পেতেন,
ব্যাপারটা তখন সত্যিই দুঃখের হত ; তবে
এই দুঃখে সান্ত্বনা এই, আপনার পুরনো
সেমিজ নতুন একটা ঘাগরা নিয়ে আসছে,
সত্যি বলতে কি এই দুঃখে চোখ ছলছল
পেঁয়াজের ঝাঁঝে চোখের জল ঝরানো ।

অ্যান্ট । রাজ্যে সে এমন জট পাকিয়ে গিয়েছে
যে আমার না গেলেই নয় ।

এনো । এখানেও আপনি এমন জট পাকিয়ে
রেখেছেন, বিশেষ করে ক্লিওপেট্রায়, যে
আপনি ছাড়া কিছুতেই তা ছাড়ানো যাবে না,
তাই আপনার এখানে থাকাও পুরোপুরি
দরকার ।

অ্যান্ট । আর রসিকতা নয় । আমরা যা করতে চাই
ফৌজীনায়েকেরা জেনে রাখে যেন । আমি নিজে
রানীকে বলছি কেন আমাদের যাবার এ তাড়া,
যাতে ছাড়া পাই তার আনছি সম্মতি । শুধুই যে
ফুলভিয়ার মৃত্যু, আরো জরুরি খবর কিছু
আমাদের জোরদার তলব করেছে, তাই নয়, সহমর্মী
আমাদের বন্ধুদের অনেকেরই চিঠিতে এ আবেদন,
আমরা যেন দেশে ফিরে যাই । সেক্সটস পম্পিঅস
সীজারকে অমান্য করেছে, সামুদ্রিক সাম্রাজ্য নিজ
আয়ত্তে এনেছে । আমাদের দেশবাসী অস্থিরমতি
সমাদর অবান্তর না হওয়া অবধি যোগ্যকে কখনো
তারা মান্য করে না, আজ তারা বর্ষণ করছে
মহামতি পম্পি'র সুনাম, তাঁর যা কিছু সম্মান
তাঁর সন্তানের পরে, ফলে নিজস্ব শৌর্যের বীর্যের
অনেক উঁচুতে ক্ষমতা ও খ্যাতির শীর্ষে সে
হতে চায় সেনানী প্রধান । তার মতিগতি এমনি চললে
জগতের সব দিকে বিপদ ঘনাবে । জন্মাচ্ছে অনেক কিছুই,
সর্পিল ক্রিমিকীটও জন্ম নিচ্ছে, তাই বলে হয় না তা
বিষধর সাপ । এ সিদ্ধান্ত আমাদের অধীনস্থ যারা—
যাদের দরকার হবে, তাদের জানিয়ে দাও
যাতে শীঘ্র এই স্থান ছেড়ে যেতে পারি ।

এনো । দিচ্ছি জানিয়ে *[প্রস্থান]*

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান পূর্ববৎ

[ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ন, আলেক্সাস ও ইরাস'এর প্রবেশ]

ক্লিও । তিনি কই ?

চার । সেই থেকে আরতো দেখিনি তাঁকে ।

ক্লিও । দেখ, দেখ, কোথা তিনি, কার সঙ্গে, কী করছেন
আমি কিন্তু পাঠাচ্ছি না তোকে । তাঁর মুখভার দেখলে
বলিস আনন্দে নাচছি ; হাসিখুশি দেখলে বলিস
হঠাৎ অসুস্থ আমি । শীঘ্র যা, ফিরবি এখনি ।

[আলেক্সাস-এর প্রস্থান]

চার । সত্যিই তাঁকে যদি ভালোবেসে থাকেন তবে
তাঁর ভালোবাসা আদায় করার জন্যে
আপনার এ উপায় ঠিক নয় ।

ক্লিও । যা উচিত তা করছি না কি ?

চার । যা চান তিনি করতে দিন, কিছুতে বাদ সাধবেন না ।
ক্লিও । শেখাচ্ছিস বোকার মতো : তাতে তাঁকে হারাতে হবে ।
চার । অত বেশি ঘাঁটাবেন না ওঁকে । বলছি, ক্ষান্ত হন
যাকে যত ভয় পাই সেই শেষে-বিষে ভরে মন ।

[অ্যান্টনির প্রবেশ]

এই তো অ্যান্টনি নিজেই ।
ক্লিও । আমি যেন অসুস্থ ক্লান্ত ।
অ্যান্ট । দুঃখিত আমি আমাকে বলতে হচ্ছে আসার কারণ—
ক্লিও । চারমিয়ন আমাকে ধর, নিয়ে চল, পড়ে যাব আমি
এ যন্ত্রণা বেশীক্ষণ নয়, এ দেহের কাঠামো তা
সইতে পারবে না ।
অ্যান্ট । আমার হৃদয়রানী, শোন—
ক্লিও । যাও, সরে যাও কাছ থেকে ।
অ্যান্ট । আহা, কি হয়েছে বল ?
ক্লিও । ওই চাউনিতে বুঝছি কোনো সুখবর আছে ।
ধর্মপত্নী কী বলে পাঠাল ? বেশ তো যাওনা ।
বাঁচি যদি তোমাকে আর সে না আসতে দেয় ।
যেন সে না বলে তোমাকে আমিই রেখেছি ধরে ।
আমার কোনই জোর নেই কো তোমাতে । তুমি তারই ।
অ্যান্ট । ঈশ্বর জানেন—
ক্লিও । এর আগে কোনো রাজরানী
এত বেশি ঠকেনি কখনো । অথচ প্রথম থেকে
জানতাম উপ্ত আছে বেইমানির বীজ ।
অ্যান্ট । ক্লিওপেট্রা—
ক্লিও । আমারই হবে তুমি, হবে সত্যবাদী , কেনই বা ভাবব বলো,
(যদিও শপথ করে দেবতার আসনও টলাও)
যখন ফুলভিয়ার কাছে তুমি মিথ্যাচারী ? যে শপথ
করাতেই ভাঙা, গালভরা সে-শপথে
ভরসা রাখা নিছক পাগলামি ।
অ্যান্ট । সুধাময়ী মক্ষীরাণী ।
ক্লিও । না, না, শোন, খুঁজো না যাবার কোনো ছল,
শুধু যাই বলে চলে যাও ; যখন থাকতে চেয়েছিলে
তখনই সময় ছিল কথা বলবার : তখন তো যাওয়া নয় ;
তখন অনন্তকাল আমাদের অধরে নয়নে,
ভ্রূভঙ্গে নন্দনসুখ ; স্বর্গীয় সমতুল নয়
কোনো অঙ্গ ছিল না এমন । আজও তারা তাই আছে,
হয়ত তুমিই, জগতের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা,
হয়ে গেছ সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ।
অ্যান্ট । কি যে, বল ?
ক্লিও । যদি পেতাম তোমার মতো দেহের গঠন তাহলে জানতে
মিশরিনী তেজস্বিনীও ।
অ্যান্ট । রানী, কী বলছি শোন ;
সময়ের জরুরি তাগিদ বাধ্য করছে আমাদের
স্বল্পকাল ব্যাপৃত থাকতে ; কিন্তু তোমারই কাছে
রইল সম্পূর্ণ এই হৃদয় গচ্ছিত । স্বদেশ ইতালি
গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহে বিক্ষত ; সেক্সটস পম্পিঅস
রোমের বন্দর দিকে আসছে এগিয়ে
দেশের ভিতরে দুই শক্তি সমান প্রবল, দেখা দিচ্ছে
বাছবিচার, দলাদলি । লাঞ্ছিত, ক্ষমতাপুষ্ট হয়ে,
প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছে । ধিকৃত পম্পি আজ
বিভূষিত পিতার গৌরবে, তাদেরই হৃদয় জয়
করেছে সে ধীরে ধীরে, বর্তমান অবস্থায় যারা

স্বার্থসিদ্ধি করতে পারেনি ; তারা সংখ্যায় বিপজ্জনক,
এবং বিশ্রামে ক্ষুব্ধ, শান্তি নিরুদ্বেগ চাইছে মরিয়া হয়ে
ভিন্নাবস্থা কোনো । এ ছাড়া আমারও এক কারণ রয়েছে,
যার জন্যে আমার যাওয়াতে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবে,
ফুলভিয়ার মৃত্যু হয়েছে ।
ক্লিও । যদিও মূঢ়তা থেকে বয়সেও মুক্তি পাইনি,
তবু বয়সে শৈশব ঘোচে, ফুলভিয়া কি মরতে পারে ?
অ্যান্ট । হ্যাঁ রানী, সে মারা গেছে ।
চিঠিটা রইল, রাজকীয় অবসরে পড়ে দেখো
কি গোলমাল পাকিয়ে গিয়েছে : সবশেষে, সেরা অংশ,
দেখো কবে কোথায় মরেছে ।
ক্লিও । ওঃ কি দারুণ প্রেমের ছলনা ।
সে-পবিত্র পাত্র কই যাতে তুমি রাখবে ভরে
তোমার শোকের অশ্রু ? ফুলভিয়ার মৃত্যুতে
আমিও বুঝছি এবারে, আমি মরলে কি ভাবে তা নেবে ।
অ্যান্ট । কলহ বিবাদ আর নয়, যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা
শোন মন দিয়ে ; তা মঞ্জুর করবে কি করবে না ।
যেমন বলবে তুমি । যে আগুনে উর্বর হয়
নাইলের পলি, তারই নামে বলি তোমার ইচ্ছায়
যাচ্ছি আমি তোমারই সৈনিক তোমারই কিঙ্কর হয়ে
যুদ্ধ কিংবা শান্তির প্রয়াসে ।
ক্লিও । চারমিয়ন, কেটে দেবে ফিতেটাকে,
আচ্ছা থাক—এই মরি এই আমি বাঁচি—
অ্যান্টনির ভালোবাসা যেন ।
অ্যান্ট । প্রাণাধিক রাজেশ্বরী, ক্ষান্ত হও,
সুবিচারে বিচার্য তার প্রেমে
সত্য সাক্ষ্য দিও ।

ধারাবাহিক

কর্ণাটক

দেবদাসীপ্রথার বিরুদ্ধে

কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র এই দুই রাজ্যের সরকারই কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হীন দেবদাসী ব্যবস্থার সমালোচনা করে আসছেন বহুদিন ধরে এবং এই সামাজিকভাবে অপমানকর এই ব্যবস্থা নির্মূল করতে এই দুই সরকার বদ্ধপরিকর। দুই রাজ্যের কিছু সমাজসেবীর যৌথ প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বেলগাঁও জেলার সোনাদাত্তি তালুক শহরের ছ'কিলোমিটার দূরে ইয়েল্লাম্মা মন্দিরে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র থেকে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। দেবদাসী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই মন্দির। দেবতা ও ধর্মের নামে মানুষের প্রতি অবজ্ঞার এই চরম লজ্জাজনক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা এক মিছিল বের করেন।

সেই মিছিল থেকে লিফলেট বিলি করা হয়—দেবদাসী ব্যবস্থার সঙ্গে দেবতা বা ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, এ কেবল ধর্মের নামে সামাজিক শোষণের একটা মাধ্যমমাত্র এই কথাই ব্যাখ্যা করা ছিল ঐ লিফলেটে। ইয়েল্লাম্মার মন্দিরের সঙ্গে জামদগ্নির স্ত্রী রেণুকার যোগাযোগ—পিতার আদেশে পরশুরাম যাঁকে হত্যা করেন। এই পৌরাণিক ঐতিহ্যের নামেই বহু বহু বছর ধরেই এই দেবদাসী ব্যবস্থা চলে আসছে—আমাদের নজরে পড়েছে মাত্র এই বছর কয়েক আগে। সোনাদাত্তি নাম এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে বহু পর্যটক সেখানে যান দেবদাসী দেখতে—তাঁদের ধারণা যেকোনো উৎসবেই ওখানে কুমারী মেয়েদের দেবতার কাছে অর্পণ করা হয়। কিন্তু

ঘটনা অন্যরকম।

অধিকাংশ মেয়েকেই বম্বে চালান করে দেওয়া হয় দেবতার কাছে অর্পণের পর এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে যাঁরা এই ব্যবসা চালান, তাঁরা তপশীলি জাতি থেকে মেয়ে এনে গোপনে এই ধর্মের আবরণ দিয়ে নির্দোষ গরীব মেয়েদের বড় মহানগরীতে পাচার করে থাকেন। যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তার নাম 'জনজাগরণ'। গত কয়েক মাসে নানা ঘটনায় এ বিক্ষোভ দানা বাঁধে। মাত্র দুমাস আগে মানুষজন পুলিশের সাহায্যে, বিজাপুর জেলার মহালিঙ্গপুরে, ৫৭ জন হরিজন দেবদাসীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বম্বের একজন সাংবাদিকের রিট আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রকে কারণ দেখাতে বলেছেন। বম্বের ঐ সাংবাদিকের অভিযোগ অনাথা মেয়েদের ধর্মের নামে বম্বেতে বেশ্যাবৃত্তি করতে পাঠাবার চক্র বিশেষ। সোনাদাত্তিতে, অনেক সমাজকল্যাণ সংস্থা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার পাশে গাবিংলাজের কলেজ শিক্ষক ভিথন বান্নি; পুনের মহাত্মা ফুলে সামন্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও মারাঠি লেখক বাবা আধব, স্ত্রী অন্যায় নিবারণ সমিতির সদস্যরা। স্থানীয়-

স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা, নারীই যদি দেবীর কামনা হয়, তাহলে উচ্চবর্ণের মেয়েদের আনা হয় না কেন? ইয়েল্লাম্মার ওপর কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার হয়েছিল।

সেখানে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের চেষ্টা করেন পণ্ডিতরা। আম্বেদকর যুবক মণ্ডলের ভূমিকাও কম নয়।

মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের সীমান্তে দুই রাজ্যের ১০০ জন সমাজকর্মী তিনদিনের এক ক্যাম্পে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারে ভাবনা আদানপ্রদান করেন। এই ক্যাম্পের সাফল্যেই মন্দিরের বাইরে ও ভিতরে দেবদাসী প্রথা নির্মূল করার ব্যাপারে তাঁদের আন্দোলন আরও তীব্র হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য পদযাত্রাও করছেন আন্দোলনকারীরা। এই প্রথা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ—এই রকম একটি সাইনবোর্ডও মন্দিরের গায়ে প্রকাশ্য জায়গায় লটকে দেবার প্রস্তাব এসেছে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরা যাতে বিধিসম্মত ব্যবস্থা নেন, সে বিষয়ে তাঁদের কাছে আগেও বহুবার আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল।

গোরাবাঈ-এর বয়স ৬০। তিনি দেবদাসী, গাধিংলাজের লোক। তিনিই এখন দেবদাসী-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা। সম্প্রতি ইয়েল্লাম্মার চত্বরে মেলায় বহু তরুণী দেবদাসীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সামাজিক শোষনের শিকার হতে হয়। এখন আমাদের উত্তরাধিকারকে এই পাঁকে আর জড়াতে দেব না। সমাজসেবীরা এখন দেবদাসীদের জন্য অবসরভাতা, প্রশিক্ষণ, আবাসনা ইত্যাদি দাবি করছেন। পুলিশ কিন্তু এই দেবদাসী প্রথার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। স্থানীয়দের মতে, আন্দোলনের ফলে দালালরা গোপনে এই কাজ করছে। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফেব্রুয়ারি মাসে বেলগাঁও জেলার সোনাদাত্তি তালুক শহরের ছ'কিলোমিটার দূরে ইয়েল্লাম্মা মন্দিরে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র থেকে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিল এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। দেবদাসী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হল এই মন্দির।

মণিপুর

চরমপন্থীরা আবার সক্রিয়

কিছু চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণের ওপর ভিত্তি করে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রেইসাং কেইসিং "মণিপুর চরমপন্থীদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে" বলে যে আশাবাদী মত প্রকাশ করেছিলেন, সম্প্রতি ইম্ফলে চরমপন্থীদল এবং সি· আর· পি·-র মধ্যে গুলি বিনিময়ের ফলে অসহায় কিছু শহরবাসীর মৃত্যুর দৃষ্টান্ত মুখ্যমন্ত্রীর আশাবাদী উক্তিকে ভুল প্রমাণিত করল। গত ১৪ মার্চ ইম্ফলে সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং মণিপুর রাইফেলস্-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি ভলিবল খেলার শেষে খেলার মাঠের অল্প দূরে সি· আর· পি· এবং চরমপন্থীদের মধ্যে এই গুলি বিনিময় শুরু হয়। যাঁরা গিয়েছিলেন খেলার আনন্দ উপভোগ করতে, তাঁদেরই মধ্যে কয়েকজন এই গুলিবর্ষণের শিকার হন। খেলা দেখে ফিরে আসার সময় তিনটি নিষ্পাপ শিশুও গুলিবর্ষণের অভিশাপ থেকে রেহাই পায় নি। এছাড়া একজন সি· আর· পি· জোয়ান সহ মোট ১৩ জন নিহত হন। আহতদের সংখ্যা ৩২। এই ঘটনার পেছনে যে বে-আইনী ঘোষিত 'পি· এল· এ·'-র হাত রয়েছে তা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যখন উক্ত ঘটনার দিনে সি· আর· পি· জোয়ানদের সাথে গুলি বিনিময়ের ফলে কুখ্যাত চরমপন্থী বীরজিৎ সিং-এর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ কিছুদিন পর ল্যাংগল পর্বতে পাওয়া গেল।

অল্প কিছুদিন রাজ্যে শান্তি বজায় থাকার পর হঠাৎ আবার চরমপন্থীদের হামলার ঘটনাগুলি রাজ্য সরকারকে বর্তমানে বেশ চিন্তার মধ্যেরেখেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি রাজ্যে চরমপন্থীদের পুনরাবির্ভাবের প্রধান কারণ হলো, 'পিপলস্ লিবারেশন্ আর্মি' (পি· এল· এ)-র কিছু সদস্য উত্তর বর্মায় তাদের গুপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির থেকে প্রশিক্ষণকার্য সমাপ্ত করে মণিপুরে ফিরে এসেছে। মার্চ মাসের প্রথমদিকে প্রায় ৪৫ জন প্রশিক্ষিতচরমপন্থী বর্মা থেকে মণিপুরে প্রবেশ করেছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

গত ৩০ জানুয়ারিতে মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইআংগমাসো সেইজা-র গুপ্ত হত্যার ফলে রাজ্যে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হয়েছিল, বিশেষ করে মণিপুরের গহন জঙ্গলে সেনাবাহিনীর অভিযানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্মার সীমান্ত সংলগ্ন মণিপুরের উকহরুল জেলাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চরমপন্থীদের অবৈধ প্রবেশ ও প্রশিক্ষণ প্রার্থী চরমপন্থীদের বর্মা যাওয়ার সুযোগ বন্ধ করতে রাত্রিতে কার্ফু জারী করা হয়। প্রকৃতিদেবীর বনরাজির সুবিন্যস্ত উদারতার ফলে উকহরুল অঞ্চলকে চরমপন্থীরা আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপার থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানী করা এবং নিজেদের গোপনে আসা-যাওয়ার প্রাণকেন্দ্র মনে করে। মুখ্যমন্ত্রীর সূত্রে প্রকাশ, বর্মার অরণ্য অঞ্চলের 'বেস্' থেকে লাসায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪০০ জন চরমপন্থী সম্প্রতি রাজ্যে প্রবেশ করেছে। চরমপন্থীদের এই দলটিকে বর্মা থেকে থাম্বাসিং নামে এক বৈরী নেতৃত্ব দিচ্ছে। একই সূত্রে আরো জানা গেল, চীনে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই 'পি· এল· এ'-র ২০ জন নারী চরমপন্থী সহ মোট ৪৬ জন বর্মার পথে যাত্রা করেছে। মণিপুরে চরমপন্থীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপের নেপথ্যে কিছু তথ্যের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মণিপুরে চরমপন্থীদের দেশদ্রোহী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের সূচনা হয় ১৯৬০ সাল থেকে। এ সময় 'রেভলিউশন্যারি গভর্ণমেন্ট অব মণিপুর' (আর· জি· এম) নামে চরমপন্থীদলটিই ছিল প্রধান। ক্রমে 'আর· জি· এম'-র ভাঙন হয় এবং জন্ম নেয় 'পিপলস্ লিবারেশন আর্মি' (পি·. এল· এ)। 'পি· এল· এ'-ই আস্তে আস্তে প্রধান চরমপন্থীদল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। ১৯৭৯ সালে 'আর·জি· এম'-এর নেতা সুধীর কুমারকে দলের সতীর্থরা ইম্ফলে হত্যা করে। 'পি· এল· এ'-র নেতা হিসেবে বিশ্বেশ্বর সিংকে মনোনীত করা হয়। ১৯৭০ সালে 'পি· এল· এ' তাদের কিছু বিশ্বস্ত সদস্যকে গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্যে চীনের লাসা অঞ্চলে প্রেরণ করে। লাসা থেকে ফিরে আসা দলটির মধ্যে কুখ্যাত চরমপন্থী বিশ্বেশ্বর সিং-এর নাম পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্রে দেখা যায়। ১৯৭৮ সালের পর থেকেই চরমপন্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠে। সংগঠিত করে একের পর এক রোমাঞ্চকর অভিযান। মণিপুর বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার রাজকুমার সিংহ এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহম্মদ আলিমউদ্দিন বৈরীদের গুলিতে আহত হন। ৮০ সালের মার্চ মাসে ইম্ফলের জেলা হাসপাতালের চত্বরে বৈরীরা দু'জন 'সি· আর· পি·-এফ'-এর জোয়ানকে হত্যা করে এবং তাদের অস্ত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৮০ সালের ৯ জুন তারিখে ইম্ফলের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৯ জন দুর্ধর্ষ চরমপন্থীর পলায়ন। ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ইম্ফলের সৈনিক স্কুল আক্রমণ করে চরমপন্থীরা ৫০০টি বন্দুক নিয়ে পালায়।

ঐ সময় রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থীদের শিকার হন তাঁরা হলেন, মণিপুর সরকারের কৃষি উপদেষ্টা এস· ভৌমিক এবং মণিপুর সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিব বাবুধন সিং। এসব ঘটনাবলীর পর রাজ্যের সাধারণ শান্তি বিঘ্নিত হয়। ভীত জনসাধারণ রাত্রিতে বেরুনো বন্ধ করে এবং বিকেল তিনটে বাজতেই রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে যায়। ১৯৮০ সালে

রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক কার্যপ্রণালী রোধে রাজ্যের রাজনীতিবিদরা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। তাঁদের মতে, কেন্দ্র যদি সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত না করেন তবে চরমপন্থীদের কার্যকলাপ স্থগিত বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে না।

সমগ্র মণিপুর রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর ওপর পড়ে। শুরু হয় মেইথী চরমপন্থীদের সাথে সেনাবাহিনীর বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ক্রমে সেনাবাহিনীর তৎপরতায় চরমপন্থীরা শিবিরে কোণঠাসা হতে থাকে। ১৯৮১ সালের প্রথম পর্বে 'পি· এল· এ'-র সাত জন প্রধান সারির সদস্যকে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা হত্যা করে। টেকচাম অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও চরমপন্থীদের মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলে 'পি· এল· এ'-র কুলগুরু বিশ্বেশ্বর সিংকে গ্রেপ্তার করে জোয়ানরা। তবে, 'পি· এল· এ'-র আংশিক ভাঙন হলেও বৈরীরা বসে থাকে নি। কুনুয়াবিহারীর নেতৃত্বে চরমপন্থীরা আবার হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ করে। সেনাবাহিনী ইম্ফলের দূরবর্তী কদমকপি অঞ্চলে 'পি· এল· এ'-র গুপ্ত আস্তানা আক্রমণ করে কুঞ্জবিহারী সিং ও সবচাইতে বিতর্কিত ও ভয়ানক চরমপন্থী-নেতা বিশ্বেশ্বর সিং সহ ১২ জন কুখ্যাত চরমপন্থীদের পর্যুদস্ত করে। কিন্তু রাবণের কাটা মাথা গজানোর মতোই 'পি-এল-এ'-কে পর্যুদস্ত করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

লাসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থেম্বাসিং 'পি· এল· এ'-র নতুন নেতা হিসেবে মনোনীত হন। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, বর্তমানে থেম্বাসিং নাগাল্যাণ্ডের 'এস· এস· সি· এন'-র সাথে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

থেম্বাসিং প্রায় ৯৭ জন চরমপন্থীর একটি দলকে উত্তর বর্মার সরমা অঞ্চলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, যে সমস্ত নাগা এবং মেইথী চরমপন্থীরা চীন সীমান্ত সংলগ্ন গহন অরণ্য অঞ্চলে রয়েছে, চীন তাদেরও সাহায্য করে।

এদিকে আরেকটি বিশেষ সূত্রে জানা গেল, যে সমস্ত চরমপন্থীরা পর্বত ও উপত্যকা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা একত্রে মিলিত হয়ে একটি বৃহৎ দল গঠন করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। চরমপন্থীরা হত্যার যে তালিকা তৈরি করেছে এর মধ্যে নাকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জে· বি· জ্যাসোকি এবং ভিজল-এর নামও রয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের খবরে প্রকাশ, রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক কার্যপ্রণালী রোধে রাজ্যের রাজনীতিবিদ্‌রা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। তাঁদের মতে, কেন্দ্র যদি সমগ্র উত্তর-পূর্ব-অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত না করেন তবে চরমপন্থীদের কার্যকলাপ স্থগিত বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে না। রাজ্যে বড় ধরনের কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই। মণিপুরের মোট জনসংখ্যা ১৫ লক্ষের মধ্যে এক লক্ষই বেকার।

এই বেকার যুবকদের একাংশের নৈরাশ্যজনক মনোভাবের সুযোগকে যে চরমপন্থীরা সম্পূর্ণ কাজে লাগাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। □

সুনন্দন চৌধুরী

বম্বের দাঙ্গা

কুঠার উদ্যত ছিল। যে পাঞ্জায় ধরা গুপ্তি আর ছোরা কলকাতার গার্ডেনরীচে নৃশংস হত্যায় পুলিশ ডি· সি· আর সাধারণ মানুষের ধড়-মুণ্ডু আলাদা করে উঠে গিয়েছিল গতির নিয়মে বাতাসে, উল্টো পথে, ভারতবর্ষের সূর্যাস্তের উপকূলে, তা নেমে এলো পুলিশ অফিসার আর সাধারণ মানুষেরই ওপর, নিরুপায়।

২৪ মে প্রেসে যাবার সময় পর্যন্ত বম্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ১৯২—এর ভেতর ৫৫ জনই মারা গেছেন বম্বে শহরে। ভিওয়ান্দি ও কল্যাণ থেকে ২৪টি গলিত মৃতদেহ পাওয়া গেছে ২৩ তারিখ।

গার্ডেনরীচের প্রতিতুলনা মনে আসেই। বম্বে থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে ভিওয়ান্দিতে শুক্রবার, ১৮ মে (গার্ডেনরীচের দাঙ্গার তারিখও ছিল ১৮!), যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শুরু তাতে মারা গিয়েছেন একজন পুলিশ সাব-ইনসপেকটর ২৭ জন নিরপরাধ মানুষকে পাশবিক অত্যাচারে হত্যা করে একটি ফার্ম-হাউসে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ১৯৭০ সালেও এই ভিওয়ান্দিতে হাঙ্গামা হয়। কিন্তু এবারকার গোলমালের প্রধান ক্ষেত্র নতুন গজিয়ে ওঠা ফাক্টরি ও বস্তি এলাকা।

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা ভিওয়ান্দিতে যাবার পর দেখেছেন, হাতে সড়কি, বল্লম, দা নিয়ে উন্মত্ত যুবকেরা ভিওয়ান্দির কানাগলি, চোরাগলিতে হত্যার তাণ্ডব চালাচ্ছে। ভিওয়ান্দির চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্টের খামারে ২৭ জনকে পুড়িয়ে মারা হলো সেখানে সেনাবাহিনী তলব করবার ১২ ঘণ্টা পর।

২৮ বছরের পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর নন্দকুমার গোখলেকে কামাক্ষিপুরা বাই লেনে কুপিয়ে হত্যা করা হলো। সেই পথে এক বিন্দু রক্তের দাগও ছিল না। গোখলের লাশ টিন দিয়ে ঢাকা দেখা যায় ভোর তিনটের সময়। কামাক্ষিপুরাতে গোলমাল হচ্ছে শুনে গোখলে বন্দুকে ছাড়তে গিয়েছিলেন, নিরস্ত্র। ফিফ্‌থ লেনে তাঁর মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখার পর গোলমালের দরুণ তাঁকে থার্ড লেনে চলে যেতে হয়, রাত ১০·৩০ নাগাদ। পুলিশের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মেহতার মতোই? সেই একাকীত্বের সুযোগে আততায়ীরা তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে—শরীরে ২৩টি খতচিহ্ন ছিল।

ডোংরিতে হেড কনস্টবল গুলাবরাও কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হন—দাঙ্গাবাজদের গুলি তাঁর কাঁধ দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে যায়, আর একটি গুলি কোমরে গিয়ে উরু দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলাবরাও সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

মে মাসের প্রথম দিকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বসন্তদাদা পাটিল বলেছিলেন, তাঁর সরকার সব অর্থেই পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সেই স্বীকারোক্তি যে কতো সত্যি, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তা প্রমাণ করল। কোনো অবস্থাতেই এই দাঙ্গা আকস্মিক নয়। গত প্রায় এক মাস ধরে পরিকল্পিতভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা হচ্ছিল। পাটিল সরকার তা জানতেন। যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল বুঝবার মতো।

এপ্রিলের ২১ তারিখে বম্বের সম্ভ্রান্ত মেরিন ড্রাইভের চূড়ান্ত নোংরা

> এক উদাসীন পঙ্গু প্রশাসনের সামনে বাল থ্যাকারের মতো একটি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি একমাস ধরে চেষ্টা করে একটি দাঙ্গা লাগিয়ে দিলো—অথচ থ্যাকারেকে স্পর্শ করবার হিম্মত কারও হলো না।

বেলাভূমি চৌপাটিতে শিব সেনা প্রধান বাল থ্যাকারে হিন্দু একতা সংঘ নামে একটি নতুন সংস্থা আয়োজিত সভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে অসম্মানজনক মন্তব্য করেন। পুণার একটি মারাঠি সাপ্তাহিক, সোবাত-এ, এই বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনটি উর্দু পত্রিকাও বাল থ্যাকারের বক্তৃতার অংশ ছাপে। আগবর-ই-আলসো নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক খালিদ জাইদ ১৪ই মে থ্যাকারের বক্তৃতাটি ছাপেন। পরে জাইদ বাল থ্যাকারের রেকর্ড করা বক্তৃতাও শোনেন। অত্যন্ত নোংরা ও অসম্মানজনক উক্তিতে পূর্ণ বক্তৃতা। জাইদ প্রকাশ করবার আগেই অন্য উর্দু পত্রিকায় প্রকাশিত বাল থ্যাকারের বয়ান পড়ে মারাথাওয়াদার প্রান্ত জেলা পরভানিতে একজন মুসলিম কং (ই) সদস্য প্রতিবাদে শোভাযাত্রা করেন। বাল থ্যাকারের ছবিতে জুতোর মালা দেওয়া হয়। ১৬ মে থেকে শিব সেনা পাল্টা প্রতিবাদে বন্ধ ডাকে।
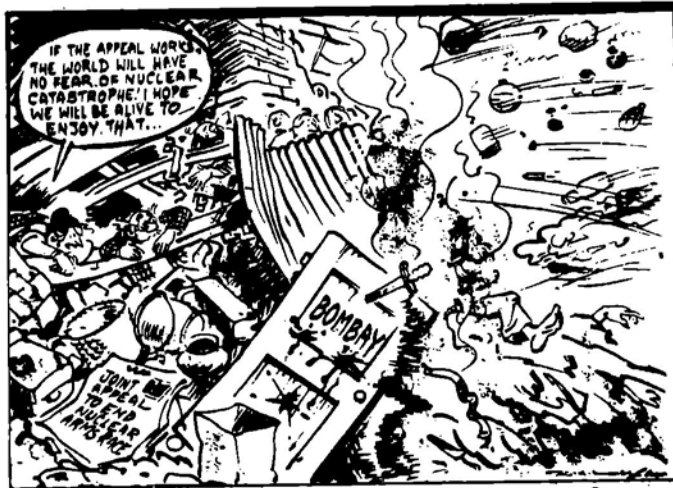
আর. কে. লক্ষ্মণ-এর আঁকা কার্টুন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত

সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের নামে অকথ্য গালি-গালাজ দেওয়া পোস্টার সাঁটা হলো। আশঙ্কায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ও নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে।

গত এপ্রিল ২১ থেকে যেভাবে লোকজনকে উত্তেজিত করা হচ্ছে, ১৮ই মে দাঙ্গা লাগার আগে শিব সেনার বন্ধ ডাকার জন্য ও উর্দু পত্রিকায় থ্যাকারের প্রবন্ধ প্রকাশের পর স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িক যে উত্তেজনা ছিল, পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরও তা জানত। কেবল এক উদাসীন জাড্যে অচল প্রশাসন একমাস ধরে কোনো ব্যবস্থা নিল না। ফলে ভিওয়ান্দিতে শিব সেনার অফিসের সামনে সবুজ পতাকা তুলতে গেলেই দাঙ্গা শুরু হয়।

দাঙ্গা লাগবার পরও পাটিল প্রশাসন যেন নিদ্রিত। ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন কাউন্সিলের সদস্য ও অন্যান্য বহু সংস্থা প্রথমেই সৈন্য নামাবার কথা বলে। পাটিল তা দৃঢ় ভাবে খারিজ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সৈন্য নামান। অথচ সেদিন সেনাবাহিনী ফ্ল্যাগ মার্চ করে সেখানে।

বসন্তদাদা পাটিলকে স্পষ্ট প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাল থ্যাকারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা। পাটিল তার কোনো জবাব দেন নি। থ্যাকারের রেকর্ড করা বক্তৃতাও প্রশাসন জোগাড় করতে পারেন নি। এক উদাসীন পঙ্গু প্রশাসনের সামনে বাল থ্যাকারের মতো একটি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি একমাস ধরে চেষ্টা করে একটি দাঙ্গা লাগিয়ে দিলো—অথচ পূর্ব বান্দ্রায়, শিল্পীদের নগরীতে তাঁর বাসায়, থ্যাকারেকে স্পর্শ করবার হিম্মত কারও হলো না।

মাঝখানে রইল ১৯২টি নিরপরাধ মৃতদেহ। □

সুমিত্র দেশপাণ্ডে

পৃথিবীর আয়ু

আশীর দশকে দুনিয়া এমন এক সংকটে পড়েছে এই শতকে তার নজীর নেই। এই সংকট একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। আজকের রাজনৈতিক সংকট ১৯৬২ সালে কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সমধর্মী। আর সমকালীন অর্থনৈতিক সংকট হলো ৫০ বছর আগেকার বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সমতুল। কেবল তফাৎ এই কিউবা সংকট যখন ঘটে তখন দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট ছিল না, কিম্বা এমন ব্যাপক সর্বগ্রাসী আকারে ছিল না। আর তিরিশের দশকের সূচনায় যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় সেটাই কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক সংকটের রূপ নেয়। এবার এই দুটি সংকট দেখা দিয়েছে এক সঙ্গে, পাশাপাশি, কিম্বা বলা যায় একটার অন্য পিঠ হিসাবে অন্যটা।

রাজনৈতিক উত্তেজনা, অস্থিরতা, যুদ্ধের আশংকা, অস্ত্র প্রতিযোগিতার চাপে জাতীয় সরকারগুলি তাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশি বেশি শতাংশ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে জাতীয় বিকাশ, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন থেকে সমাজ কল্যাণ, সব খাতেই ব্যয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এক কথায় রাজনৈতিক সংকট থেকে অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হচ্ছে। আবার অর্থনৈতিক সংকট একটা দিশাহারা ভাব সৃষ্টি করে রাজনৈতিক সংকট বাড়িয়ে তুলছে।

এই বিশ্লেষণ যাঁর, তিনি কোন তৃতীয় দুনিয়ার লোক নন। সমাজতন্ত্রী নন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতি কোন দুর্বলতা, মমত্ববোধ, পক্ষপাত তাঁর নেই। তিনি উন্নত পশ্চিম দুনিয়ার মানুষ, রাষ্ট্রনেতা, অকমিউনিস্ট বলা যায় কমিউনিস্ট বিরোধী। তিনি জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের প্রাক্তন চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতি হেলমুট শ্‌মিড্। গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও বিকাশ সংক্রান্ত এশীয় পার্লামেন্টারিয়ানদের ফোরামের প্রথম সম্মেলনে এটাই ছিল তাঁর 'কী নোট' বক্তৃতা।

বক্তৃতার মুখবন্ধে শ্‌মিড্ বলেন বিদ্বেষ, সন্দেহ, অবিশ্বাস রাষ্ট্রনেতাদের এক চরম যুক্তি বোধহীন, অনমনীয় মনোভাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা সমবেতভাবে করতে না পারলে এই গ্রহটার আয়ু বোধহয় শেষ হয়ে যাবে। মানুষের সভ্যতার স্বার্থে একগুঁয়েমী ছেড়ে পারমাণবিক ধ্বংস এড়াবার জন্য সমবেত উদ্যোগ আজ যতোটা দরকার, কিউবা সংকটের পরে তেমন আর কখনো দরকার হয়নি। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির ভূমিকা এই প্রসঙ্গেই খুব মূল্যবান। বিশ্বশান্তি রক্ষায় তারা অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

তবে শুভবুদ্ধির উদয় হলে পারমাণবিক ধ্বংস যদিও বা রুখে দেওয়া যায়, গভীর অর্থনৈতিক সংকট কিন্তু তাতে কেটে যাবে না। কারণ এর গভীরতা ও ব্যাপ্তি, দুটোই ভিন্ন জাতের। বিগত বিশ বছর ধরে তিলে তিলে এই সংকট গড়ে উঠে এমন এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, তার সমাধান দূরে থাক্, অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যই বিশেষ তৎপরতা দরকার। আর এ ব্যাপারে পশ্চিম দুনিয়ার দায়িত্ব সর্বাধিক।

শ্‌মিডের মতে অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা হয়েছে ভিয়েতনামের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। মার্কিন প্রশাসন ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতির উত্তরাধিকার হাতে নিয়ে যখন হো চি মিনের ভিয়েতনামকে ধ্বংস করতে দক্ষিণ থেকে যুদ্ধ উত্তর ভিয়েতনামে ছড়িয়ে দেয়, তখন ধনকুবের মার্কিন সরকারেরও টাকার টান পড়ে। যুদ্ধ ব্যয় মেটাতে বিপুল ঘাটতি ব্যয় শুরু হয়, যার অনিবার্য ফল হলো মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপ। মার্কিন দেশের এই আর্থিক সংকট দুনিয়ার টাকার বাজারে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ছড়িয়ে দেয়।

১৯৭৩-৭৪ সালে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে রীতিমতো দুর্দিন তখন দ্বিতীয় ধাক্কা এলো, পেট্রলের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি। এর ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৯৭৯-৮০ সালে 'ওপেক' দেশগুলি দ্বিতীয় দফা পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থনীতিকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে বেশির ভাগ দেশ যাদের পেট্রল আমদানি করতে হয় তাদের জাতীয় বাজেটে এক চরম ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির পক্ষে পরিস্থিতি এক কথায় দুঃসহ হয়ে ওঠে। শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলি এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নিতে পেরেছে বিকাশমান দেশগুলির অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাদের সেই সুযোগ দেয়নি। তার কারণটা কি?

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনীতিতে কৃষি প্রাধান্য সুবিদিত। শিল্পপণ্য কোথাও কোথাও উৎপাদিত হলেও তার বেশির ভাগ অংশ রপ্তানি যোগ্য নয়। আর যদিও বা কিছু রপ্তানি করা যায় উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে তার ক্রেতা বিশেষ নেই। অথচ পেট্রলের দরকার উন্নত, অনুন্নত সবারই। আর সেই পেট্রল কেনা যায় ডলার কিম্বা পাউণ্ডে। সুতরাং ডলার আয় করতে হবে, তার জন্য পশ্চিম দুনিয়ায় পণ্য রপ্তানি করতে হবে। পশ্চিম দুনিয়ায় যেসব পণ্যের চাহিদা আছে কেবল সেগুলি রপ্তানি করেই এই বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা যায়। যেমন ধরা যাক চা, কফি ও পাটের চাহিদা পশ্চিম দুনিয়ায় আছে। সেক্ষেত্রে এই সব পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে।

কিন্তু ৭০'র দশকে দুই লাফে পেট্রলের দাম যখন ১০ থেকে ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়, তখন চা বা কফি রপ্তানিকারী কোন দেশকে এই মূল্যবৃদ্ধির আগের পরিমাণ মতো পেট্রল আমদানি করার জন্য চা বা কফি রপ্তানি ১০ থেকে ২০ গুণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয়। চা বা কফির দাম বৃদ্ধি করলে এই রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায় না। আবার চা বা কফি এমন জিনিস নয় যে ভোগ্যপণ্য হিসাবে তার চাহিদা হু হু করে বাড়তে পারে। উপরন্তু আমদানিকারী দেশগুলি সুযোগ বুঝে চা ও কফির দাম কমাবার দিকে চাপ দিতে থাকে। ফলে এই ধরনের পণ্য রপ্তানিকারীরা আগের তুলনায় রপ্তানি বহু গুণ বৃদ্ধি করেও আগের অবস্থায় আর থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একেই বলা হয়েছে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্রমাবনতি।

উন্নত দেশগুলির দিক থেকেও বলা যায় যে, পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি তাদেরও ভিন্ন কারণে সংকট সৃষ্টি করে। যেসব উন্নত দেশ পেট্রল আমদানি করে, মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায়

তাদেরও অন্য পণ্যে ব্যয় সংকোচ করে উদ্বৃত্ত টাকা পেট্রলের জন্য খরচ করতে হয়। ফলে পেট্রল ছাড়া বহু পণ্যে তাদেরও চাহিদায় ঘাটতি পড়ে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য মুদ্রাস্ফীতির ও পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি জনিত সংকট অচিরে সারা পুঁজিবাদী ও বিকাশমান দুনিয়ার সাধারণ সংকটে পরিণত হয়।

'ওপেক' দেশগুলি এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বিপুল পরিমাণে বাড়তি মুনাফা করেছে। সাধারণভাবে তাকেই বলা হয় পেট্রো-ডলার। কিন্তু এই টাকা রাখা হলো কোথায়? পেট্রলের বাড়তি মুনাফার টাকা জমা রাখা হলো নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, জুরিখ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, হংকং ও টোকিয়োর বেসরকারি ব্যাঙ্কে। এই ধরনের জমা টাকা স্বল্প মেয়াদী হয়ে থাকে। বেসরকারি এই সব ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় ঘাটতি দেশগুলিকে এক বিশেষ শর্তে। একালের পরিভাষায় তার নাম 'রোল ওভার ক্রেডিট'। যেহেতু লগ্নী করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদে সুতরাং ক্রেডিট বা ঋণও দেওয়া হয় স্বল্পমেয়াদে। তার সুদের হারও প্রাথমিক পর্যায়ে সেইভাবেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু মজার কথা হলো সেই মেয়াদের কাল শেষ হলেই, পুরানো ক্রেডিট আবার নতুন শর্তে ফিরে পাওয়া যায়। তবে তার প্রধান শর্ত সুদের হার বাড়াতে হবে।

বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির স্বল্প মেয়াদী ক্রেডিট দেওয়ার রীতি হলো তিন মাসের জন্য। ফলে তিন মাস অন্তর ক্রেডিটের নবীকরণ শুরু হয়। এর নীট ফল প্রতি তিন মাসে সুদের হার বৃদ্ধি। এইভাবে কতোদিন চলবে, চালানো যাবে, তার কোন সময়সীমা নেই। আসলে নামে স্বল্প মেয়াদী হলেও ক্রেডিট দীর্ঘ মেয়াদী। বাড়তি সুদের লোভেই সময়টা কমা রাখা, যা কৌশল ছাড়া কিছু নয়। ক্রেডিট অনির্দিষ্ট কাল চলতে পারে, আর সময় বাড়বার সঙ্গে সুদের হার ক্রমাগত বেড়ে চলে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে সুদের হার বাড়তে বাড়তে ক্রমেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন কেবল সুদ দেওয়ার জন্যই নুতুন ক্রেডিট নিতে হয়। ক্রেডিট প্রথম নেওয়ার যে উদ্দেশ্য ছিল ডলার, স্টার্লিং কিম্বা ডয়েটশমার্ক নিয়ে পেট্রলসহ প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করা, তার বদলে পরিস্থিতি দাঁড়ায় নতুন দেনা করে পুরানো দেনার সুদের টাকা শোধ করা। জাতীয় অর্থনীতির এটা হলো এক ভরাডুবি অবস্থা।

তখন দেনাদের দেশ হয় সর্বস্বান্ত, নয়তো নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করার বদলে ঋণশোধ করতে অক্ষমতা জানায় কিম্বা অস্বীকার করে। বেসরকারি যেসব ব্যাঙ্ক এই ক্রেডিট দেওয়াটাই গত এক দশক তার একমাত্র ব্যবসায় পরিণত করেছে, তখন তারও সংকট ঘনিয়ে ওঠে। অবস্থা দাঁড়ায় ব্যাঙ্ক "রান" বা কারবার বন্ধ হওয়ার মতো। তখন এই কারবারের প্রধান পাণ্ডারা আসরে এসে নামেন। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্কের বিপদ কাটিয়ে দেয়। সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন বিগত ছয় মাসে ঠিক এই সংকট দেখা গেছে লাতিন আমেরিকার দুই দেশে। তারা হলো আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। যে সব বেসরকারি মার্কিন ব্যাঙ্ক তাদের সঙ্গে ক্রেডিটের কারবারে নেমেছিল, তাদের উদ্ধার করতে স্বয়ং এগিয়ে এসেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগান।

সুতরাং ক্রেডিট যে দেশ নেয় আর যে দেশের বেসরকারি ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দেয়, আসল সমস্যা এই দুই দেশেরই। কিন্তু ব্যাঙ্কের মালিকদের তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ নিছক এই ক্রেডিট দেওয়ার ব্যবসা চক্রবৃদ্ধি হার সুদে যে টাকা ঘরে আনে তার লোভ সামলানো কোন মুনাফা শিকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে নিউ ইয়র্ক শহরের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্ক ক্রেডিটদানের এক প্রধান ঘাঁটিতে দৈনিক যে পরিমাণ টাকার অঙ্কে ক্রেডিট দেওয়া হয় তার পরিমাণ সেই দিন সারা দুনিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি। কারণ ব্যাঙ্কগুলি বাণিজ্যিক পুঁজির যোগান দিচ্ছে না, তারা কেবল 'টু ফিনান্স ফিনান্সেস', পুঁজির জন্য পুঁজির যোগান দিচ্ছে। ক্রেডিটের লেনদেনটাই ব্যবসা, পণ্যের আন্তর্জাতিক বিকিকিনি নয়।

দশ বছর আগেও এই কারবারের স্বরূপ দূরে থাক্ নামও কেউ জানতো না। এখন তার নাম শুধু নয়, দুনিয়ার টাকার বাজার জুড়ে তার জগদ্দল অস্তিত্ব। কারবারীরা গোড়ায় তার নাম দিয়েছিল ইউরো কারেন্সী। এখন বলা হয় Xeno কারেন্সী। এই জেনো কারেন্সী গোটা অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে পাক দিয়ে বেঁধে রেখেছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার কোথাও সংকট দেখা দিলে তার চাপ এসে লাগছে সমাজতন্ত্রের বাইরে সবদেশে। অথচ এই ব্যবসার উপর বেসরকারি ব্যাঙ্কের মালিক ছাড়া কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। IMF, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন ধনী দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেউ এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধক্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার জন্য ইউ এন'র উদ্যোগে ব্রেটন উড্স্ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ষাটের দশকের শেষ ভাগে মার্কিন রাজনীতি ও সমরনীতির চাপে তাকে চোখের সামনে ভেঙ্গে যেতে দেখেও, উন্নত পশ্চিম দুনিয়া ইচ্ছা করেই কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেনি। আজকের সংকট তৃতীয় দুনিয়াকে দেউলিয়া করলেও তাদেরও রেয়াৎ করছে না।

আন্তর্জাতিক টাকার বাজার, বাণিজ্য সম্পর্ক, লেনদেন সম্পর্ক, ঋণের বোঝা, চক্রবৃদ্ধি সুদের হার, এক কথায় জাতীয় বিকাশের পরিপন্থী সমস্ত শক্তিগুলির এক চরম অশুভ জোট তৃতীয় দুনিয়ার সমানে নজীর বিহীন এক বিপদের সূচনা করেছে। কেন এই সংকট, কোথায় এবং কিসে তার সমাধান, সে প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যায় একমাত্র রাজনীতিগত ভাবে। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে এই সংকটের নাড়ীর যোগ। মার্কিন প্রশাসন পারমাণবিক যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে, অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের উপর চাপিয়ে দিয়ে, সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির তাগিদ সৃষ্টি করে, একটা মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা আমদানি করে জাতীয় বিকাশ নীতি ও জাতীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক গতিময়তা যেভাবে ব্যাহত করেছে, যার জটিল যোগফল হলো আজকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট। তৃতীয় দুনিয়ার দুর্বল অর্থনীতি তার প্রধান শিকার। অসম বাণিজ্য সম্পর্ক, প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তাদের অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা হ্রাস করছে। ফলে কমছে কর্মসংস্থান, বাড়ছে বেকারী। বিগত তিন দশকে এমন সংকট আর দেখা যায় নি। আশংকা হয় এই একটানা সংকট এমন এক মরীয়া মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে, যখন দিশাহারা মানুষ আরো বড়ো কোন বিপদকেও প্রতিকারের পথ মনে করে সে দিকে ঝুঁকতে পারে। □

স্ট্রাইকার

হকি ঘিরেই আশা ভরসা

বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতের খেলার পত্রিকাগুলো সামনের জুলাইয়ে লস অ্যানজেলেস অলিম্পিক ঘিরে নতুন পুরানো নানা অলিম্পিক সমাচারে মশগুল। গত আটই মে রাশিয়া হঠাৎ জানায়, তারা লস অ্যানজেলেসে দল পাঠাবে না নিরাপত্তার কারণে। লেখার সময় পর্যন্ত ন'টি দেশ ওই না-যাওয়ার খাতায় নাম লিখিয়েছে। গত '৮০-র মস্কো অলিম্পিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় জোট যোগদান করেনি। রাজনৈতিক হেঁসেলের ছোঁয়ানাড়ার তাৎপর্যে ভারত জোটহীনতায়ই বিশ্বাসী। তারা যোগ দিয়েছে মস্কোয়, এবারও লস অ্যানজেলেসে যাবেই, এটাই স্বাভাবিক। লস অ্যানজেলেসের উত্তেজনা এখন খেলার পাতা ছাড়াও অন্যত্রও গমগম করছে। বিজ্ঞাপনের মধ্যেই হাতছানি রয়েছে, কোন সংস্থা কত সস্তায় ভারতীয়দের অলিমপিকসের হকচকানি দেখিয়ে আনতে পারে। শুধু দেখার জন্য যাওয়াটা আলাদা কথা। তবে ভারতীয় হয়ে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎসাহ দিতে লস অ্যানজেলেস যাওয়ার উদ্যোগটা তেমন জোরালো হতে পারছে না। একরকম পুরো ব্যাপারটিই ভারতীয়দের ভূমিকার উপর ভর করবে। ধরা যাক মূল প্রতিযোগিতা অ্যাথলেটিকসে আমরা অলিমপিকসে কতটাই বা বড়াই করতে পারব? দিল্লীতে সদ্য সমাপ্ত আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকসের দু-একটি পারঙ্গমতার দৃষ্টান্ত আমাদের আশা ভরসার ফলকগুলিকে চিনিয়ে দেয় ভালভাবেই। ওখানে দারুণ হইচই ফেলেছে উনিশ বছরের মাদ্রাজী ছেলে নালাস্বামী আন্নাভি। হাই-জামপে আন্না চড়চড় করে উপরে উঠছে তো উঠছেই। এই অচেনা মুখটি ২·১২ মিটার লাফায়। এতো অ্যাথলেটিকস পণ্ডিতদের চোখ ওপরে ওঠার দাখিল শোনা যাচ্ছে, লস অ্যানজেলেসের জন্য দেশ ছাড়ার আগে ২·২০ মিটার লাফাবেই। দুঃখিত, আমাদের পাশের দেশের চীনে হাই জাম্পার হুয়ার বিশ্ব-রেকর্ডটি টাঙানো রয়েছে আরও সতের সেনটিমিটারের বেশি উচ্চতায়। আন্নাভি কিন্তু জাত চরিত্রে লাফিয়ে হিসাবে অদ্ভুত জন্মগত প্রতিভা নিয়ে এসেছে। লস অ্যানজেলেসে তেমন কিছু না করুক, অন্তত তোয়াজে রাখলে ভবিষ্যতে ও কিছু দেবেই দেবে। আন্নাভি ছেড়ে আশাটা কেরলের ৪০০ মিটার দৌড়নিয়া পি· টি· উষার উপরেও রাখতে পারছি না। ও চারশ মিটার দৌড় শেষ করে ৫২·৬ সেকেন্ডে। উষার বয়স কুড়ি। ঠিক বিশ বছর আগের অলিম্পিকসে ওই সময়ে ওর ইভেনটে অলিম্পিকস-সোনা জেতা যেত। এখনো উষা বিশ্ব রেকর্ড থেকে সাড়ে চার সেকেণ্ড দূরে, যেখানে দশমিক এক সেকেনড কমাতে দম বেরনোর জোগাড় হয়ে যায়। উষার চেয়ে এম· ভি বালসাম্মার ৪০০ মিটার হার্ডলসের রেকর্ডটি নাকি আশার সম্বল। মন খারাপ করে দেয় বিশ্ব রেকর্ডের খাতাটি। ওই ইভেনটে বিশ্ব রেকর্ড বালসাম্মার চেয়েও চার সেকেণ্ড কম সময়ে ওই হার্ডলস ইভেনট শেষ করতে পারে। অদ্ভুত লাগে, ভারতীয়দের সামনে রেকর্ডগুলো কেমন যেন দৌড়চ্ছে-লাফাচ্ছে কিন্তু বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে তবু ভারতীয় বা ভারতীয়ারা কেউই ঠিক রেকর্ডগুলোকে জাপটে ধরতে পারছে না।

এই অক্ষমতার ব্যাপারটা প্রায় প্রবাদে রূপান্তরিত। এ নিয়ে ভারতীয় হকি অধিনায়ক জাফর ইকবাল অন্য খেলার ফলাফলে স্বভাবতই নিরাশ হয়ে বলেছে—"এক হকি ছাড়া অন্য খেলায় কোনো ভারতীয় যদি পারদর্শিতায় বিশ্বে প্রথম আটজনের একজন হতে পারে তবে আমি তাকে আজীবন ১০০· টাকা বৃত্তি দিয়ে যাব।" এই জাফর ইকবালই আবার হলফ করেছে—"আমার ছেলেকে

হকি খেলতে দেব না।" ভারতে হকি প্লেয়াররা যে সম্মান দেশকে দিয়েছে বা আজও দিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিদানে পাওয়া অবহেলা থেকেই জাফর এভাবে গুমরে উঠেছে। অবশ্য লস অ্যানজেলেস অলিম্পিকে যদি বুকচিতিয়ে ভারতীয় হিসাবে খেলা দেখতে চান তবে ওই জাফরের দলই একমাত্র খড়কুটো। ওদের সদ্য ভূমিকা ভারতের যে কোনো খেলার টিমের চেয়ে সবচেয়ে গর্বের। বলা যায়, ভারতীয় হকি টিম দক্ষতায় এখন এমন বিন্দুতে যে বিশ্বের যে কোনো দলকে হারিয়ে দিতে পারে। বড় কথা, হাতে তাজা দল অনুযায়ী এই উপমহাদেশে সেই এশিয়াডের আধ-ডজন গোলের হেরো ভারতীয় দল এখন আর পাকিস্তানকে ভয় করে না। এশিয়ায় তারা সেরা। সদ্য গালফ সফরে ভারত দু-দুবার পাকিস্তানকে হারিয়েছে আর বাকি তিনটি ম্যাচ ড্র করেছে। ফলহীন ম্যাচেও ভারত দাপটে ছিল ভরপুর। সাময়িকভাবে এতো এশিয়ায় সেরা হওয়ার কেতা বলে যে কেউ একে ছোট করার সুযোগ নিতে পারত। ব্যাপারটা যে হালকা ঔদ্ধত্য নয়, জাফরের টিম এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তা টের পাইয়ে দিয়েছে। পশ্চিম বার্লিনের চার-দলের টুরনামেনটে জায়গা পেয়েছে দু-নম্বরে। হারিয়েছে পশ্চিম জার্মান ও ডাচদের। হারে অস্ট্রেলিয়ার কাছে দস্তুরমত ঠারেঠোরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৫-৩ গোলে। অস্ট্রেলিয়া এই টুরনামেনটের চ্যাম্পিয়ন। এই চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ান দল কিন্তু ডাচদের সঙ্গে ম্যাচ ২-২ গোলে শেষ করে। ভারত অবশ্য ডাচদের ২-১ গোলে হারায়। এমন সব কমসম গোলের ম্যাচ বুঝিয়ে দেয় এখন আর আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপরের ছ'টি দলে কে-কখন কাকে যে টপকাবে তা আঁচ করা মুশকিল। পিঠোপিঠি অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হলে ভারত যে জিতত না এমন কথাও হলফ করা মুশকিল। সাম্প্রতিক খেলার মানে সেই এসানডা টুরনামেন্ট থেকেই ভারতের অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের শুরু। এরই মাঝে অস্ট্রেলিয়া সফরের খেলায়ও ভারত টেস্ট ম্যাচ সিরিজ জিততে জিততে পারেনি। এখন একটাই দেখার, ভারত অস্ট্রেলীয় হকিকে কতটা কব্জা করতে পারে। ঘরানার দিক থেকে এই ক্যাঙারু হকির-ধাঁচটা ভারতের অচেনা নয়। বরং ভারতীয় হকির ভাবধারাতেই ওদের হকি ছকের বুনন। ওদের বড় গুণ ছক নিয়ে ওরা আঁকড়ে থাকে না। প্রতিদ্বন্দ্বী অনুযায়ী দরকারমতো ছক পাল্টায়। ওদের দাপটের মূলধন ওখানেই।

লস অ্যানজেলেসের হকি সোনা পাওয়ার ইজ্জত ভারতীয়দের কাছে অন্য বিশেষত্বে মণ্ডিত। মস্কোয় ভারতের হকি-সোনা খাঁটি সোনা কিনা দ্বিমত থেকেই গেছে। এ প্রশ্নটা ধাতব গুরুত্বের নয়, বিতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘিরেই। মস্কোর বয়কট পার্টিতে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নেদারল্যানডস ও পশ্চিম জার্মানীও ছিল। ভারতের সোনা পাওয়ায় এদের অনুপস্থিতিই বিতর্কে ঠেলে দেয়। মস্করা করে অনেকেই বলে, এ সোনার মেডেলে খাদ ছিল। এবার ওরা লস অ্যানজেলেসে যাবেই। ভারত তার মস্কোর সোনা হাতে রাখতে পারবে কি না, সেটাই কৌতূহলের মূল খোরাক।

ভারত ঘিরে এরকম অলিমপিক হকির উত্তেজনা কুড়ি বছর আগেই শেষ হয়ে যায়, চৌষট্টির টোকিও অলিম্পিকসে ভারত শেষবারের মত অলিম্পিকস-হকির খাঁটি সোনার মেডেলটি পায়। মস্কোর মতো সেবার কোনো অনুযোগ ছিল না। এর চার বছর আগেই ভারত তার হকি-সোনাটি হারায় রোম অলিম্পিকসে। এ পর্যন্ত ভারতীয় হকি টিম আটটি অলিম্পিকে হকি সোনা পেয়েছে। মেক্সিকো (৬৮) ও মুনিখে (৭২) ভারত পায় ব্রোনজ। বিপর্যয় ঘটে মন্ট্রিলে, সপ্তম হয় ভারত। মাঝে কুয়ালালামপুরের ওয়ার্ল্ডকাপে (৭৫) ভারতীয় হকি টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আত্মতুষ্টিতে ভুগতে থাকে। এরই অব্যর্থ ফলপরিণতি ওই মন্ট্রিল।

স্বাধীনতার আগে যে হকি ভারতকে এত মর্যাদা দিল, ঠিক স্বাধীনতার পর থেকেই তার এত অবনতি কেন? এর ব্যাখ্যা বহুবিধ। স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানও যে আগ্রহ নিয়ে হকি খেলাকে দেখেছে, ভারতে কোনো কিছুই চোখে পড়েনি। অনেকের মতে পাকিস্তানের হকি মর্যাদায় থাকার ব্যাপারটা অনেকটাই ধর্মের অনুশাসনে থাকার মত। হকি খেলোয়াড়কেই জাতীয় পর্যায়ে মর্যাদা দেওয়া হয়নি কোনো কালেই, সে ভারত পরাধীন থাকার সময়েও। ধ্যানচাঁদ সামরিক বাহিনীতে সামান্য চাকরি করতেন ১৯৩৬ বার্লিন অলিম্পিকসের সময়। গত এশিয়াডের পর ভারতীয় দলের দৈনিক খাওয়া খরচ ৩৫ টাকা থেকে কমিয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে। ওরা যদি এশিয়াডে সোনা জিতত তাহলে হয়তো দু-পাঁচ টাকা বাড়ার সম্ভাবনা ছিল। পাকিস্তানেও হারলেও প্রতিক্রিয়া কিস্তুতকিমাকার পর্যায়ে পৌঁছয় ঠিকই, কিন্তু সরকারের তরফে হকি প্লেয়ারকে উৎসাহ দিতে চাকুরির হিসাবে মজুরীর মাত্রা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। এদেশের সাংবাদিকরা অ্যাসট্রো টারফ আনা হোক বলে বহুবার চিৎকার করেও ফল হয়নি। এশিয়ান গেমসের দিল্লী-ভেলকির অনুষ্ঠান ভারতে না বসলে আদৌ আসত কিনা সন্দেহ। পাকিস্তান কিন্তু এ পর্যন্ত এশিয়াড না করেও অনেক আগেই হকি প্লেয়ারদের আধুনিক করতে অ্যাসট্রো টারফ বিছিয়ে দিয়েছে।

অ্যাসট্রো টারফ দিল্লী ও পাতিয়ালার মাঠে বিছানোর দেড় বছর পর ভারতীয় টিম ধাতস্থ হয়েছে। আগে যেখানে অনভ্যস্ত অবস্থায় ভারতীয় টিম গণ্ডা খানেক গোলের তফাতে হারছিল, এখন সেটা ভাবাই যায় না। কোচ বালকিষেণ পুরানো ছক পালটে নতুন ছক ধরেছেন। কাজ পাচ্ছেন এতে অনেক। টিমের বয়সের গড় ২৩। বুড়োটে দল অবশ্যই নয়। সেরা একাদশ বলতে যা বোঝায় বালকিষেণের টিম এখনো সেখানে পৌঁছয়নি। ওর সাফ কথা, নাড়াচাড়া করতে করতে ভারতীয় দলের দক্ষতা এখনো বিশ্বের যেকোনো দলকে চ্যালেনজ করতে পারে। লস অ্যানজেলেসের আগের অনুশীলনে একটাই লক্ষ্য হবে, সোনা জেতার গুপ্তিমন্ত্রে কি করে পৌঁছনো যায়। বালকিষেণ লস অ্যানজেলেসের সোনা এনে দিতে পারলে নিশ্চিত হওয়া যাবে—ভারতীয় হকি আধুনিকতায় পৌঁছেছে। ☐

শাশ্বতী ঘোষ

'উইমেন্স স্টাডিজ' একটি প্রচেষ্টার মূল্যায়ণ

এপ্রিলের ৯ থেকে ১২— ত্রিবান্দ্রমে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথেয়তায় অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্স অন উইমেন্স স্টাডিজ। কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'জেণ্ডার জাস্টিস' বা মেয়েদের সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবিধান। আয়োজন করেছিলেন সেন্টার ফর উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ—অন্যান্য কয়েকটি সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী সংস্থা থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ইউনিসেফ, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ইত্যাদি। আইনী ব্যবস্থা ও মেয়েরা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মেয়েরা এবং কাজ ও চাকরীর জগতে মেয়েরা—তিনটি ওয়ার্কশপে বিভক্ত এই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় সাড়ে চারশ গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও সংগঠক। মেয়েদের সমস্যার মতো একটা জীবন্ত সমস্যার সমাধানের জন্য এর অন্যতম সংগঠক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন্স স্টাডিজ মনে করেন যে সংগঠক ও গবেষকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলোচনা একান্তই দরকার—কিন্তু কনফারেন্সে মেয়েদের মধ্যে কাজ করা সংগঠক ছিলেন দৃষ্টিকটু রকমের অনুপাতে।

প্রথম ওয়ার্কশপ আইনী ব্যবস্থা ও মেয়েরা—পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন লতিকা সরকার। উল্লেখযোগ্য আলোচক নন্দিতা হাকসার, উপেন্দ্র বক্সী, রমলা বাক্সামুসা, আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার, সীমা সাখারে এবং কে· চক্রবর্তী। নন্দিতা বেশ কয়েকটি মামলার উল্লেখ করে দেখান যে বিচারকরা আইনকে ব্যাখ্যা করার সময় নিজস্ব মূল্যবোধের প্রভাবে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে কীরকম বৈষম্য দেখান। ডঃ উপেন্দ্র বক্সী দেখান ভারতের আইন এই সমাজের পিতৃতন্ত্রকেই কিভাবে সমর্থন ও পোষণ করে। রমলা বাক্সামুসা এবং আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার মুসলিম আইনী অনুশাসন (পার্সোনাল ল) কিভাবে মুসলিম জনসাধারণ, বিশেষত এই ধর্মের মেয়েদের শোষণ করে তা নিয়ে বলেন। কে· চক্রবর্তী এবং লতিকা সরকারের আলোচনা দেখায় যে সেন্সাস যারা সংগ্রহ করে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ইত্যাদির ফলে মেয়েদের সম্বন্ধে সংগৃহীত পরিসংখ্যান সবসময়ই অবমূল্যায়ণ (আণ্ডার এস্টিমেটেড) হয় এবং সেজন্য আইন প্রনয়ণের সময় মেয়েদের স্বপক্ষে যে পরিসংখ্যান হাজির করা যেত, তা যায় না। সীমা সাখারে, নিজে আইনজীবী আমেদাবাদের বলাৎকার বিরোধী মঞ্চের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলেন যে ধর্ষণ আইনের ফাঁক দিয়ে দোষী ব্যক্তিরা কিভাবে বেরিয়ে যায়। এ ছাড়া অন্যান্য যে যে পেপার ছিল, অনেকগুলোই উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে জটিল এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বলে মনে হয়। কিন্তু এরকম একটা সর্বভারতীয় কনফারেন্সে যা আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, যেমন আমাদের দেশের আশি শতাংশ নিরক্ষর গরীব মেয়েদের কাছে আইনকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, অথবা আদিবাসী মেয়েদের জমিতে অধিকার দেওয়ার জন্য কি আইন প্রয়োজন—তা নিয়ে আলোচনা একেবারেই হয়নি।

গীতা সেনের সুষ্ঠু পরিচালনায় দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ—মেয়েদের কাজ ও চাকরী—বোধহয় এই কনফারেন্সের সবচেয়ে আকর্ষণীয়, জীবন্ত আর বিতর্কিত ওয়ার্কশপ ছিল। অনেকগুলো সেসান ছিল এই ওয়ার্কশপে—মেয়েদের কাজের সংজ্ঞা, গ্রামের মেয়েদের কাজ ও চাকরী, শিল্পের নারী শ্রমিক, আয় ও চাকরী উৎপাদনকারী প্রকল্পের মূল্যায়ণ ইত্যাদি। গীতা সেন আলোচনার শুরু করেন শ্রেণী ও জাত অনুযায়ী কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে বদলায় এবং একটা গোষ্ঠী যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমাজে উপরে ওঠে তার সঙ্গে ঘরের মেয়েদের বাইরে কাজের পরিধিও কমে আসে তা দিয়ে। অবশ্য তা বলে তাদের কাজের পরিমাণ কমে না। অন্যদিকে মজুরী না থাকলে কোনো 'কাজ'—তা যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন—'কাজ' বলে মনে করা হয় না। আবার বাড়ির কাজ (ধোয়া-মোছা, রান্না-বান্না আর বাচ্চা বড় করা) আর বাইরের কাজ (ঝিয়ের কাজ, অফিসের কাজ, কারখানার কাজ ইত্যাদি)—এই দুইয়ের মধ্যেও সামাজিক সম্মানের স্তরভেদ রয়েছে এবং তার সম্ভাব্য কারণ নিয়েও আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে গৃহশ্রম ও তার মজুরী নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়। গ্রামের মেয়েদের প্রসঙ্গে পরিসংখ্যানের ফাঁকি (এগ্রিকালচারাল ও রুরাল এনকোয়ারী কমিশনের সঙ্গে ফিল্ড সার্ভের তুলনা করে), ক্ষেতমজুরদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার তাৎপর্য, কৃষিতে উন্নত যন্ত্র ব্যবহার এবং মেয়েদের কাজ ও চাকরী কম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন মুকুল মুখার্জী, অপরাজিতা চক্রবর্তী প্রমুখরা। শিল্পে নারী শ্রমিকের আলোচনায় আসে চটকল, রপ্তানিমুখী শিল্প, জামাকাপড় সেলাই ইত্যাদিতে নারীশ্রমিকদের ভূমিকা। কল্পনা রাম দেখান কেরালার মৎস্যজীবী গোষ্ঠীতে ট্রলার চালু হবার ফলে মেয়েরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের দোসর যে সমস্ত বহুজাতিক সংস্থা কল-কারখানা খুলছে, মেয়েদের কাজের উপর তার প্রভাবের কথাও আলোচিত হয়। এ প্রসঙ্গে আসে ফিলিপাইনস্, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কথা। আয় ও চাকরী উৎপাদনকারী প্রকল্পের সমালোচনা করে সবাই বলেন যে পরিকল্পনাকাররা মেয়েদের কাজ মূলত ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ধরে নিয়ে প্রকল্প রচনা করেন। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মেয়েই কেবলমাত্র ঘরের কাজ করে সংসার চালাতে পারেন না। তাদের মুখ চেয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার কথা সবাই বলেন।

তৃতীয় ও শেষ ওয়ার্কশপ ছিল রাজনৈতিক অংশগ্রহণ—পরিচালনা করেন বীণা মজুমদার। এই ওয়ার্কশপটাই কনফারেন্সের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত যদি সাম্প্রতিককালে সংগঠন যাঁরা করছেন তাঁদের এবং নারী সংগঠনগুলোর যোগ দেবার সুযোগ বেশি থাকত। তা না হওয়ায় অধিকাংশই হয়েছে বর্তমানের পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা। যেমন নীরা দেশাইয়ের ভক্তিবাদে মেয়েরা বা অনেকের ভোটে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ছিল একমাত্র ইলিনা সেনের ছত্তিশগড় মহিলা মুক্তি মোর্চার অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ কর্মীদের থেকে নেতৃত্ব উঠে আসার সমস্যা। তবে তাঁর বক্তব্য ও পরবর্তী আলোচনাকে সেই সেসানের সভাপতি পার্থ মুখার্জি অচিরেই বাধা দিয়ে থামিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। মৃণাল গোরে বলেন সমাজসেবামূলক কাজকে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ হতে হবে। ছায়া দাতার বলেন প্রথাগত বামপন্থী রাজনীতিতে জাত (কাস্ট) যেমন শ্রেণীর সঙ্গে একটি বাড়তি বিচার্য বিষয় হয়েছে, তেমনি নারী-পুরুষ সম্পর্ককেও সেখানে অবশ্যই জায়গা দিতে হবে। অমিত গুপ্তর পেপারের শিরোনামে 'তেভাগা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা' থাকলেও আলোচনায় রানী দাশগুপ্তা (তেভাগা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে) বা অ্যাড্রিয়েন কুপারের (মানুষীতে) আলোচনায় যে তথ্য ছিল, ততটুকুও ছিল না।

আমাদের সমাজের সর্বস্তরে মেয়েদের 'মা-মেয়ে-বৌ' এর বাইরে ভাবাই হয় না। তাই এরকম একটা কনফারেন্সের ভীষণ দরকার ছিল। কিন্তু সেই কনফারেন্সও যদি আমলা-সরকার-নানারকম স্তরভেদে (হায়ারার্কি) আবদ্ধ হয়ে যায়, যদি সেখানে উদ্বোধনী বক্তৃতায় "মেয়েদের স্থান গৃহস্থালিতেই" (কেরালার রাজ্যপাল) ধরনের মতামত ব্যক্ত হয়, তাহলে সেটা সুলক্ষণ নয়। আর নারীসমস্যার মত একটা জ্বলন্ত সমস্যাকে ঠাণ্ডা করে দেবার সবচেয়ে সুবিধাজনক রাস্তা হল তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে ঢুকিয়ে বাকসর্বস্বতায় আটকে রাখা—যে আশঙ্কা কনফারেন্সের শেষে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন্স স্টাডিজের সাধারণ সভায় অনেকেই ব্যক্ত করেন। □

জার্মানি থেকে

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্চমে চারণসঙ্গীতের ঐতিহ্য য়ে যায়নি, শিল্পায়ন আর নগর সমাজের অনিবার্য প্রভাবের তার রূপ ও চরিত্র পালটিয়েছে, । 'মিনেসিঙ্গার'-দের দেশ ংতেও আধুনিক চারণদের য়তা অটুট রয়েছে, তাদের বার্তা ঙ্গীত ব্যস্তসমস্ত ক্রেতা' আর তিসম্পন্ন পথচারীর ঞ্চল্যকে অবশ করে দেয়, এই ল্পীদের ঘিরে গড়ে ওঠে উৎসাহী র বৃত্ত।

গ্মের তপ্ত প্রতীক্ষিত লিতে, ঝকঝকে সৌরকরোজ্জ্বল হ্নে যখন দিনদেব সেই -নটার সময় অস্ত যায়, কর ক্রবাদুরেরা তাদের কথা ও পরিবেশন করতে আগ্রহী হয়ে । এই দীর্ঘ আতপ্ত দিনগুলি তর উপযুক্ত মরশুম গড়ে , কারণ সূর্যাকাঙ্ক্ষী নাগরিকেরা অতি অবশ্য রাস্তায় বেরিয়ে । তারা এসে ভিড় করে শহরের বিপণি এলাকায় বা প্রাণকেন্দ্রে কার একটি অংশে যানবাহন ল নিষিদ্ধ। সারিসারি ঝকমকে ন, দোকানগুলির সামনে ণিক খাদ্য ও পানীয়ের ছোট ব্যবস্থা, শানবাঁধানো রাস্তায় তারা পসরা নিয়ে বসে গেছে, ত মানুষ ঘুরছে, দেখছে, খাচ্ছে, চ্ছ—মোটামুটি আধুনিক মেলার ফূর্ত পরিবেশ—আর এইখানেই ল্পীরা দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের বা বেহালা, বাঁশি বা মাউথ ন নিয়ে। প্রাথমিক কয়েকটি র পর শুরু হয় গান, পণ্যের সমুদ্রে কয়েকটি কণ্ঠ ও যন্ত্রের দী লণ্ঠনের দ্বীপ।

শ্ন উঠতে পারে 'প্রতিবাদ' শব্দটি র করলাম কেন? শিল্পের থিত নিরপেক্ষ বিশ্বে অনাবশ্যক রাজনৈতিক দ্যোতনা বয়ে না তো? সুস্থির মস্তিষ্কে একটু করলেই কিন্তু এদের প্রচ্ছন্ন এবং মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধী টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, নত দুনিয়ার বহুনিন্দিত, রোধ্য culture industry-র এরা পরোক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা । যে দেশে বিনোদনের সর্বগ্রাসী মাধ্যম হল রঙিন টেলিভিশন (রেজিস দেব্রে মনে করেন টেলিভিশনের ক্ষুদ্র পর্দায় জগতের

বর্ণালী নির্বুদ্ধিতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে) আর ভিডিও, যে দেশে এমনকি শিশুরা পর্যন্ত কলের পুতুলের মতো টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকে, সে দেশে এই পথশিল্পীরা খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞাপনের সম্মোহনী জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের পছন্দমতো গান গায়। সফল সঙ্গীত শিল্পীদের, অর্থাৎ তারকাদের জমকালো পোশাক, শরীরের অদ্ভুত কসরৎ, বিচিত্র বিরক্তিকর মুখভঙ্গির পাশে এদের সরল, গভীর আর প্রাণস্পর্শী মনে হয়। পরনে এদের রঙচটা জিনস, গেঞ্জি, মলিন এমনকি ছেঁড়া তালি দেওয়া শার্ট বা কুর্তা, গালে একমুখ দাড়ি, পায়ে চটি, কাঁধে একটি ঝোলা আর হাতে বাদ্যযন্ত্র। গান শুরু করবার আগে তারা একটা চাদর সামনে বিছিয়ে দেয় বা মাথার টুপিটি খুলে রাস্তার উপর রাখে। তৃপ্ত শ্রোতারা যাবার আগে কিছু দক্ষিণা রেখে যায়—দশ ফেনিগ্ থেকে এক মার্ক। এদের উপার্জনের পদ্ধতি ও পরিমাণ, বেশ, আচরণ সবকিছুই প্রত্যক্ষভাবে একটি সত্যকে বারবার মূর্ত করে তোলে, "সঙ্গীতকে আমরা পণ্যসর্বস্ব হতে দেব না।" আজকের এই চারণদের পাশেই যে কোনো কৃতী সঙ্গীততারকাকে রাখুন, তাঁদের শরীর-নাচানো মাঝে মধ্যে অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছয়, বস্ত্রের বাহার দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়! এই বেচেই তারা ঘরে আনছে লক্ষ লক্ষ মার্ক আর গানের ধরন, সে কথা নাই বা তুললাম, রুণা লায়লাও লজ্জা পাবেন।

আজ পর্যন্ত আধুনিক 'মিনেসিঙ্গার'দের কণ্ঠে আমি অশ্রাব্য, রুচিহীন কিছু শুনিনি। মাঝে মধ্যে কোনো একক মগ্ন শিল্পী গির্জার ছায়ায় স্বরলিপিটি রেখে একমনে বাখ্-এর পুণ্য সুর বাজায়, অন্য কেউ আইসক্রিম বিপণিটির পাশেই তার স্থান করে নিয়ে বাঁশিতে মোৎসার্ট বা বিঠোফেনের পরিচিত কোনো মূর্ছনা তোলে, আবার কিছু দূরে একজন উদ্দীপিত গায়ক গিটারে তাল রাখতে রাখতে লেওনার্ড কোহেন-এর মরমীদৃপ্ত প্রতিবাদ সঙ্গীত পরিবেশন করে। এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে হাইডেলবার্গের প্রধান সরণীতে প্রকৃত অর্থে সঙ্গীত সম্মেলন বসে গিয়েছিল। রাস্তার এক প্রান্তে বাভারিয়া থেকে আগত কয়েকজন তরুণ-তরুণী সেই প্রদেশের প্রাণবন্ত লোকসঙ্গীত গাইছিল। তাদের ঘিরে করতালি, অভিনন্দন এমনকি হাত ধরে ধরে নাচ অব্যাহত ছিল। কিছু দূরে গির্জার পাশে দুজন শিল্পী বেহালায় আর বাঁশিতে বাখ বাজাচ্ছিল। তাদের পঞ্চাশ গজ সামনে এক তরুণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল জোয়ান বেজ-এর সুরধন্য আবেদন, তার বন্ধু রাখছিল তাল আর তাদের সন্তান ঝুমুরের মতো কি একটা নাড়ছিল এবং রাস্তার অন্য প্রান্তে লাতিন আমেরিকার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী তাদের দেশীয় পোশাক পরে ব্যাঞ্জো, ম্যাণ্ডোলিন নিয়ে নেরুদার কবিতাকে গান করে শোনাচ্ছিল। এই গোষ্ঠীর একজন প্রথমে কবিতাটি পড়ে তার জার্মান অনুবাদ শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল, তারপর আর একজন এই কথাগুলির সঙ্গে সামরিক শাসন আর তার রক্ষাকর্তাদের সূত্রবদ্ধ করছিল, অবশেষে কিস থিওড্রাকিস-এর সুরারোপিত নেরুদার কবিতা মুখরিত হয়ে উঠেছিল রাস্তায়।

পথসঙ্গীতের এই আন্তর্জাতিক চরিত্র সত্যি লক্ষ্য করবার মতো; চারণ ঐতিহ্যের গতিময়, ভ্রাম্যমান দিকটির সঙ্গে এর যোগ অঙ্গাঙ্গী। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতি বছর অনেক উৎসাহী তরুণ তরুণী পশ্চিম জার্মানি দেখতে আসে। পুঁজি এদের যৎসামান্য, কিন্তু পর্যটন বাসনা প্রবল। উপরন্তু অনেকেরই সম্বল গানের বই, গিটার বা বাঁশি। যখনই পয়সায় টান পড়ে তখনই এরা স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী হয়ে যায়। রাস্তায় নেমে আসে গান নিয়ে। স্পিরিচুয়াল থেকে আরম্ভ করে রবার্ট বার্নস-এর প্রেমের গান, এডিথ পিয়াফের গীতিকবিতা থেকে আর্জেন্টিনার কোনো লোকসঙ্গীতের সুর সবই এক সঙ্গে পরিবেশিত হতে থাকে।

এখনও পর্যন্ত পথচারীরা চারণদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে এসেছে। কয়েকটি মুদ্রা রেখে যেতে তারা কার্পণ্য করে না, এবং স্বল্প পারিশ্রমিকের চেয়েও যা মূল্যবান, আন্তরিক আগ্রহভরে তারা শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। এক একজন শিল্পী বা এক একটি গোষ্ঠীকে ঘিরে বৃত্ত গড়ে ওঠে, শিল্পীরা জানতে চায় কি গান তারা গাইবে, প্রস্তাবও আসে, ফলে এলিয়েনেশন কুখ্যাত সমাজে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মানবিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয় শিল্পের মাধ্যমে। সম্পর্ক নিবিড় হয় যখন শিল্পীরা চলতি কোনো অন্যায় বা মতলববাজ কোনো রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে গান বাঁধে। কত সময় চোখে পড়েছে সঙ্গীতের উত্তাল মুহূর্তে, গায়ক যখন তীব্র কণ্ঠে শান্তির জন্য প্রার্থনা করছে, ড্রামের উপর মুহুর্মুহু পড়ছে আঙুলের আঘাত, ছন্দ সুর কথা যখন চরমে উঠেছে, তখন শ্রোতারা কণ্ঠ মিলিয়েছে, পরস্পরের হাত ধরে নাচতে শুরু করেছে, আনন্দে প্রত্যাশায় বা প্রতিবাদের মগ্নতায়।

আধুনিক চারণদের গান সমাজের স্পন্দনকেই অনুসরণ করে। এই সাযুজ্যটি স্পষ্ট চোখে পড়েছিল গত গ্রীষ্মে এবং পরের মাসগুলিতে। ইউরোপের মানুষ তখন ক্ষেপণাস্ত্রের মারণছায়া ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর। চারিদিকে তখন 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এই ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল, চারণেরা সেসময়ে, স্বাভাবিক নিয়মেই, শান্তির গান গেয়েছিল, কখনো মরমী সকরুণ তীব্রতায়, কখনো ধিক্কারের তেজোদ্দীপ্ত রোষে। □

মিলন দত্ত

সচেতনতার বিস্তার

গত কয়েক বছরে ভারতের জনমত খানিকটা নাড়া খেয়েছে নারী নির্যাতনের ব্যাপারে। পণ প্রথা হোক বা গৃহবধূ হত্যা হোক বা বলাৎকার হোক--নারী নির্যাতনের এই ব্যাপারগুলো সাধারণ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া অবশ্যই এখনো পথচলতি আলোচনার স্তরেই এবং তা প্রায় কখনোই সক্রিয় ভাবনাচিন্তার পর্যায়ে যায় না। তবু এটা তো ইতিবাচক পরিবর্তনই। অবশ্য এর একটা প্রত্যক্ষ কারণ হল, এই ভয়াবহ বিপদ এখন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতেও হানা দেয় মাঝেমাঝেই। আর পণ প্রথার শিকার হয় সাধারণ মধ্যবিত্তই সবচেয়ে বেশি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হালের বেশ কিছু ঘটনা এটাই প্রমাণ করে।

এ ধরনের ঘটনাগুলো আমাদের জানতে পারার একটা সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে। অতীতে খবরের কাগজে এই সব ঘটনা খুবই অবহেলায় বেশ ছোট করে স্থান পেত বা কখনো পেতই না। আজকাল আর তা হয় না। বরং উল্টোটাই--ঘটনার গোটা সংবাদ তো থাকেই, কখনো সেই ঘটনার পরবর্তী ফলাফল এবং পরিণতিকে অনুসরণ করে খবরের কাগজ। এর ফলে যেমন জনগণের মধ্যে চেতনা বিকশিত হয়, তেমনি অপরাধীদের মনোবলকে ভেঙে দিতে সাহায্য করে। এইতো মাত্র কিছুদিন আগে কলকাতার একটি দৈনিক একটি মেয়ের পণের টাকা এবং জিনিসপত্র দিতে না পারার ঘটনাকে প্রধান সংবাদের মর্যাদা দিয়ে ছেপেছিল। বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরেও এমনকী নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়ে যাবার পরেও নাকচ হয়ে যায় বিয়েটা। ঐ কাগজে এ নিয়ে কিছু চিঠিচাপাটিও ছাপা হয়। তার কোনো কোনোটিতে খোলা আহ্বান ছিল, সহৃদয় যুবকদের প্রতি, বিনা পণে মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য। সংবাদপত্রগুলো অবশ্য সবসময়ে ঐ একই ভূমিকা পালন করে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। বিখ্যাত সুরূপা হত্যা মামলাকে নিয়ে গপপো ফেঁদে এই কলকাতারই এক দৈনিক তার বিক্রি রাতারাতি বাড়িয়ে নিয়েছিল। আবার কোচবিহারের নার্স বর্ণালীর বলাৎকারে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অনেক কাগজই মুখরোচক গল্প বিক্রি করেছে--তারা সৎ-সাংবাদিকতার বিশেষ পরিচয় দিতে পারেনি। তবু এরই মধ্যে খবরগুলো প্রকাশিত হয় এবং কখনো যথাযথ গুরুত্বে প্রকাশিত হয়, সেটাই আশার।

ইদানীং কলকাতা থেকেই বিভিন্ন মহিলা সংগঠন প্রায় অনিয়মিত হলেও বের করছে তিনটে কাগজ--'সবলা' 'অহল্যা' আর 'সচেতনা'। এদের সব কটিই যে খুব উঁচুমানের কাজ করতে পারছে, তা অবশ্য নয়। তবু সবকটিই মেয়েদের নিজস্ব কাগজ তাদের নিজস্ব সমস্যার কাগজ। এই পত্রিকাগুলো কেবল মেয়েদের ওপর নানা রকম সামাজিক অন্যায়ের বিশ্লেষণই করে না, বিভিন্ন পেশার মেয়েদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও থাকে। আর থাকে মেয়েদের আন্দোলনের কথা, তাদের জাগরণের কথা। বস্তুত এই ধরনের পত্রিকাগুলো গড়েই ওঠে মহিলা সংগঠনগুলোর আন্দোলনকে ভিত্তি করে এবং সবকটি পত্রিকার পেছনেই থাকে একটা সংগঠিত আন্দোলন। তাই অনেক সময়েই ঐ পত্রিকাগুলো থেকেই নারী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের ব্যাপ্তি আর শক্তি বুঝে নেওয়া যায়। মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি এই ধরনের পত্রিকাগুলো জনমত গঠনের কাজ হয়ত তেমন কিছুই করতে পারে না তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায়, কিছু ওদের সামগ্রিক আন্দোলনের একটা প্রভাব আছেই।

এইতো 'সচেতনার'র উদ্যোগে কিছু দিন আগেও একটা নাটক অভিনীত হয়েছে পণ দেবার বিরুদ্ধে। নাটকটার নাম 'কনে দিলাম সাজিয়ে'। অঙ্গনমঞ্চ পদ্ধতিতে নাটকটি কয়েকবার অভিনয় করেছে সচেতনার সদস্যরা। কে না জানে জনমত সংগঠিত করার কাজে নাটকের বিশাল ক্ষমতার কথা।

কেবল তো এই-ই নয়, কোনো কোনো সংগঠনের সক্রিয় উদ্যোগ দেখা গেছে তথ্যচিত্র বা ছোটমাপের কাহিনীচিত্র তোলার কাজে। প্রত্যেক ছবির শুরুতে সিনেমা হলে বাধ্যতামূলক তথ্যচিত্র দেখানোর যে সরকারি ব্যবস্থা--সেখানেও ইদানীং বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র দেখা গেছে।

আর আকাশবাণী তো এ ব্যাপারে রীতিমতো সোচ্চার। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকারি প্রচারের পাশাপাশি এ ধরনের নাটক বা কথিকার আয়োজন প্রায় নিয়মিত। সমাজের এই কদর্য সমস্যার বিরোধিতা বেশ একটা আন্দোলনের রূপ পেয়েছে এবং সংবাদের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই তা গ্রহণ করেছে বোঝা গেল।

সবচেয়ে আধুনিক এবং জীবন্ত শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্রে এর প্রভাব পড়বার কথা স্বাভাবিকভাবেই। এমনিতেই বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বাইরে যে নতুন ধারার ছবিগুলো তৈরি হয়, সেখানে বারবার আঙুল তুলে দেখানো হয়েছে সমাজে নারীর অবস্থানের প্রতি। কেবল বাংলা নয়, হিন্দিতে নয়, অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাতেও এমন ছবি তৈরি হয়েছে যেখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে নারীর প্রতি সামাজিক বঞ্চনা।

আর বোম্বাই ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনাগুলোকে এবং এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টকে তাদের ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়েছে। পণপ্রথার শিকার কোনো মেয়ের কাহিনী কিংবা ধর্ষিতা কোনো নারীর কাহিনী কিংবা অবিবাহিতা কোনো মায়ের কাহিনীকে বোম্বাই মার্কা ছাঁচে ঢেলে ফরমুলা মাফিক সাজিয়ে চুটিয়ে বাণিজ্য করছে ভারত জুড়ে--আর পাঁচটা হিন্দি সিনেমা যেমন করে। কিছু দিন আগেও কলকাতার একাধিক সিনেমা হলে রমরম করে চলেছে একটা ছবি 'দুলহা বিকতা হ্যায়'। বোম্বাই-এর টিপিক্যাল ছবি--কেবল সাধারণ মানুষকে খাওয়ানোর জন্য পণ প্রথার সেন্টিমেন্ট ঢোকানো হয়েছে বেশ মোটা দাগে। অতি কুৎসিত এইসব ছবি সর্বদাই সামাজিক অবক্ষয়ের পক্ষে যায় এবং বিরোধিতা করে সাধারণ মানুষের সচেতনতার।

এরই মধ্যে হুজুগে পড়েই এক অলস বিকেলে ছবির নাম এবং তারকাদের তালিকা দেখে একটা সিনেমা দেখতে ঢুকেছিলাম--কিন্তু ছবিটা ছিল অন্য রকম, যেমন ভাবা গিয়েছিল সে রকম নয়। এক অবিবাহিতা মায়ের যোগ্য অধিকারে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামই ছিল ছবিটার বিষয়। ছবির নাম 'ইনসাফ কা তরাজু'। গল্পটাকে মোটা দাগে সাজিয়ে বিনোদনের শস্তা খোরাক ঢোকালেও ছবিটা বক্তব্যের দিক থেকে বেশ বলিষ্ঠ ছিল।

নারী নির্যাতনের নানান ঘটনা এমনই যে তাকে মাধ্যমগুলো অতি সহজেই ব্যবসার কাজে লাগাতে পারে, তা সে হিন্দি সিনেমাই হোক বা কোনো খবরের কাগজই হোক। কিন্তু আশার কথা হল, একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে--ঘটনাগুলো জানার, বুঝতে চেষ্টা করার। আজকের ন্যূনতম এই আগ্রহই হয়ত সমাজের বুকে চেপে বসা ব্যাপক অচলায়তনকে একদিন টলিয়ে দেবে। □

ডাঃ শ্রীকুমার রায়

এবছরের আন্ত্রিক রোগ
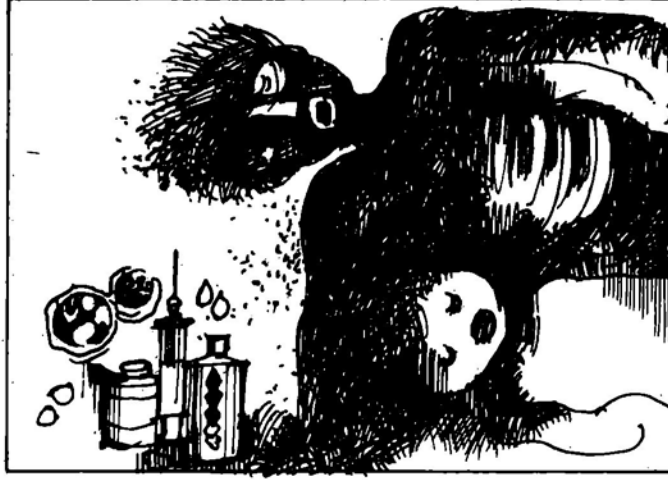
গল্পটা আশা করি সকলেরই জানা আছে—ভগবান তথাগত বসে আছেন শিষ্যাদি পরিবৃত হয়ে ; এমন সময় সদ্য সন্তানহারা এক রমণী তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ে বলল, প্রভু, ফিরিয়ে দিন আমার সন্তানের প্রাণ। সমবেদনায় অমিতাভের চোখ দুটি হয়ে উঠল করুণ, তিনি বললেন—অসম্ভব, তবে যদি এমন বাড়ি থেকে তুমি আমাকে পাঁচটি শ্বেত-সর্ষপ এনে দিতে পার যেখানে কোনোদিন কোনো শিশু মরে নি, তা হলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। বহু খুঁজেও পুত্র শোকাতুরা সে রকম বাড়ি পায় নি, তার পুত্রও বাঁচেনি। কিন্তু সে সান্ত্বনা পেয়েছিল এই ভেবে, যে তার মতো ভাগ্যহত প্রতি ঘরেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পরিস্থিতি কি রকম ছিল বলতে পারব না, তবে বিংশ শতাব্দী যখন শেষ হতে চলল সেই যুগে এ রকম "ছেলে ভুলনো" ব্যাপার হাস্যকর নয় কি ? সভ্য সমাজ নিশ্চয় বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ চায়—শিশুমৃত্যুর হার কেন এত বেশি, কি করে আমরা সেটা প্রতিরোধ করতে পারি।

তবু ওই বস্তাপচা গল্পটাই আপনাদের মনে করিয়ে দিলাম এই কারণে • যে আজও আমরা, ভারতবাসীরা, বাস করছি সেই বুদ্ধদেবের যুগেই। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে আন্ত্রিক ব্যাধির মড়ক চলছে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী কম করে হাজার দুয়েক শিশু যাতে সদ্য প্রাণ হারিয়েছে, তার কারণ এখনও আমরা সঠিকভাবে জানি না, তার প্রতিকারেরও নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। রোগটার স্পট যে ইদানীং কমের দিকে সেটা আমাদের কোনো কৃতিত্ব নয়, all epidemics die out by itself. আমরা শুধু বিপদে পড়ে তর্কাতর্কি করেছি আর পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়েছি। তাই অতীতেও যেমন প্রতিবার আন্ত্রিক ব্যাধিতে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। কেন এমন নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠলাম তার কারণটা বলি।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক বর্তমান ব্যাধিটির প্রকৃতি কি ? সে ব্যাপারে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি। জনসাধারণকে বলা হচ্ছে আন্ত্রিক ব্যাধি, ইংরেজি করে বলা হয় Gestro-Enteritis. কিন্তু চিকিৎসকের কাছে কথাটা খুব স্পষ্ট নয়। বহু কারণেই পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ঝিল্লি প্রদাহ ঘটে যেমন, (ক) 0.26, 0.55, 0.111, 0.119, 0.127 ইত্যাদি কয়েক প্রকার E Coli খাদ্য পানীয়ের সঙ্গে পেটে গিয়ে দু'থেকে দশ দিনের মধ্যে ভেদ বমন ঘটাতে পারে। শিশুরাই এই জীবাণুতে আক্রান্ত হয় বেশি। (খ) সিগেলা, বিশেষ করে সিগা ভ্যারাইটির ব্যাসিলাস অন্ত্রে অনুপ্রবেশ করে দিন চারেকের মধ্যেই হঠাৎ জ্বর, পেট মুচড়ে বার বার দাস্ত (দিনে অন্তত কুড়ি পঁচিশবার পায়খানা হয়। শেষের দিকে রোগী আর পায়খানা ছেড়ে নড়তে চায় না, যার জন্যে ইংরেজিতে বলে gluid to the Commode), মলে আম এবং রক্ত, বমি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না নিলে রোগীর, বিশেষ করে শিশুদের খুব দ্রুত জীবন সংশয় ঘটে। এক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রধান কারণ শরীরাভ্যন্তরে জলাভাব (dehydration)—বাচ্চারা আদৌ যা বরদাস্ত করতে পারে না। (গ) টাইফিম্যুরিয়াম, এন্টেরিডাইটিস, কোলেরিসুইস ইত্যাদি, স্যালমনেলো জাতীয় কিছু ব্যাসিলাস ছ'মাস থেকে দু বছরের শিশুদের ফুড পয়জনিং করে মারাত্মক গ্যাসট্রো এন্টেরাইটিস ঘটায়। এবং (ঘ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু এবং এন্টেরোভাইরাসরাও আন্ত্রিক ব্যাধির অন্যতম কারণ। প্রশ্ন হল এর মধ্যে কোনটা বর্তমান মহামারীর জন্যে দায়ী।

National Institute for Cholera and Enteric Diseases-এর বিশেষজ্ঞরা রোগের লক্ষণাদি দেখে এবং জীবাণুদের প্রকৃতি নির্ণয় করে বলছেন মহামারীর কারণ ওই সিগেলা সিগা (Type I, এবং অল্প কয়েক ক্ষেত্রে Type II)। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞরা বলছেন আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১০ জন এতে আক্রান্ত হয়েছে। তাহলে বাকিরা কি ? এর মধ্যে আরও জিজ্ঞাস্য আছে। বই পত্তরে পড়েছি সিগেলা ব্যাসিলাস ইনফেকশনে সাধারণত 'সালফা' বা দু একটা মামুলি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খুব ভাল কাজ করে। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন এবারে যে সিগেলা ইনফেকশন পশ্চিমবঙ্গ উজাড় করে দিচ্ছে, তারা সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিকে মরে না। এই ড্রাগ রেজিসটেনসেরই বা কারণ কি ? এসব প্রশ্নের সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি, সুতরাং সন্দেহ থেকেই যায় মহামারীর কারণ অন্য কিছু নয়তো ? যেমন ধরুন "প্রতিক্ষণ"-এর (২রা মে সংখ্যা) প্রতিবেদনে অজেয়া সরকার যে Chronic arsenic poisoning-এর ইঙ্গিত দিয়েছেন ?

এবারে প্রতিকার ব্যবস্থার কথায় আসা যাক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ infective gastro-enteritis এবং তাঁরা জনসাধারণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অবহেলিত জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং অপুষ্টিকেই এর জন্যে দায়ী করেন। সে খবর যে আমাদের সরকার বা জনসাধারণের শিক্ষিত অংশ জানতেন না, তা নয়। তবু মহামারী আকারে রোগটি দেখা দেবার আগে পর্যন্ত ও সব ব্যাপার নিয়ে কেউই মাথা ঘামান নি। খাদ্য এবং পানীয় জলের মাধ্যমে উপরিউক্ত micro-predator-র ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে, তবু দিনের পর দিন জলকষ্ট, রাস্তায় রাস্তায় আঢাকা খাবার, কাটা ফল বিক্রি পল্লীগ্রামে তো বটেই, এমন কি শহরেও। এতগুলো প্রাণহানীর পরেও আমাদের মহামারী প্রতিরোধ প্রচেষ্টা কি রকম দেখুন—এক দিকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে দোষারোপ করছেন গাঁয়ের পুকুর পাতকোর জল জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ হ্যালোজেন ট্যাবলেট সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে, অপর দিকে আজও পুকুরে লোকের পাশাপাশি গোরু মোষ চান করছে, অজ্ঞ লোকেরা ইঁদারার জল দূষিত করছে। পুলিশ একদিকে কাটা ফল বিক্রেতাদের গ্রেপ্তার করছে, আবার নিজেরাই মোড়ের মাথায় "তাজা গিল্লে কি রস"(!) দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করছে। শুধু অজ্ঞ পল্লীবাসীদের দোষ দিয়ে কি হবে, শহরের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকেও বলতে শুনছি—জল কি ফুটিয়ে খাওয়া যায়, ওতে টেস্ট নষ্ট হয় ! দৈনিক পত্র পত্রিকায় প্রায়ই প্রতিরোধ বিধির ফিরিস্তি ছাপা হচ্ছে, কিন্তু দেশগাঁয়ে কতজন লোকের কাছেই বা সে কাগজ পৌঁছয়, কতজনেরই বা বর্ণপরিচয় আছে ?

তাই বলছিলুম, আমরা আজও বুদ্ধদেবের যুগে বাস করছি ; আন্ত্রিক রোগ বিহারে হচ্ছে, আসামে হচ্ছে, বাংলাদেশে হচ্ছে, সুতরাং আমাদের আর দোষ কী ? তার ওপর এই দেখুন না বাংলাদেশ থেকে ডাঃ মুজিবুর রহমান সেদিন বলে গেলেন—সব ঠিক হায়। পেসেন্ট না হয় মলোই, অপারেশন তো সাকসেসফুল ! □

অমল পাল

মাটি হয়ে গেল টাকা ডোবা হয়ে গেল মাটি
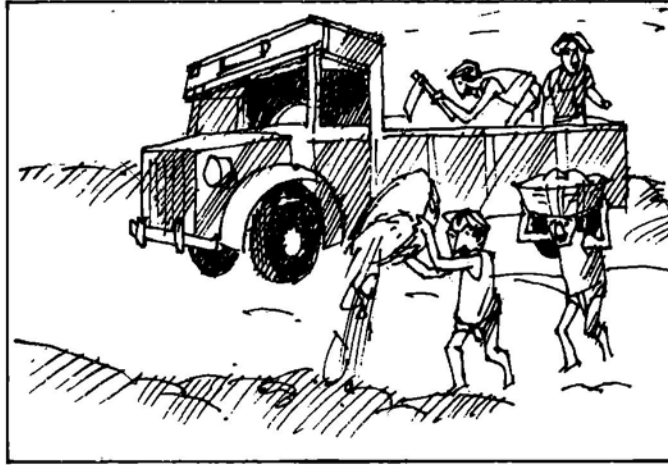
যে ধানী মাঠে টোকা মাথায় চাষী পাচনবাড়ি হাতে হেইট্ হেইট্ শব্দে বরাবর লাঙল ঠেলে জমি চাষ করে এসেছে, সে মাঠে এখন অন্য খেলা চলেছে। এ খেলায় যেমন মেতেছে লোক দিয়ে চাষ করানো জমির মালিক, তেমনি মেতেছে নিজে চাষ করা জমির মালিকও।

প্রথমে চষে জমি ঝুরো কর, তারপর বৃষ্টি কিংবা ডিপ টিউবওয়েল-এর সেচের জলে জমি কাদা কর। তারপর গিয়ে রোয়ার চারা বোন। এরপরে সার, কীটনাশক ওষুধ, আগাছা নিড়নো, ফের সেচ ইত্যাদি হাজারো ঝামেলা পোহাতে পোহাতে খালি সময় গোন। এত কাণ্ডের পরে যখন মাস চারেক বাদে সারা জমিতে সোনালি ধানের শিসের নাচানাচি, তখনও কি সোয়াস্তি আছে? যতক্ষণ না ধান কেটে ঘরে তোলা হচ্ছে! আজকাল আবার কার ধান কে কেটে নিয়ে যায় তারও কি কিছু ঠিক আছে? এরপর ঝেড়ে রদ্দুরে শুকিয়ে বস্তাবন্দী করে বাজারে পাঠাতে পারলে তবে না টাকার মুখ দেখা—খরচখরচা বাদ দিয়ে যদি কিছু থাকে তো তবেই।

নতুন ব্যবস্থায় পিচ-রাস্তার চায়ের দোকানে আরামে বসে চা পান সিগারেট খেতে খেতে দালালের সঙ্গে একটু দরের দড়ি টানাটানি করা, আর সারা দিনে ক লরি মাল গেল তার একটা হিসেব নিজে নিজেই হোক আর নিজের লোক দিয়েই হোক রাখা। এই তো কাজ। সন্ধেবেলা এসে যত লরি মাল গেল তাকে ৬ দিয়ে গুণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা টাকার অঙ্ক হয়ে যাবে। এ এক ম্যাজিক—ছিল মাটি হয়ে গেল টাকা।

এক বিঘে জমি থেকে দু ফুট আন্দাজ মাটি তুলে নিলে মোট হচ্ছে গিয়ে ১৫০ লরির মতো। তার মানে দাঁড়াল নির্ঝঞ্ঝাটে বিঘে প্রতি ৯০০ টাকার মতো। আর চাষ করলে খরচাপাতি বাদ দিয়ে বিঘে প্রতি ৫০০ টাকার বেশি কিছুতেই থাকত না।

পিতৃপুরুষদের হাতে তিলে তিলে গড়া টপ-সয়েলটাকে বিক্রি করে দিয়ে জমিটার যে কী ক্ষতি হলো, সেটা সম্পূর্ণ জেনেই সে এ কাজ করেছে শুধু লোভে পড়ে—তাৎক্ষণিক কিছু লাভের আশায়। কেউ কেউ বা এই তাৎক্ষণিক লাভটাকে মূলধন করে নিয়ে কোনো পৌনঃপুনিক লাভের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় এর নয়-ছয়।

দু চার লরি মাটি নানান প্রয়োজনে এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এ দৃশ্য তো অনেক দিনই দেখছি। কিন্তু এবারে যেন ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছে। মাঠের দিকে তাকালেই দেখা যায়, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অসংখ্য লরি এক একটাতে জনা আষ্টেক করে মাটিকাটা লোক নিয়ে বারে বারে উঠে যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণ বাদেই খালি করে দিয়ে চলে আসছে। এই মাটি বোঝাই করা এবং যাওয়া-আসার মধ্যে একটা ব্যস্ততা—কেননা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলেই এ কাজের শেষ।

প্রথমে ভেবেছিলাম, বুঝি এবারের ইটের চাহিদার যোগানের জন্যেই হয়তো খোলায় চলেছে এই সব মাটির চালান। কিন্তু খুব শিগগিরি খেয়াল হলো যে, টপ-সয়েল ইট তৈরির পক্ষে খুব আদর্শ নয়। তাই একদিন কৌতূহলী হয়ে এক লরিওয়ালার সঙ্গে চললাম ওদের মাটি ফেলার জায়গাটা দেখতে। গিয়ে দেখি, কৈখালি গ্রামের জনবহুল পরিবেশে একটা খুব পুরনো ঘাট বাঁধানো পুকুর—চলেছে সেটাকে বোজানোর কাজ।

এই পুকুরটাকে এ অঞ্চলের লোকেরা তিন-পুরুষ ধরে নানা কাজে ব্যবহার করে আসছে। বিশেষ করে স্নানের কাজে। পুরনো জমিদারদের কীর্তি। নতুন কালের মালিকেরা টাকা বানানোর খেলায় লেগে গেছে দালালদের পাল্লায় পড়ে। ঢালো মাটি, জাগাও জমি, কর প্লটিং, বানাও টাকা। এখানেও চলেছে মাটিকে টাকা বানানোর সেই ম্যাজিক। কৈখালির ঐ ঘটনা এখন আর স্থানিক নয়, সার্বিক।

১৫ কাঠা জমির পুকুর। ভরতে খরচ কাঠা প্রতি হাজার দুই, বিক্রি কাঠা ১২ হাজারে। সর্বসাকুল্যে এক পুকুরে দেড় লাখ। শতকরা ১৫ টাকার ইনভেস্টমেন্টে মাসে মাসে হাজার দুই করে সুদ।

পূর্বপুরুষ প্রজাহিতে পুকুর খুঁড়ে নিজের পুণ্যের ঝুলি ভরিয়েছে, আর উত্তরপুরুষ তার লাভের ঝোলা ভরিয়েছে উঠতি মধ্যবিত্তের হিতে—প্লট জুগিয়ে।

এই ঝোলাঝুলি ভরার খেলা যত খুশি চলুক, আমাদের কোন আপত্তি নেই—হয়ত আপত্তির অধিকারও নেই, আছে শুধু আলোচনার অধিকার। তাই আলোচনা করতে সাধ জাগে যে এই সব ডোবা পুকুর বা যারা দীর্ঘ দিন ধরে মানুষের সঙ্গে তার বসবাসের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তারা কি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়?

খাওয়া এবং স্নানের মতো প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ছাড়া জলের অনেক পরোক্ষ প্রয়োজন রয়েছে আমাদের জীবনে। যেমন ধরুন বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষা করার কাজটা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বর্ষাকাল সমেত বছরের বেশ খানিকটা সময় আমাদের অঞ্চলের বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ থাকে বেশ কিছু। সমুদ্রবাহিত জলকণার সাহায্যে। বছরের অন্যান্য সময় এই আর্দ্রতার বেশ কিছুটার জোগান আসে স্থানিকভাবে আমাদের চারপাশের ডোবা পুকুর, নালা ইত্যাদি থেকে, জলের বাষ্পীভবনের ফলে। এর ফলে গ্রীষ্মের দাবদাহের প্রকোপও হয় কিছুটা সীমিত। পরিবেশের এই সব ডোবা-পুকুরেরা বিদায় নিলে আবহাওয়া হয়ে পড়বে বেশ চরম ভাবাপন্ন, আর এর ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর নেমে আসবে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া।

আমাদের পরিবেশে এই ডোবা-পুকুরগুলোর দ্বিতীয় কাজ ছিল আমাদের ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্ত বর্জিত দ্রব্যাদিকে জলবাহিত করে ধরে রাখা এবং এই ধরে রাখা জলেই একটা জৈবচক্রের সৃষ্টি করা যাতে আমাদের সৃষ্ট দূষণবস্তুগুলির একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে সাহায্য করা।

এই ডোবা-পুকুরগুলোর পরিবেশগত তৃতীয় প্রয়োজনটি এতই স্পষ্ট যে এটিকে উপলব্ধি করার জন্যে কোনো যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না। বর্ষাকালে এই সব পরিবর্তিত পরিবেশে—রাস্তাঘাটে, বাড়ির আনাচেকানাচে, হাটেবাজারে জলকাদায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে এবং দিনে দিনে আরও বাড়ছে।

সল্ট লেকের জলাভূমি এক সময় কলকাতা শহরের প্রাকৃতিক জল-নিষ্কাশনের আধার হিসেবে কাজ করত। সেটা বন্ধ করে জমি উদ্ধার করে নতুন শহর তৈরি হল বটে, কিন্তু এর ফলে কলকাতা যে কী পরিবেশগত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, সেটা 'স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড'-এর ডাইরেক্টার শ্রীসুব্রত সিংহ মহাশয়ের সাম্প্রতিক প্রবন্ধটি পড়লেই মালুম হবে। □

প্রার্থীদের শারীরিক তথ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রচার এখন নিজের গতি পেয়েছে। সেই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে হচ্ছে প্রার্থীদেরও। প্রার্থী চারজন—গ্যারি হার্ট, ওয়ালটার মনডেল, জোস জ্যাকসন ও রোনাল্ড রেগন। কিন্তু এই প্রচারের কাজে এঁদের শরীরের ওপর কতটা কী চাপ পড়ছে, আমরা সেটাও জানতে পারি যেমন, বয়স—হার্ট ৪৭, জ্যাকসন ৪২, মনডেল ৫৬, রেগন ৭৩ ; উচ্চতা—হার্ট ৬ ফুট, ১ ইঞ্চি, জ্যাকসন ৬ ফুট ২ ইঞ্চি, মনডেল ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, রেগন ৬ ফুট ১ ইঞ্চি ; ব্লাড প্রেসার—হার্ট ১০৬/৭৬, জ্যাকসন ১১২/৭০, মনডেল ১২৮/৭৪, রেগন ১২০/৮০ ; ওজন—হার্ট ১৭৩ পাউণ্ড, জ্যাকসন ২১০, মনডেল ১৬৮, রেগন ১৯৪ ; কোলেসটেরল—হার্ট ১৯৪, জ্যাকসন ১৪০, মনডেল ২২০, রেগন ১৯১।

—টাইমস

গৃহযুদ্ধ

নিকারাগুয়াতে মার্কিনী গোয়েন্দা সংস্থা সি· আই· এ-র নির্দেশে ও পরিচালনায় বন্দরের চারদিকে বিপজ্জনক মাইন বসানো হয়েছিল গোপনে। তাতে ছটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেউ মারা যায় নি। কিন্তু এই নগ্ন আইনবিরুদ্ধ কাজের জন্য মার্কিনী প্রশাসনে ফাটল ধরেছে। যেমন হোয়াইট হাউস থেকে সরকারি বিবৃতিতে বলা হলো, 'আসল কথা হলো আমরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব নিকারাগুয়াতে কমিউনিস্ট সরকার এই গোলার্ধে হিংস্রতা ও উগ্রপন্থা আমদানি করছে, নাকি আমরা চাইব বন্দুকের শক্তিকে ব্যালট কাগজের শক্তি দাবিয়ে দিক।' অন্যদিকে সি· আই· এ-র ডিরেক্টর ক্যাসেকে সেনেটর গোল্ডওয়াটার বলছেন, 'বিল, আমরা কী করে এই বৈদেশিক নীতি সমর্থন করি, যখন জানিই না রেগন কী করছে! নিকারাগুয়ার বন্দরে মাইন বসানো? এ তো স্পষ্ট আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন! এ তো যুদ্ধ ঘোষণা ! আমি জানি, এর অন্য কী ব্যাখ্যা আছে!'

—নিউ টাইমস

সুপারস্টার

ধর্ম যতোই পুরোনো আফিম হোক না কেন, কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ভোল পাল্টাতে হয়। পোপও বদলান। যেমন বর্তমান পোপ একজন নাট্যকার, অনেকেই জানেন না। লণ্ডনে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিছুদিন আগে তিনি ভিডিও-র উপকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন বলে জানা গেল। ভাটিকানে, পোপের আদেশে, ভিডিও সেন্টার খোলা হয়েছে। তারা পোপের অনুমতিক্রমেই সারা পৃথিবীর কাছে ভিডিও প্রোগ্রাম বিক্রি করে। এই ইস্টারে পোপের ধর্মসভা পরিচালনা ভিডিও-তে দেখেছেন অনেক মানুষ। ভিডিও সেন্টারের প্রথম নিবেদন শেষ—নাম, 'দ্য পারডন'। পোপের আততায়ী মেহ্‌মেত আলী আগ্‌কা ও পোপের মিলন দৃশ্য তোলা আছে এতে। সারা পৃথিবীতে এই ক্ষমা বেচা হবে অচিরেই।

—সানডে অবজারভার
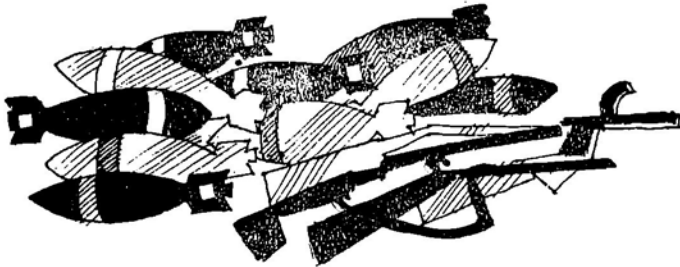
নরহত্যার সমৃদ্ধ উপকরণ

দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রি করা চলবে না—এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ বেশ কিছুদিন আগে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন নানাভাবে ঐ বর্ণবিদ্বেষী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, অধিকাংশ সভ্য দেশই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে না। কিন্তু এই দুটি দেশের অপ্রত্যক্ষ সহায়তায় দক্ষিণ আফ্রিকা এখন অস্ত্রে কেবল স্বয়ম্ভরই নয়, উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে। ফলে, আশেপাশের কিছু আফ্রিকার দেশকে তারা অস্ত্র পাঠায় গোপনে। ভালকিরি মিসাইল লনচিং সিস্টেম, র‍্যাটেল আরমারড ট্রুপ ক্যারিয়ার, লুক-এ্যাণ্ড-শ্যুট কুকরি, এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল এদের উন্নত অস্ত্রগুলোর কিছু।

—জেন সামরিক সমীক্ষা

খাণ্ডব দহন

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এক বিধ্বংসী খবর এই কিছুদিন আগে মাত্র জানা গেছে। ইন্দোনেশিয়া বোর্নিও-র কিলামানটান জেলাতে ১৩,৫০০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই অগ্নিকাণ্ড গত বছর ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে হয়। প্রায় লেবাননের থেকেও এলাকায় বড় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাবানল আরও চাগিয়ে তোলে নরম কয়লার ভূগর্ভস্থ সঞ্চয়। এই আগুনে এমন সাংঘাতিক ধোঁয়া ওঠে আকাশে যে ২৮০ মাইল দূরে সিঙ্গাপুর বিমানঘাঁটির বিমানগুলোকে অন্য পথে পাঠানো হয়। এই ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যক্ষ কারণ জানা যায় নি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে, 'এল নিনো' নামে এক সমুদ্র স্রোতের খামখেয়ালী ব্যবহারে স্বভাবত আর্দ্র এই এলাকা গত বছর দুই ধরে প্রবল খরার কবলে, আগুনের এটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।

—অবজারভার

চামড়া ঢাকা মানুষ

বৃটেনে বর্ণবিদ্বেষ এখন খুব বিশ্রী আকার নিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের যে কোনো মানুষই তাদের শত্রু। এমন কি যাঁরা বহুদিন ধরে সেখানে রয়েছেন তাঁরাও অবাঞ্ছিত। কিন্তু এশীয়রা এখন এই বর্ণদ্বেষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মুসলিমদের 'হালাল' মাংস সরবরাহ করছেন। মুসলিমরা এতে প্রতিবাদ জানিয়েও কোনো ফল পান নি। তাই তাঁরা 'শাড়ি স্কোয়াড' নামে এক দল গড়ে নিগৃহীত এশীয়দের নানাভাবে সাহায্য করছেন। কর্তৃপক্ষ যাদের ফেরত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে—শাড়ি স্কোয়াড তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

—সানডে অবজারভার

পূর্ণেন্দু পত্রী

সূর্য কয় প্রকার ?
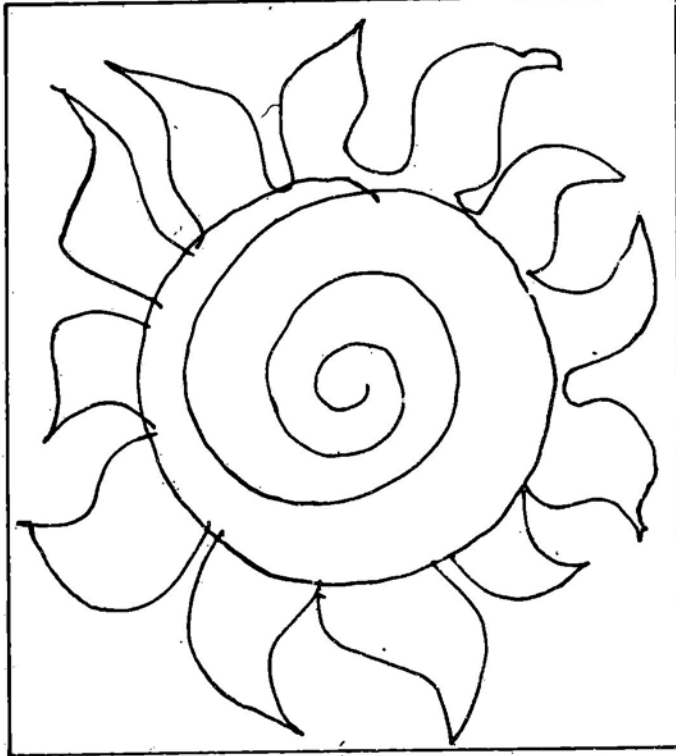
ছেলেবেলার সূর্য আর ১৯৮৪-র এই সূর্য কি এক ? গত কদিন রোদে-পোড়া শরীর আর ঝলসে-যাওয়া মনের ভিতরে অষ্টপ্রহর বেজে চলেছে এই একটাই প্রশ্ন। সন্দেহ নেই এ প্রশ্ন অনেকের কাছেই ঠেকবে হাস্যকর। এমনকি শিশুরাও হেসে উঠতে পারে খিলখিলিয়ে। কারণ এখনকার শিশুরা জন্মেই খবরের কাগজ পড়ে, সিনেমা ম্যাগাজিন ঘাঁটে, আকাশবাণী শোনে অথবা দূরদর্শন দেখে। ফলে পৃথিবীতে অথবা মহাকাশে সূর্য যে সবেধন লালমণি একটাই এই জলের মতো সত্যটা অজানা নয় তাদের কাছেও। শিশুদের সমর্থনে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরাও চোখ টিপে হেসে নেবেন এক ঝলক মুচকি হাসি, অনুমান করে নিতে পারছি সেটাও। তবুও প্রশ্নটা নাছোড়বান্দা। তাড়ানো মাছির মতো অনেকটা, পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসে আবার।

ঠিক এই সময়েই হাতে এল ভেলিকোভস্কির 'ওয়ার্ল্ডস ইন কলিশন'। সারা বিশ্বে তুমুল সাড়া জাগানো বই। এক কথায় এ বইয়ের মূল বিষয় বারংবার ঘটে-যাওয়া যে-সব মহাজাগতিক সংক্ষোভ থেকে আমাদের আজকের এই সৌর জগতের জন্ম, প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে তারই অনাবিষ্কৃত নিদর্শনের প্রমাণ। ঐ বইয়েরই এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের নাম 'দি সান এজেস'। তাতেই জানতে পারি, প্রাচীন মানুষের, বিশেষ করে মেক্সিকোর মায়া-সভ্যতার মানুষদের, বিশ্বাস ছিল একাধিক সূর্যে। আগুনে, অগ্ন্যুৎপাতে, বন্যায়, ভূমিকম্পে যতবার ঘটেছে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ততবারই উঠেছে নতুন নতুন সূর্য। এইভাবেই ওয়াটার সান, আর্থকোয়েক সান, ফায়ার সান, হ্যারিকেন সান। মেক্সিকোদের হিসেবে মোট সূর্যের সংখ্যা পাঁচ। 'সিবিলাইন' গ্রন্থে সংখ্যাটা বেড়ে গিয়ে নয়। সেখানকার হিসেবে সাতটা সূর্য জন্মে মরে গেছে। দুটো বাকি আছে এখনও। ভারতীয় হিসেবেও সূর্যের সংখ্যা সাত। ভেলিকোভস্কি থেকেই উদ্ধৃত করছি তার প্রমাণ পত্র।

"বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ 'বিশুদ্ধি মাগগ'-তে 'বিশ্ব-চক্র' বিষয়ে একটি

অধ্যায় আছে। 'বিনাশ তিন ধরনের জলে বিনাশ, আগুনে বিনাশ, বায়ুতে বিনাশ।' মহাপ্লাবনের সেই বিপর্যয়ের পরে 'অবিরাম বৃষ্টিধারার অবসান হলে, দ্বিতীয় একটি সূর্য উদিত হলো।' এর মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবী ঢেকে ছিল বিহ্বল অন্ধকারে। 'দ্বিতীয় সূর্য উদিত হলে দিন রাত্রির কোনো প্রভেদ থাকে না'। 'কেবল 'দারুণ নিদাঘ আসে পৃথিবীতে'।' পঞ্চম সূর্য উদিত হলে সমুদ্র ক্রমশ জলহীন হয়ে পড়ে। ষষ্ঠ সূর্য আকাশে এলে 'সারা পৃথিবী ছেয়ে যায় ধোঁয়ায়।' 'আরও একটি দীর্ঘ পর্ব হলে, দেখা যায় সপ্তম সূর্য আর গোটা ভূগোল জ্বলতে থাকে বিপুল দাহনে।' 'সাত সূর্যের অলোচনা' নিয়ে এই বৌদ্ধ বইয়ে আরও বহু পুরনো প্রসঙ্গের সূত্র আছে।"

তাহলে ব্যাপারটা কি থামলো এই জায়গায় যে বৌদ্ধ যুগেই উঠে গেছে সাত-সাতটা সূর্য। তার পর ? আমাদের এই পৃথিবী পার হয়ে এল যেসব শতাব্দী, তার ভিতরে কম করে আরও বিশ-বাইশটা সূর্যের বাঁচা-মরার কথা। ঝুট-ঝামেলার হিসেবে না গিয়ে আমরা অন্যভাবেও ভেবে নিতে পারি বিষয়টাকে। সারা পৃথিবী ধোঁয়ায় ছেয়ে গেলে কিংবা চোখের সামনের চতুর্দিক ক্রমশ জলহীন হয়ে পড়লে অথবা বসবাসের অথবা বেঁচে থাকার পরিবেশ দারুণ নিদাঘে চাপা পড়লে ভারতীয় বৌদ্ধরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারে কোনো একটি বিশেষ সংখ্যার সূর্যের আবির্ভাব, তারই অনুকরণে আমরাও কি এখন বলতে পারি না যে এখন চলেছে লোডশেডিং সূর্যের যুগ ? এইভাবে নামাঙ্কন করে যাওয়াটাও বিশেষ জরুরী। আজ থেকে শত শত বছর পরে দ্বিতীয় কোনো ভেলিকোভস্কি যখন তাঁর গবেষণার জন্য ঘাঁটতে বসবেন ভারতীয় নথিপত্র, তখন পেয়ে যাবেন একাধিক সূর্যের হদিশ। যথা

১। লোডশেডিং সূর্য।
২। স্মাগলিং সূর্য।
৩। ব্লাকমার্কেট সূর্য।
৪। ব্যুরোক্রাসী সূর্য।
৫। প্ল্যানিং সূর্য
৬। ইলেকশন সূর্য
৭। এডুকেশন সূর্য
৮। বার্থ কনট্রোল সূর্য
৯। ইকোলজি সূর্য
১০। নিউক্লিয়ার সূর্য
১১। ইত্যাদি ইত্যাদি

পাঠক হয়তো এতক্ষণে বুঝে নিতে পেরেছেন আমার প্রশ্নের যথার্থতা। এবং পাঠকের সঙ্গে আমিও পেয়ে গেছি আমার নাছোড়বান্দা প্রশ্নের উত্তর। আমাদের ছেলেবেলার আকাশে সূর্য ছিল। জ্বলন্ত সূর্যই। তার রোদের রঙও ছিল অগ্নিবরণ। অথচ সেই রোদই কখনও হয়েছে গায়ের জামা, কখনো মাথার মুকুট। গা পোড়েনি। সেই রোদেই আঁকসি দিয়ে আম পাড়া, গুলতি দিয়ে জাম, ইট-পাটকেলে জামরুল। সেই রোদেই আমতলার বালুচরী-ছায়ায় খেলাঘরের পুতুল, রাস্তার মোড়ে বাঁশ-বাখারী নিয়ে রাজা-সাজা যাত্রার রিহার্সাল, পেয়ারা তলায় কুকুর পোষা, নেভানো উনোনের আঁচে তেঁতুল-বিচি পুড়িয়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে অফুরন্ত টে টে। খর রোদের দুপুর গুলোয় ঘুঘু ডাকলে স্তব্ধতা হয়ে উঠতো দ্বিগুণ। রসকষহীন কাকের ডাকে মনে হতো এখুনি ফেটে চৌচির হবে পায়ের তলার মাটি। রোদ যত প্রখর, ঝিঙে ফুলে হলুদ ততই জমজমাট। তখন জানতুম না যে এই হলুদই সেই লেমন ইয়েলো যা ছিল ভ্যান গগের প্রাণাধিক। ছেলেবেলা বাদ দিয়ে কৈশোরে তাকাই যদি, তখনও কি সত্যি খান্ খান্ হয়েছি কোনদিন আগুনে-রোদে ? মনকে জিজ্ঞেস করলে মন বলে ওঠে, ছিঃ। বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরের স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটা কি মোড়া ছিল কালো ছায়ার ত্রিপলে ? স্কুলে টিফিনের ঘণ্টা বাজতো কি দুপুর রাতে ? নাকি রাত-দুপুরে শুরু হত মাঠের ফুটবল, আটচালার গাজন, ২৫ বৈশাখের রবীন্দ্র জন্মোৎসব ? আগুন-জ্বালানো দুপুর জুড়েই তো ছিল কৈশোরকালের দিগ্বিজয় এবং সাম্রাজ্যবিস্তার। ঠিক ঠিক, ঠিক। কিন্তু কখনো মনে হয়নি কেন যে সে অসহ্য, জীবনযাপনের প্রতিবন্ধক সে, স্বাস্থ্য এবং মনের প্রগতির পক্ষে সংহারক ?

যে যাই বলুক, ছেলেবেলার সূ আর ১৯৮৪-র এই সূর্য সত্যি সত্যি এক নয় আদপেই। ▢

অরুণ মিত্র

সামান্য জীবনমৃত্যুর কাহিনী
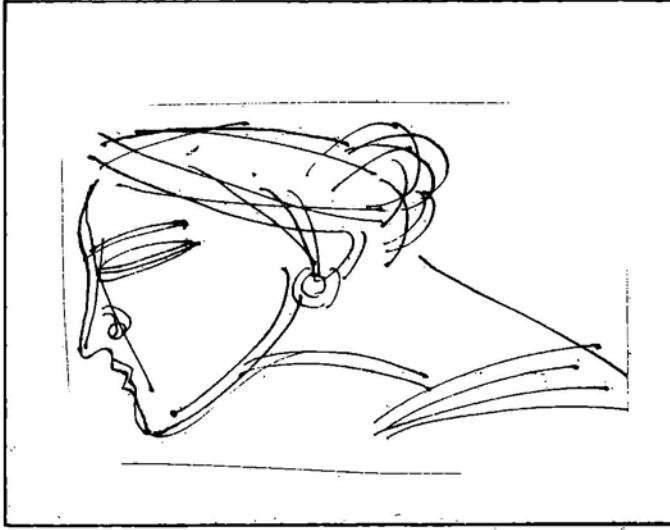
মার এ-লেখায় তার নাম
। যাক বিমলা। সে ছিল
বাদের মেয়ে। ঐ শহরেই
দর বাড়িতে কাজ করতে এল
সুঠাম শরীর, চোখা নাকমুখ।
ঃ ভাবতাম তাকে যদি না তার
হলে মাইজী বাবুজীকে দেখবার
এসে উপস্থিত হত।
গুলো ছেলেপুলের মা ছিল
কিন্তু তার অঙ্গে যৌবনের ছোঁয়া
কিছু ছিল। বয়েস হবে
শ ছত্রিশ। বিমলার স্বামী রিকশা
তবে মানুষটা একটু
প্রিয় আর নেশাভাঙও বেশ
যে-কারণে সে রিকশা রোজ
রে না। একদিন যদি রোজগার
ভালো হল তো পরদিন ছুটি,
ঘরে বসে মৌজ। সুতরাং
আয়ের ঘাটতিটা পূরণ করতে
সেজন্যেই বিমলাকে চাকরি
হল আমাদের বাড়িতে।
এমন অনেক বিমলাই আমার
নার চৌহদ্দির মধ্যে এসেছে,
প্রবাসেই নয়, এই
াতেও। স্বামী হয়তো রিকশা
বা মাছ বেচে বা মিস্ত্রিগিরি
কিন্তু সব দিন তার কাজে
ইচ্ছে করে না। তখন
খরচ মেটাতে হয় স্ত্রীকে
াসীবৃত্তির উপার্জন দিয়ে,
স্বামীর নেশার খরচও তা
প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়,
ও। মার অবিশ্যি একতরফা,
লে পতিদেবতার। প্রহারের
বতী স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে এমন
আমি শুনেছি এই শহর
য়। জানিনা এ ব্যাপারে
শ্রেণীবিভাগ চলে কিনা, তবে
খ মনে হয় বধূনির্যাতন যদি
ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর
য় তবে রোজগারী স্ত্রীকে
করা শ্রমজীবী শ্রেণীর
বৈশিষ্ট্য। এই ভিন্নতার
লক্ষণ কিন্তু একটাই
সমাজে নারীদের

আমাদের কাজে নিযুক্ত
কয়েক বছর। আমাদের
মনেই তার শরীর ভাঙতে
ল। সে খাওয়া-দাওয়া কী
না, তবে একবেলার কাজ
র যখন সে বাড়ি যেত
তখন আমাদের রান্না ভাত তরকারি তাকে দেওয়া হত। সে বলত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবে। কামাই সে কোনো দিন করেনি, অসুখের কথাও বলেনি, তবে তার ক্ষিপ্রতা স্পষ্টতই কমে আসছিল, এবং সন্ধের দিকে, বিশেষত শীতকালে, তার বাড়ি ফেরার জন্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করা যেত। এলাহাবাদে শীত পড়ে প্রচণ্ড। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে ভোরবেলাতেই সে কাজে আসত, গায়ে থাকত শুধু সুতিবস্ত্র। অবিশ্যি কিছু জামা তাকে দেওয়া হয়েছিল। ওখানে আমি সুতির কাপড়ে শীত ঠেকাতে রিকশাওয়ালাকেও দেখেছি। আমি রিকশায় বসে আছি, আমার পরনে মোটা পশমের প্যান্টকোট, নিচে পশমের সোয়েটার, পায়ে পশমের মোজা, তবু আমি হিহি করছি, আর যে-লোকটা রিকশা চালাচ্ছে তার গায়ে শুধু একটা সুতির ফতুয়া, পরনে হেঁটো ধুতি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল। প্যারিসের চালচুলোহীন ক্লশার-ও (clochard) তার চাইতে ভাগ্যবান মনে হত, কেননা নিঃস্ব ফরাসী ভবঘুরেকে ঠাণ্ডায় পশমঢাকাই দেখেছি। রিকশায় বসে নিজেকে কেমন অপরাধী বোধ করতাম। অথচ বুঝতাম এই নেতিবাচক অপরাধবোধ দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান হয় না।

এই রিকশাওয়ালাদের শরীরের মধ্যে কোথাও যেন গনগনে আঁচ আছে, আমার এমন ধারণা হত। আমার মনে পড়ে যেত দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিতের অনেককাল আগের এক উক্তি। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করি। শীতকালে একদিন দাদাঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন। সেবার বেজায় শীত পড়েছিল, কিন্তু তাঁর গায়ে শুধু একটি সুতির চাদর জড়ানো। তাঁর কথা শোনবার জন্যে চারপাশে যারা জড়ো হয়েছিল তাদের সকলের শরীরে পশমের আচ্ছাদন। আমাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন "দাদাঠাকুর, এই ঠাণ্ডায় আপনার শীত করে না?" উনি উত্তর দিলেন "না।" অতঃপর "কেন জানো?" বলে আস্তে আস্তে উল্টো দিকে মোচড় দিয়ে ট্যাঁক খুলতে লাগলেন, অবশেষে সেখান থেকে একটি তামার পয়সা বের করে আমাদের দেখিয়ে বললেন "এই পয়সার গরমে।" রিকশাওয়ালাদেরও নিশ্চয় এমন পয়সার গরমই ছিল।

গরম দেখেছি বিমলার শরীরেও, একেবারে চূড়ান্ত। সে তখন অন্তিম শয্যায়। সেবারই সে কামাই করল প্রথম এবং শেষ বার। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলাম। খাটিয়ার ওপর বিমলা শুয়ে ছিল। আমাকে যেন চিনতে পারল, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। বড্ড জ্বলুনি শরীরে, বিশেষত পেটে। বেশ বুঝতে পারলাম আর বেশিক্ষণ তাকে এ-যন্ত্রণা শুধু নয়, এই পৃথিবীতে থাকারই যন্ত্রণা সইতে হবে না। এবং খোঁজখবর করে যা জানলাম তাতে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বরাবরই সে সারা দিনে খুব অল্পই খেত। আমাদের বাড়ি থেকে যে-খাদ্য সে নিয়ে আসত, তা ভাগ করে দিত তার বাচ্চাদের মধ্যে। কিন্তু নিজের ক্ষিদে তো থেকেই যেত। সেটা চাপা দেওয়ার জন্যে নেশা ধরেছিল, সম্ভবত বে-আইনী চোলাই। পয়সার অভাবে তা জোগাড় করতে না পারলে খেত স্পিরিট। বুঝলাম শীতকালে এই গরমের টানেই সে সন্ধের দিকে বাড়ি ফেরার জন্যে অত অস্থির হত। কিন্তু যে-পেটে খাদ্যের পাহারা ছিল না, তাকে ধ্বংস করতে এ-নেশার বেশি সময় লাগার কথা নয়। বিমলার মৃত্যু তো আসলে অনাহারে মৃত্যু, সরকারী অথবা ডাক্তারী বিবৃতি যাই বলুক না কেন।

এলাহাবাদে এক সুপরিচিত বাঙালী সাধক ছিলেন। তিনি ঘটনাটা শুনে বলেন যদি কিছুদিন আগেও তিনি জানতে পারতেন তাহলে বিমলাকে বাঁচানো যেত, কারণ নারীদের কর্মসংস্থানের এবং ভালো উপার্জনের একটা সংগঠন তাঁর আছে। এ-কথায় গৃহকর্ত্রী তাঁকে নিবেদন করেন "কিন্তু ক'জনকে আপনি বাঁচাবেন? আমাদের বিমলাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন, হয়তো আরো কয়েকটি বিমলাকে। কিন্তু বিমলার সংখ্যা তো অগণন। আপনার সংগঠন কি তাদের সবাইকে বাঁচাতে পারবে।" উনি চুপ করে রইলেন।

বাস্তবিক, আসল ব্যাপার দেশজোড়া দারিদ্র্য। যাকে বলা হয় দারিদ্র্যসীমা, তার একটু এধারে বা ওধারে বাঁচামরায় তার প্রকাশ। এই এলাকায় কখন কোন উপলক্ষে কে বাঁচতে গিয়ে মরে যাবে তা নির্ণয় করার সাধ্য কার? এটা ডাক্তারী চিকিৎসার বিষয় নয়। এই সীমারেখা যতদিন না লুপ্ত হবে ততদিন তার একটু এধারে বা ওধারে অসংখ্য অকালমৃত্যু ঘটতেই থাকবে। কোনো ব্যক্তিগত উপচিকীর্ষায় তা রোধ করা যাবে না। □

অরুণ সেন

আধুনিক বাংলায় যে সব মেয়েরা কবিতা লেখেন, তাঁদের কেউ কেউ একসময় 'মহিলা কবি' হিসেবে উল্লেখ করলে খুবই রেগে যেতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, কোনো কবিকে 'মহিলা' বলে উল্লেখ করলে মনে হয় যেন তাকে ঠিক খাঁটি কবি হিসেবে ধরা হচ্ছে না, একটু ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কবির আবার পুরুষ-মহিলা কী ? এটাও এক ধরনের নিকৃষ্ট পুরুষোচিত গোঁড়ামি।

একসময়ে মেয়ে লেখকদের আলাদা করে মেয়ে বলেই একটু খাতির করা হত ঠিকই, কিন্তু এখন আর তার দরকার আছে কি ? রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কেতকী কুশারী ডাইসন, দেবারতি মিত্র এবং আরো অনেকে--তাঁদের কবিত্ব স্বীকার করার জন্য মনে রাখার দরকার হয় না যে, তাঁরা মহিলা। মেনে নিতে পারি যে কবিতার আধুনিকতাকে তাঁরা কমবেশি বাড়িয়েই চলেছেন। কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্য বিভাগে, যেমন গল্প বা উপন্যাস বা নাটকে কিন্তু এরকম মেয়ে লেখকের নাম তেমন খুব একটা করা যায় না। শুধু কবিতাতেই।

কিন্তু তাঁদের মহিলা-কবি হিসেবে নাম করলে সত্যিই কি পুরুষালি উন্নাসিকতাই শুধু প্রশ্রয় পায় ? শুধুই তাঁদের অকাবণজীবতাত্ত্বিক পরিচয় মেয়ে হিসেবেই তাঁদের আবেগ-অনুভূতির কোনো কোনো দিকের বিশিষ্টতা ও নির্দিষ্টতা কি প্রকৃত কবিত্বেরই জমি হতে পারে না ? হয় নি কি তাই ? আমরা যদি কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে কোনো কবির অন্তরঙ্গতা বা কোনো জীবিকার সঙ্গে কোনো পুরুষ লেখকের সান্নিধ্য তাঁর লেখার পক্ষে অনুকূল মনে করি, তবে কোনো মেয়ের নিজস্ব অভিজ্ঞতার জগৎকে মেয়ে হিসেবেই প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, তাতে লজ্জিত হওয়া কেন ?

ঠিক তাই। আজকে আবার উল্টো হাওয়ায় ভাবা শুরু হয়েছে, মেয়েদের সাহিত্যকে যেন মেয়েদেরই সাহিত্য বলে চেনা যায়, সেটাই তো তাঁদের আত্মপরিচয়ের জায়গা। নবনীতা দেবসেন জানিয়েছেন, '"মেয়েলি হাতের পাঞ্জা ছাপ থাকা" মেয়েদের সাহিত্য পশ্চিমী দেশের ফেমিনিস্ট মুভমেন্টের অন্যতম জরুরি দাবি।'

এই সময়েই হাতে এসে পড়ল আরেকজন মেয়ে কবির

কবিতা--'অপরাজিতা রচনাবলী'। রাধারাণী দেবী যে অপরাজিতা ছদ্মনামে কবিতা লিখে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন একদা, এ নিয়ে অনেক গালগল্পই জানা ছিল--দু একটা কবিতা যে পড়িনি তাও নয়। কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, একসঙ্গে তাঁর কবিতাগুলি এর আগে এমন করে পাই নি। আর এই আবিষ্কারে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ি বইটির প্রকাশক, রাধারাণী দেবীরই কন্যা, নবনীতা-র কাছে। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

নবনীতা ভূমিকায় বলেছেন, 'অপরাজিতা রচনাবলী প্রকাশের মুখ্য কারণ বিস্মৃতপ্রায় অপরাজিতা দেবীকে পুনরুদ্ধার করা ততটা নয়, যতটা নিজেদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আমাদেরও সূক্ষ্ম, সচেতন, একপ্রস্থ "মেয়েদের সাহিত্য" রয়েছে, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি যার বয়স, যেখানে শুধু বাঙালি মেয়েদের সামাজিক, পারিবারিক মানসিক পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মধ্যে শুধুই প্রেম নয়, শুধুই বাসরঘরের কঙ্কনকিঙ্কিনী নয়, আছে বিচিত্র জীবনের কাহিনী, জটিল অশ্রু-হাসিতে জড়ানো, নানা শ্রেণীর নানা ধরনের নারী চরিত্রের পোর্ট্রেট। এবং শুধু তাই নয়, এই নারী চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়েই ভেসে উঠেছে তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজের রূপরেখা।'

এ প্রসঙ্গে আরও একটা দামি কথা বলেছেন নবনীতা। মেয়েদের সাহিত্য মানে তো শুধু 'নারীহৃদয়ের হাহাকার' নয়, তার আলাদা চারিত্র, আলাদা ভাষা, আলাদা শৈলী--'স্ত্রী-পুরুষে শিল্পগত কোনো পার্থক্য'। অপরাজিতা দেবী-র ভাষার এই মেয়েলিত্ব--বিভিন্ন মেয়ে চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে শব্দছন্দের ছাঁচ--তার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে যাই। প্রমথ চৌধুরী যে একদা বলেছিলেন, 'মেয়েদের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই', তার মুখের মতো জবাব দেওয়ার জন্যই নাকি লেখা কবিতাগুলি। যোগ্য জবাব। কিন্তু সেই উপলক্ষ বা ছোট জেদ ছাপিয়ে গেছে, নবনীতা-র সঙ্গে একমত হয়ে তখন আমরা বলি, 'জগৎ জুড়ে নারীত্বের এই আত্মদর্শনের লগ্নে অপরাজিতার একটি আলাদা মূল্য আছে।'

নারীর কত বৈচিত্র্য, একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের কত ধরন--কত বয়সের, কত পরিবেশের ! নারী এখানে একেক কবিতায় একেক রকম--বন্ধু সখী সন্তান মা স্ত্রী শ্যালিকা ননদিনী বৌদি পিসিমা মাসিমা কাকিমা। স্ত্রী হিসেবে পরিচয়ও কি একরকম ? কখনো নবপরিণীতা লজ্জাশীলা, কখনো রুগ্ন গৃহকর্তার সেবাপরায়ণা অভিজ্ঞা, কখনো কখনো বা ঝগড়ুটে প্রগলভা। কখনো সত্যিকারের ঝগড়া, কখনো বানানো ঝগড়া। যেন শেষ নেই। অথচ সব মিলিয়ে বাঙালিনীও বটে।

আর সেই বাঙালি মেয়েরই চোখ দিয়ে দেখা বাংলাদেশের সমাজ, তার মানুষজন, তার রুচিভাবনা। ভিন্ন ভিন্ন জীবিকার মেয়ে, যেমন তাঁতিনী বা ঠিকে ঝি, সবার কথা আছে ঠিকই--কিন্তু সবচেয়ে বেশি যারা মনে রয়ে যায়, দাগ কাটে, তারা কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার সেকালের উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা সম্পন্ন সমাজের মেয়েরাই। তাদের ঢং ও ঠমক যেমন ভাবে ফুটে উঠেছে, তার তুলনা একমাত্র 'চোরাবালি' কবিতার বইটিতে পাওয়া যায়। ঐ বইয়ের কবির বা কবিতার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি তুলনা করতে যাচ্ছি না--দুয়ের দুস্তর তফাৎ সম্পর্কে কে না সচেতন ! কিন্তু স্মরণীয় যে, অপরাজিতা দেবীর 'আঙিনার ফুল' এবং 'চোরাবালি'-র তুলনীয় কবিতাগুলি প্রায় একই সময়ে লেখা হয়েছিল। 'আঙিনার ফুল'-এরই একটি কবিতা 'স্ক্যাণ্ডাল' থেকে প্রথম কয়েকটি লাইন পড়ি : 'রঞ্জা রায়ের ব্যাপার কিছুই জানিসনে তুই; শোন--/কম মেয়ে নয় আইবুড়ো ওই ধাড়ি !/ওর যে খবর সব জানি--ও রজত রায়ের বোন,/ডোভার রোডের মোড়েই ওদের বাড়ি।'

অপরাজিতা দেবী-র কবিতায় নারীমুক্তির কণ্ঠস্বরই কি শোনা যায় না, যখন আমরা পড়ি, ঠাট্টার রঙ্গে হলেও--'কিসের খাতির এত ? কথা রাখে না যে,/তার বাড়ি কেন মিছে খেটে মরি বাজে ?/আমি যেন কেউ নই ! উনিই মালিক ?/রোসো, আজ বোঝাপড়া করে নেবো ঠিক।' কিংবা 'দাসীবাঁদি নই কারো...ডেকো নাকো আর।'

নারীর প্রেমের বিচিত্র রূপ ও নারীর নানা মূর্তির মধ্যেও আমার হঠাৎ করে, বেশি করে চোখে পড়ে যায় ওঁর 'সচিব'-এর মতো কোনো কবিতা। এমন এক স্বামী যিনি চাকরি খোয়ানোর দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, চল্লিশেই নিজেকে মনে হচ্ছে বুড়ো, সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বদা বিচলিত, তাঁকে তাঁর স্ত্রী জানাচ্ছে : 'তোমারো চাকরি যায় যদি এতে শেষে,/যাবেই না হয়--চিন্তা কিসের অতো ?' পরামর্শ দিচ্ছে 'ওষুধের ছোট দোকান একটা খুলে--/চাকরি করার দুর্ভোগ যাও ভুলে/ভারি তো মাইনে, গোটা সত্তর টাকা !' কী করে পুঁজি মিলবে ব্যবসার ? 'কেন ? গয়নার রাশি রাখা/কিসের জন্যে ? কাজেই যদি না লাগে ?' এবং শেষকালে : 'এ বাড়ির যদি ভাড়া দাও আধখানা,/গোটা কুড়ি টাকা মাসে ঠিক পাবো জানা/মনে জোর নিয়ে লাগো, নিশ্চয়ই হবে।'

এর মধ্যে আমরা কি সেই চেনা 'কাজের মেয়েটি'কেই পাই না, জীবিকার লড়ায়ে যে রঙ্গিলা 'আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী' ? আধুনিক নন্দনের এমন প্রতিমা রাধারাণী দেবী এতকাল আগে আমাদের কাছে এনে দিয়েছিলেন, আমরা তা ভুলে বসেছিলাম ? ☐

সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার একজন প্রবক্তা

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সাহিত্য-বীক্ষা । নীরেন্দ্রনাথ রায় । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৩ । সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ । ২৫ টাকা ।

১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাতীয় সত্তা সন্ধানের সমগ্র সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন তাকে মানতে না পেরে নীরেন্দ্রনাথ রায় যে কী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, অনুমান করতে পারি ।

আমাদের ছাত্রজীবনে, চল্লিশ দশক এবং তার পরেও অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতমহল সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন, এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। সজীব জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী দু একজন ছাড়া এই জগতের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে মার্কসীয় ব্যাখ্যা ছিল সাহিত্যের তথাকথিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসত্তার ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, পদ্মবনে মত্ত হস্তীর প্রবেশের মতো। আসলে, সাহিত্যকে সমাজসভ্যতার পটে বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টিই ছিল বিরল। আমাদের মতো সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছে এ বিষয়ে বইপত্রও খুব সুলভ ছিল না। কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স, জর্জ টমসন, প্লেখানভ প্রভৃতির রচনা, ব্রিটেনের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত পত্রিকা 'মডার্ন কোয়ার্টার্লি', কিংবা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি'র প্রবন্ধগুলি কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করে পড়তে হত। জ্যাক লিণ্ডসের 'দি অ্যানাটমি অব দি স্পিরিট' ছিল অত্যন্ত দুর্লভ (এখনও বোধহয় তাই)। ১৯৫১ সালে জর্জ লুকাচের 'দি স্টাডিজ ইন ইয়োরোপিয়ান রিয়ালিজমে'র ইংরেজি অনুবাদ প্রথম কলকাতার পাঠকদের হাতে এসে পৌঁছয়। স্মিরনভের শেকস্পীয়রের মার্কসীয় বিশ্লেষণও উৎসাহী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আর্নল্ড কেটল-এর রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় আরও কিছু পরে, তাঁর উপন্যাস-বিষয়ক বইটিতে গভীর সাহিত্যবোধের সঙ্গে সমাজ পটভূমির মার্কসীয় বিশ্লেষণের সমন্বয় আমাদের মনে গভীর ছায়া ফেলেছিল। এদেশের মার্কসীয় সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণের ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার একমাত্র মাধ্যম ছিল 'পরিচয়' পত্রিকা।

কোনও খ্যাতি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা না রেখে 'পরিচয়ের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে যাঁরা মার্কসীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নানা প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রেখেছেন গভীর আদর্শনিষ্ঠায়, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি অ্যাকাডেমিক স্তরে সাহিত্য

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদের অনুশীলনী করেননি, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মীরূপেই মার্কসবাদের চর্চা করেছেন। ১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে যখন রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাতীয় সত্তা সন্ধানের সমগ্র সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন তাকে মানতে না পেরে নীরেন্দ্রনাথ যে কী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাই নিয়ে তিনি কোনও রকম বেসাতি বা নাটকীয় আত্মপ্রদর্শনীর দিকেও ঝোঁকেন নি। ১৯৫৫ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি নীরেন্দ্রনাথ রায়ের ছটি প্রবন্ধের সংকলন 'সাহিত্যবীক্ষা' প্রকাশের দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তার বহুলাংশে পরিবর্ধিত এই নতুন সংস্করণটি প্রকাশ করে সমাজসভ্যতার অঙ্গ হিসেবে সাহিত্য বিষয়ে যাঁদের ব্যাপ্ত ও সজীব জিজ্ঞাসা আছে তাঁদের কাছে ধন্যবাদার্হ হলেন। পর্ষদ সংস্করণে নীরেন্দ্রনাথের তিরিশটি প্রবন্ধ, তেরটি সমালোচনা প্রবন্ধ এবং পরিশিষ্ট অংশে পল্লীসমাজ ও মনোমোহন ঘোষের ওপর দুটি ইংরেজি রচনা, একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বাংলায় ম্যাকবেথ' (নীরেন্দ্রনাথ রায়ের ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদের রণজিৎ গুহকৃত সমালোচনার উত্তর), জীবনপঞ্জি, সংকলনবহির্ভূত বিবিধ রচনার তালিকা ও প্রবন্ধ নির্দেশিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দুটি ভূমিকা আছে গোপাল হালদারের 'নিবেদন' ও দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'নতুন পৃথিবীর পথসন্ধানী নীরেন্দ্রনাথ রায়'। গোপাল হালদার বলেছেন, প্রৌঢ়ত্বের প্রথম পাদেই নীরেন্দ্রনাথ মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই সময় থেকেই 'একনিষ্ঠ অনুরাগে মার্কসীয় তত্ত্ব ও তদনুগামী সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম-এর নীতিতে তিনি বাংলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল বিভাগে অবিচলিতভাবে বিচার বিশ্লেষণে অগ্রসর।' দেবীপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'নীরেন্দ্রনাথ মার্কস, এঙ্গেলস, বেলিনিস্কি, লুনাচারস্কি, চের্নিশেভস্কি এবং কডওয়েল, আরাগঁর ধারাকে বিশেষভাবে মান্য করেছেন। জ্দানভের নির্দেশও তৎকালে অমান্য করেন নি।'

রবীন্দ্রনাথ, মেঘনাদবধ কাব্য, শেকসপীঅর, পুশকিন, গোর্কি, ল্যেফ তলস্তোই, রোম্যাঁ রোলাঁ, সাহিত্যতাত্ত্বিক বেলিনিস্কি, লুনাচারস্কির নন্দনতত্ত্ব, ইয়েট্স-এর কবিতা, বাংলায় হার্ডার ও গেটে, লুক্রেশিয়াসের কবিতা—নীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের এই সমস্ত বিষয় থেকেই বোঝা যায় তাঁর অধ্যয়ন ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা কত বিস্তৃত ছিল। 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব' প্রবন্ধে অধ্যাপক রায় 'বিদায় অভিশাপ'-এর যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে এই কাব্যনাট্যের এক নতুন অর্থ আমাদের কাছে ধরা দেয়, কচ দেবযানীর প্রেম আমাদের কাছে এক বৃহত্তর মানবিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে কচ দেবযানীকে ফিরিয়ে

অভিশাপ দেননি, সামাজিক সত্যকে স্বীকার করেছেন, সেটি হল, বিজিত জাতি অপেক্ষা বিজয়ী জাতির সামাজিক পরিবেশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ; তাই কচের শেষ উক্তি এই যে নিজের স্বাভাবিক পরিবেশে দেবযানী একদিন হৃদয়ের জ্বালা কাটিয়ে উঠে আবার আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, আর তাঁর ক্ষত বহন করে কচকে স্বদেশে ফিরতে হবে কর্তব্যের আহ্বানে—'রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাকামী মন সে যুগের বাংলাদেশে কচের মতো স্বদেশপ্রেমিক যে বিদ্যার্থীর স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহার আবির্ভাব আসন্ন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা প্রাচীন কাহিনীকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে ইতস্তত করে নাই।' (পৃ ১৮)। 'মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজবাস্তবতা'-য় লেখকের মধুসূদনের বাংলাভাষার কথ্য রীতির অনুগামী ভাষা ও ছন্দের বৈপ্লবিক পরীক্ষার বিশ্লেষণও মনোজ্ঞ। 'কবিতায় বক্তব্য' প্রবন্ধে তিনি মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর প্যারাডকস্ সঠিকভাবেই নির্দেশ করেন 'প্যারাডাইস লস্টে 'তাই ফুটিয়াছে দরিদ্র নিপীড়িত পিউরিটান সমাজের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী মনোবৃত্তি ও তাহার চরম আশাভঙ্গ। ধর্মভীরু মিলটনের রচনায় তাই দেখিতে পাওয়া যায় এই প্যারাডকস্, তাঁহার ঈশ্বরে পড়িয়াছে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্টুয়ার্টরাজের প্রতিচ্ছায়া, ও তাঁহার শয়তান বিপ্লবী নেতৃত্বের সমস্ত বিভূতিতে বিভূষিত (পৃ ১৩৯)।

নীরেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাগুলির জনপ্রিয়তার একটি পরীক্ষায় পাঠকদের সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া 'সোনার তরী'র যে বিশ্লেষণ (কবিতায় বক্তব্য) কবির সঙ্গে তাঁর পাঠক-সাধারণের সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের ভিত্তিতে দিয়েছেন সেটি আমাদের চিন্তাকে উদ্দীপিত করে, বৃহত্তর সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতঘটিত অর্থের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। 'সোনার তরী'তে যখন ক্ষেতের সমস্ত ধান কেটে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তখন শ্রাবণ মেঘের অবতারণা করায় রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণশক্তির প্রতি যে কটাক্ষ করা হয়েছিল উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, কবির হৃদয়ে শ্রাবণের ঘন ম্লানিমা চাষীর বঞ্চিত জীবনযাত্রার ঘন কারুণ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে সারা বছর খেটে চাষী ক্ষেতে সোনার ধান ফলায়, আর নির্দিষ্ট সময়ে মহাজনের নৌকো এসে তার সমস্ত ফসল উজাড় করে নিয়ে যায়। একটিকে অন্যটির পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহার করার দুঃসাহস রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই নিগূঢ় বোধ থেকে, যে ব্যর্থতার চিত্র তিনি আঁকতে যাচ্ছেন সেটি কোনও বিশেষ চাষীর বাৎসরিক বঞ্চনার চিত্র নয়, বাংলা দেশের সমস্ত শিক্ষিত সমাজের ব্যর্থতার প্রতীক আর প্রতীক হচ্ছে সেই রূপক যার আবেদন প্রত্যক্ষ ও পর্যাপ্ত, যাতে বহু চিত্রের অস্পষ্ট অনুভূতি একত্র সমাহিত হয়ে ভাবযোগ্য হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনে ব্যর্থতা বহু ধরনের। চাষীর জীবনের মতো এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ব্যর্থতা আর কোনও শ্রেণীর জীবনে নেই। আর এই ব্যর্থতা এমনই ব্যাপক যে শিক্ষিত জীবনের খণ্ডিত ব্যর্থতা তার মধ্যে অনায়াসে নিজেকে নিমজ্জিত করে। তাই 'সোনার তরী'তে প্রকাশ্য বিষয়বস্তু ও তার পশ্চাৎপটের আবেগময় স্বতোবিরোধ বাঙালি পাঠকসমাজ যেন ইচ্ছে করেই লক্ষ করেনি, কবিতার ছন্দ ও মিলের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, আপন আপন ব্যর্থতার প্রকাশ কবিতাটিতে খুঁজে পেয়েছে।

জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত' ('অপরাজিত', পৃ ৪০০)—লেখকের এই একটি মন্তব্যেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত'র সীমাবদ্ধতা সার্থকভাবে নির্দেশিত। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের গুরুত্ব অ্যাকাডেমিক আলোচনায় যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি, সমাজ সভ্যতার বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সাহিত্যসৃষ্টির তাৎপর্য অনুধাবনের দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই তার কারণ। নীরেন্দ্রনাথ এই দুটি উপন্যাস নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা না করলেও তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্যেই বোঝা যায়। প্রায় বাহান্ন বছর আগে লেখা 'শেষ প্রশ্নে'র সমালোচনায় তিনি লিখেছিলেন, 'গোরার বিতর্কগুলি কাঁটার মতো উঁচিয়ে নেই, লতা-পাতা ফুলের সঙ্গে মিশে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতার সৃষ্টি করেছে,' চতুরঙ্গের মধ্যে তর্কের অংশ কতটুকু, অথচ বিশ্বসাহিত্যে কটা বই আছে যা তার চেয়ে বেশি করিয়া মানুষকে ভাবিতে শেখায়।' ('শেষ প্রশ্ন', পৃ ৩৯২)। উপন্যাসটি সম্বন্ধে তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টিগভীর মন্তব্যটিও স্মরণীয় 'নাটক না হইয়াও একটিমাত্র বাংলা পুস্তক অনাসক্ত কল্পনার সাবেগ স্ফুটনে শেকসপিরিয়ত্বের পর্যায়ে' পড়ে—রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ' ('ডোভার উইলসনের দি এসেনসিয়ল শেকসপিয়রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', পৃ ২২০)। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ও 'গণনায়ক'-এ ঔপন্যাসিকের যে ঐতিহাসিক, বিচারশীল দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে, যুক্তিনিষ্ঠ ও সজাগ সাহিত্যবোধেই অধ্যাপক রায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'বিজ্ঞানাচার্যের হৃদয়বত্তা'য় লেখক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের পটভূমিতে এই মনীষী-বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্ব ও মননের একটি মনোরম আলেখ্য তুলে ধরেছেন। 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধটির বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।

ভূমিকায় গোপাল হালদার যথার্থই বলেছেন, 'সাহিত্যে মার্কসবাদী বিচার এখনো সর্বদিকে সর্বক্ষেত্রে সুনিশ্চিত নয়।' সাহিত্যের নিছক সমাজতাত্ত্বিক টীকাভাষ্য রচনার বদলে লেখক ও তাঁর সামাজিক পরিবেশের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের জটিল সমগ্রতাসন্ধানী নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, বিশেষ দেশকালের সমাজ সভ্যতার গভীরতম রূপ বা অন্তর্গঠন সাহিত্যে যেভাবে উদ্ভাসিত হয় তার মর্মোদঘাটন এবং নতুন আলোকসম্পাতকারী গবেষণা যা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলে আমাদের চৈতন্যের বিস্তার ঘটায়—মার্কস-এঙ্গেলস-এর সাহিত্য বিষয়ক মতামত যেমন এই সৃজনশীল সাহিত্য সমালোচনার অবলম্বন হতে পারে, তেমনি তাদের যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করাও সম্ভব। নীরেন্দ্রনাথ রায় সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ এই দুটি উক্তি 'মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন যে বনিয়াদ ও উপরিতলের সম্বন্ধ মোটেই প্রত্যক্ষ নহে ; তাহার অস্তিত্ব নির্ধারণ করিতে হয় গভীর আলোচনায়, তাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় "শেষ বিশ্লেষণে"। সাহিত্য হইতেছে মূলত উপরিতলের ব্যাপার। যে সাহিত্য যত শ্রেষ্ঠ, সে-সাহিত্য সেই অনুপাতে বনিয়াদ হইতে উর্ধ্বে, সে-সাহিত্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা ততই দুরূহ' ('শেকসপীয়র প্রসঙ্গে', পৃ ১৭৩) এবং 'লেনিনবাদী সাহিত্যবিচারে প্রথম বিচার্য, অতীতের যে সাহিত্যিকের রচনা বিচার হইতেছে তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ, রাজনৈতিক মতামত নয়' ('বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা', পৃ ১২৮)। ব্যক্তির সৃষ্টিকর্মের নিজস্ব মূল্যনির্ধারণ, বিশেষত মহৎ সাহিত্যিকেরা কীভাবে তাঁদের কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেন তার বিশ্লেষণ এখনও জটিল সমস্যা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নীরেন্দ্রনাথ রায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণে যান্ত্রিকতাকে এড়াতে পারেন নি। তাঁর মতে, ইংরেজ শাসনের মধ্যস্থতায় বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল ('অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক আলোড়ন' —'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব', পৃ ৩), যদিচ তার ভিত্তি অতি শিথিল, বিস্তার বিলম্বিত ও খণ্ডিত। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন ভাবাদর্শ বুর্জোয়া আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী প্রসারের ফলে ভারতেও এসে পৌঁছল ব্রিটিশ বণিকের আবির্ভাবে, বাংলার মাটিতে তার মূল প্রোথিত হল ব্রিটিশ রাজের প্রতিষ্ঠায় ; বাংলায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রযুগের সংস্কৃতিসাধনা এই বিদেশাগত বৃক্ষের এদেশীয় ফুলফল, 'একই জিনাস-এর স্পীশিজ' (পৃ ৪)। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে তো দূরের কথা, স্বাধীনতার পরেও কি, যত ক্ষীণ বা দুর্বল হোক, আদৌ বুর্জোয়া সমাজবিপ্লব ঘটেছে এবং তার অঙ্গ হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের শক্তি অন্তত কিছুটা পরিমাণেও সঞ্চারিত হয়েছে ? এই প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালবিস্তৃত সাহিত্যকর্মের মহত্ত্ব, আত্মানুসন্ধানের যন্ত্রণায় নিজের

সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়াসের দুর্লভ চারিত্র ও প্রতিভার স্বাবলম্বন শক্তি এই জাতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বের সহজ সমীকরণে বোঝা যায় ? 'খেয়া'-'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'ব্লেক, এমিলি ব্রন্টি, বা ফ্রান্সিস টমসন যে মিসটিক স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের অনায়ত্ত।' (ঐ, পৃ ২৪)। সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য প্রদর্শনের যে উদ্দেশ্যেই হোক, এই ধরনের বিচ্ছিন্ন তুলনা—প্রাচ্যদেশের কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই ইউরোপীয় মিস্টিক স্তর বিচারের নিরিখ হিসেবে নির্দেশ করার সার্থকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। এই রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ পেয়ে এক উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সম্পর্কে অধ্যাপক রায় বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণে লেনিনের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি নাই' (পৃ ২৬)—লেনিনের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি কোনদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল ?

মার্কসীয় সমালোচনার নানা দিক সম্পর্কে নীরেন্দ্রনাথ রায় যেমন অবহিত ছিলেন—তেমনি বহু দিক সম্পর্কে তাঁর জানার সুযোগও ছিল না। একালে লুকাচ, লুসিয়েন গোল্ডম্যান, ফ্রাংকফুর্ট গোষ্ঠীর হার্বার্ট বেঞ্জামিন বা থিয়োডোর অ্যাডর্নো, গ্রামসি প্রভৃতির রচনা, স্ট্রাকচারালিজম ও ফিনোমিন্যালিজমের সঙ্গে মার্কসবাদ সমন্বয়ের প্রয়াস ইত্যাদি নানা কথাই আমরা শুনেছি এবং শুনছি। এই সমস্ত ধারা নিয়ে তর্কবিতর্কও চলছে, তবে ইংরেজি ভাষার ওপর নির্ভর করার ফলে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও সীমিত।

সাহিত্য সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণে যে মডেলই ব্যবহৃত হোক, ভারতবর্ষের সমাজ সভ্যতার বিশেষ রূপ ও তার সমস্যা আমরা যেন সকল সময়েই মনে রাখি, আর তাঁদের সব মতামত গ্রহণ করতে না পারলেও এক্ষেত্রে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের মতো পথিকৃৎ-দের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। □

সামাজিক মুখোশের বিরুদ্ধে আন্তরিক ঘৃণায় উদ্বেল

পার্থ মুখোপাধ্যায়

এ্যামবুশ। সুভাষ ঘোষ। ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা

রন্ধনশালা। বাসুদেব দাশগুপ্ত। বিদ্রোৎসাহী প্রকাশ, কলকাতা

একটি সাহিত্যগ্রন্থে প্রতিবাদ যেভাবে খুশি থাকতে পারে, কিন্তু কখনোই তা হয়ে উঠতে পারে না ব্যক্তিগত ঠেলাঠেলি।...আমরা একেও স্বাগত জানাতে পারতাম যদি ঐ মন্তব্যগুলি সুভাষের সাহিত্য-আদর্শ বিষয়ে আমাদের করে তুলত আরো ওয়াকিবহাল। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তা হয়ে থাকল হালকা রাগ থেকে উচ্চারিত ক্ষোভের চিৎকার।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৭০-এর এক সময় যখন সর্বপ্রথম 'ক্ষুধার্ত' সংকলন প্রকাশিত হয়, তার প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'সত্য ও সততা যাদের কাছে এক ক্ষুধার্ত তাদের।' চোখে পড়েছিল 'ক্ষুধার্ত কাউকে সুবাতাস দেবে না।' শরীরই যাঁদের একমাত্র কমিউনিকেশনের উপায়, অস্তিত্ব নিয়ে একা এবং আলাদা এইসব মানুষগুলি তাঁদের বিশ্বাস মারফৎ ধাক্কা মারতে চেয়েছিলেন আমাদের সামাজিক নানা ন্যায়বোধ বা নীতিবিষয়ক ধারণাকে আমরা যে সমাজে বসবাস করে থাকি, তার যাবতীয় নোংরামি, ক্লিষ্টতা, চরিত্রহীনতাকে তাঁরা সরাসরি হাজির করতে চেয়েছিলেন আমাদের মুখোমুখি। বুর্জোয়া সমাজে যে স্বার্থপর সুস্থতার বোধে আমরা নিশ্চিন্ত, তাঁরা সেই সুস্থতাকেই চ্যালেঞ্জ করে। মনে করে, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষমতা অন্তত, তথাকথিত এই টাকা-গাড়ি-বাড়ি-টাকা-বেষ্টিত সুস্থতার নেই। এইসব ঘোষণাই গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে বা উপন্যাসে, 'ক্ষুধার্ত'-দের এককেটি সংকলনে।

অতঃপর জল গড়ায়। ভাঙতে থাকে সংঘ, নানাবিধ বিশ্বাস ও আবেগের মেলবন্ধন। পাশাপাশি বদল ঘটে প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গিরও। কখনো তা ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কখনো চেয়েছে ঘৃণার ফুৎকারে সমস্ত ব্যাপারটাকেই উড়িয়ে দিতে। যে গোষ্ঠীকে ঘিরে প্রকাশিত হতো তাঁদের কেউ কেউ হাজতবাস করে এসেছেন কেবলমাত্র সাহিত্যেরই কারণে, সুদূর মার্কিন প্রদেশে তাঁদের ঘিরে প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। সবই হয়েছে ১৯৭০-এর অব্যবহিত আগে-পরে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ক্ষুধার্ত' গোষ্ঠীর দুই প্রধান লেখকের একটি পুনর্মুদ্রিত এবং আর-একটি সাম্প্রতিক (যদিও সংগৃহীত রচনাগুলি রচিত হয়েছে '৬৯-'৮৩ সময়কালে) গদ্যগ্রন্থ ঘিরে আমরা চেষ্টা করব তাঁদের অবস্থানকে সঠিক বুঝে নিতে

১·

ডিসেম্বর ১৯৮৩তে প্রকাশিত হয়েছে সুভাষ ঘোষের সাম্প্রতিক গদ্যগ্রন্থ 'এ্যামবুশ'। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৩-র মধ্যে রচিত নখানি গদ্যরচনা, যারা সম্পূর্ণ অর্থেই গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রচলিত গদ্যমাধ্যমগুলির পাশ কাটিয়ে গেছে, সংগৃহীত হয়েছে এখানে। গণেশ পাইনের অদ্ভুত এক প্রচ্ছদ-সহ এই গ্রন্থ উৎসর্গিত 'যারা আজীবন মানুষের স্বপক্ষে এ্যামবুশ বা গেরিলা-প্রকৃতির ওই আক্রমণ চালিয়ে যায় তাদের উদ্দেশে।'

সুভাষ ঘোষ তাঁর 'এ্যামবুশে'র ভেতরে আমাদের জন্যে যা ধরে দিতে চেয়েছেন সেটা সারি-সারি 'অবস্থা' যারা আলাদা-আলাদা। উদ্ভট ভাষার কারুকার্য দিয়ে সুভাষ সেই বিবিধের সারবন্দি অস্তিত্বকে গেঁথে ফেলতে চেয়েছেন সঠিক জায়গায় এবং আমার বিশ্বাস সেই জায়গাটি হলো মিলিসিয়া—যে মিলিসিয়া থেকে তাঁর পক্ষে গর্জন করা সম্ভব হয়, 'আসুন, বুর্জোয়াদের বেডরুম লোপাট করি—ডাইনিং হল তচনচ করি', অথচ, এই সুভাষই তাঁর প্রথম সংকলিত রচনা 'অভিযান'-এর আরম্ভ করছেন এই বলে যে, 'মিলিসিয়া-পরাক্রান্ত রাস্তা থেকে আমরা বরাবরই সরে আসতে বলেছিলাম।' স্বভাবতই, পাঠক হিসেবে আমাদের একটু নড়ে বসতে হয়। কারণ, মিলিসিয়ার বাইরে কোন হায়ারারকিবিহীন সভ্যতার কথা তাঁর রচনা আমাদের পরপর উপহার দিতে থাকে, বুঝতে আমাকে রীতিমতন দ্বিধায় পড়তেই হয়। অথচ, ঐ একই রচনার ('অভিযান') শেষে বুর্জোয়ার বেডরুম ডাইনিং হল তচনচ করারও আহ্বান তো তিনিই জানিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া, তাঁর পরবর্তী সংকলিত গদ্যগুলির মধ্যেও তো পরতে-পরতে বিদ্যমান 'গেরিলা মানুষের "হুল্ট" শব্দ' যা কিনা সত্যিই এই আমাদের যাবতীয় শান্তি-স্বস্তি-বেষ্টিত সাংসারিকতার 'এ্যটেল মৃত্তিকা চৌচির করে, ম্যাজিনো লাইন' উড়িয়ে দিয়ে খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসবার কথাই বলে।

আমাদের চোখে পড়ে প্রায়-সঠিক এক 'অভ্যুত্থানের ভাষা ও প্রয়োগ'—যে ভাষা তাঁরই বক্তব্য-অনুযায়ী 'গ্রামার জানে না' এবং, যা-কিনা সত্যিই প্রায় আত্মার ভাষা। ফলত, এই মূলগত এক সেলফ-কন্ট্রাডিকশন একদম প্রথমেই চোখে পড়তে থাকে। জানি না সুভাষ নিজে বিষয়টা নিয়ে কী ভাবেন, কারণ, ঘটনাটা একদম গোড়াতেই।

সুভাষ উপলব্ধি করেন মানুষের ভেতরকার ভয়াবহ দিকটার গম্ভীর, ঠাণ্ডা উপস্থিতি। মানুষের বাধ্যতামূলক মলিন জীবনযাপনের অন্তর্নিহিত অসহায়তা তাই নানাভাবে উঠে আসে তাঁর হাতে। তিনি বলেন এমন এক আবহাওয়ার কথা যার গঠনেই বুঝে ওঠা যায় যে, তা ওর জন্য নয়। অন্যের প্রয়োজনে সৃষ্ট। ফলত, তাকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনি, 'নিপাত নামাবলী গায়ে খোজা হিজড়ে বুর্জোয়া।' যুদ্ধক্ষেত্রে সে হেলিকপটার থেকে শত্রুমিত্র সৈন্যের দঙ্গলে ছুঁড়ে দিতে চায় মোনালিসার প্রিন্ট, এই সামাজিক ও সাংসারিক বধ্যভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনুভব করে সংখ্যালঘু, চিৎকার করে, 'আসুন বুর্জোয়াদের বেডরুম লোপাট করি।'

অন্য অনেক লেখকের মতন সুভাষ গল্প ছুঁড়ে দেন না পাঠকের দিকে। বরং, তাঁর গলতে থাকা গদ্যভঙ্গিমায় তিনি থরেথরে সাজিয়ে দেন হাতবোমার পর হাতবোমা যা কিনা করতে থাকে নির্বিচার ঘৃণার অবিমিশ্র উদ্‌গীরণ। যেমন, 'তুমি ছিলে কোলাবরেটরের দলে—শিল্পগাদের নীচে জীবন গায়েব করেছিলে তুমি—তুমি আজি হইতে বালিশের কেউ নও—জীবনেরও নও কেউ—ব্যবহারযোগ্য জীবনের কেউ নও তুমি' অথবা এরকম, 'তুমি গানের বদলে কেবল নাসবন্দির গান গাহিয়াছ, ঘোলা জলে মৎস্যশিকার করিয়াছ তুমি, পিসপের কাজ করিয়াছ, যে-ভূত কখনো দেখ নাই, লিখিয়াছ মিথ্যা সেই ভূতের কথা,...।' কাহিনীর বদলে সমস্ত রচনার মধ্যেই তিনি ধরে দেন তাঁর দিনলিপি—জীবনযাপনের গোপন ইতিহাসকে, গোপন ঘা-পুঁজ ইত্যাদিকে নির্ভাবনায় অসংবদ্ধ অথচ ঋজু ভাষায় ভর করে সুভাষ ভাসিয়ে দেন আমাদের দিকে। অবশ্য, সব পরীক্ষারই যেমন সর্বদা ভালো ফল হতে পারে না, সেরকমই তাঁর গদ্যও সবসময় হয়ে ওঠে না অমোঘ। সুভাষ ভেঙে ভেঙে বলতে থাকেন, 'বিধি বাম/অকস্মাৎ মধ্যপথে ধ্বস/ঠাস ওই/আঁশ...' ইত্যাদি আর বেচারা পাঠক এই গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে খুঁজে মরে কোথায় সেই আত্মার গভীর ভাষা, যা কিনা গ্রামার না জানলেও জানে কীভাবে নাড়িয়ে তুলতে হয় শারীরিক তীক্ষ্ণ অনুভবকে।

'সুভাষ ঘোষ বলতেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা বোঝায়' কিনা জানা নেই আমাদের, কিন্তু তাঁর 'আলফা-বিটা-গামা', 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' ইত্যাদির পাঠক যে সুভাষকে চিনে উঠেছে, 'এ্যামবুশ' তার থেকে অন্য রকম। আরও বুদ্ধিমান, অমোঘ এক মানুষের সন্ধান না দিতে পারলেও অন্তত সেই পুরনো মানুষটির কিছু বেশি দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার সামনা সামনি করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

একটি সাহিত্যগ্রন্থে প্রতিবাদ যেভাবে খুশি থাকতে পারে, কিন্তু কখনোই তা হয়ে উঠতে পারে না ব্যক্তিগত ঠেলাঠেলি। অথচ, সুভাষ তাঁর 'দ্য এ্যামবুশ' রচনায় কয়েকজন সুপ্রচারিত সাহিত্যিক বিষয়ে দু পাঁচটা অস্বস্তিকর মন্তব্য না করে পারেন নি। অবশ্য, এই যে অস্বস্তি, আমরা একেও স্বাগত জানাতে পারতাম যদি ঐ মন্তব্যগুলি সুভাষের সাহিত্য-আদর্শ বিষয়ে আমাদের করে তুলত আরো ওয়াকিবহাল। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তা হয়ে থাকল হালকা রাগ থেকে উচ্চারিত ক্ষোভের চিৎকার, যা চোখ ধাঁধাতে পারে বটে, মন মানাতে কখনোই নয়।

'ক্ষুধার্ত' সংকলনের মোটামুটি যাঁরা পরিচিত পাঠক এ গ্রন্থের ভয়াবহ মুদ্রণ হয়ত তাঁদের স্বাভাবিক ঠেকবে। 'ক্ষুধার্ত প্রকাশনী' কি এদিকটায় একটু নজর দিতে পারতেন না?

২

বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা' গল্পগ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১৯৮৩-র এপ্রিলে। ১৯৬৫-তে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সংকলিত, যাদের প্রত্যেকটিরই রচনাকাল ১৯৬২-৬৪-র মধ্যে। তবে শেষগল্প 'দূরবীন' ঐসময় রচিত হলেও গ্রন্থভুক্ত হলো এই প্রথম, বাসুদেব তাঁর ভূমিকাতে জানিয়েছেন।

বাসুদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় 'ক্ষুধার্ত' সংকলনে (১ম) ওঁর 'দেবতাদের কয়েক মিনিট' রচনার মধ্য দিয়ে—যেখানে তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'আমি যা বলতে চাই তা লিখতে পারি না, যা লিখতে চাইছি তা বলতে পারি না—কষ্ট হয়।' এই কষ্ট থেকেই ওঁর যাবতীয় রচনাদি। আমার মনে হয় এই কষ্ট ওঁর সাধারণ লেখক মানুষের কষ্ট নয়, যে কষ্ট থেকে আজ হাজার হাজার বইয়ের পর বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে আর হচ্ছেই। তা যদি হতো তবে তাঁর 'বমনরহস্য' কাহিনীর নায়ক বলত না, 'আর থাকতে পারি না আমি। ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে আমি বমি করে যাই। বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের ওপরে। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগরে বার করতে থাকি।...আমি বমি করি।' বরং, আমার তো বিশ্বাস, বাসুদেব সেই জাতের মানুষ যারা বড় দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা এই অসভ্য সামাজিক মুখোশটার বিরুদ্ধে ঘৃণায় আন্তরিকভাবে উদ্বেল। হাংরি জেন্যারেশনের মূল যে বক্তব্য, অর্থাৎ জীবনের ভিতর ষড়যন্ত্রময় বস্তুসমূহের মারাত্মক অবস্থানের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেয়া ঘৃণার পিণ্ড, বাসুদেব তাকেই তাঁর যাবতীয় প্রকাশিত ('রন্ধনশালা'র রচনাগুলিতে তো বটেই) রচনার মধ্যে সুগ্রথিতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। তাঁর রচনার সর্বপ্রধান কোনো বৈশিষ্ট্য যদি পাঠক খুঁজে বার করতে বসেন, তবে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ঠিক এখানেই। তাঁর এই বইটি পড়ে উঠবার পর আমার মনে হয়েছে, কীভাবে স্বীকৃতি দিয়েই ভেঙে দেয়া যায় স্বীকৃত সব সত্যের অভ্যন্তরীণ ভ্রান্ত বোধগুলিকে, 'রন্ধনশালা' তার নির্বিষ্ট উদাহরণ। সুভাষের গদ্যে যেমন প্লট, সুবিন্যাস, চরিত্রের জন্য বিন্যস্ত কোনো ভূমি নেই—বাসুদেবের গদ্যে আবার তাদের প্রত্যেকের জন্যেই জায়গা নির্দিষ্ট। কিন্তু, বাসুদেব যেটা করেন সেটা এরকম যে, প্লট, চরিত্র, কাহিনীর অবয়ব ইত্যাদি সূত্রাদিকে তিনি স্বীকার করে নিয়ে তারপর অমোঘভাবে তাঁর অভীষ্ট পাথরটিকে গড়িয়ে দেন। কাহিনী, চরিত্র মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রধান হয়ে ওঠে সারবন্দি তীব্র অবস্থা বা সিচুয়েশনগুলি। 'রন্ধনশালা' কাহিনীতে বরফবাড়ি গলে যাবার পর মূল চরিত্র ও রবীন প্রায় ছিঁড়ে খায় ভেড়ার নাড়ী ভুঁড়ি, শিং, মাথা, হাত চালায় খাবারের থালায়, শান দেয় 'হাজার বছরের ক্ষিধেয়' অথবা 'রতনপুর' গল্পে নায়ক নীলু ছোট্ট হয়ে গিয়ে খসে পড়ে চুমকির খোঁপা থেকে আর তখনই বাতাসে ভাসতে থাকে 'চুমকি হয়ে, চুমকি হয়ে।' বড় অদ্ভুতভাবে তাঁর বিন্যাসকে কাজে লাগান বাসুদেব। পাঠক যেন বাধ্য না হয়ে পারে না তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অবস্থার ভিতর মোহাবিষ্টের মতন এগিয়ে যাওয়াকে মেনে নিতে। আমাদের চোখে ভাসতে থাকে এক অতি-জীবিত কল্পনার জগৎ। বাস্তবিক, পাঠকের কেউ কেউ, হাকসলি যেমন দস্তয়েভস্কির নায়কদের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের ও লেখকের inhuman liberty-র কথা অথবা মন্তব্য করেছিলেন, 'How tragic it all is! But also how stupid and grotesane!', সেভাবেই আর্তনাদ ছুঁড়ে দিতে পারেন, কিন্তু এটাও হয়ত ঠিক যে, অস্বীকার করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না বাসুদেবকে, যেভাবে অস্বীকার করতে পারেন নি হাকসলি যত খুশি বাক্যব্যয় করেও দস্তয়েভস্কি ও তাঁর চরিত্রদের।

বাসুদেব তাঁর চিত্রকল্পগুলিকেই অল্প মোচড়ে কাহিনীর শরীর-হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিতে থাকেন অনেক সময়, যা খুশিকে যা-খুশিকে প্রায় যেমন-খুশিতে তুলে এনে ছড়িয়ে দেন

চতুর্দিকে। কাহিনীর শরীরে বিশ্বাস্য কিছু না থাকা সত্ত্বেও আমরা জড়িয়ে যেতে থাকি ওঁর সঙ্গে, ওঁর পরিবেশ ও কাহিনীর জটিলতায়—এমনকী অবস্থা এভাবেই ঘোরালো হতে থাকে যে 'বমনরহস্যে'র প্রত্যেক পরতে-পরতে যখন গা গুলিয়ে ওঠে, তখন নিজের সঙ্গে নায়কের ফারাক-চিহ্নও আবিষ্কার হয়ে ওঠে কঠিন, স্পষ্টই যেন চোখে পড়ে, 'দড়িতে ঝুলতে থাকা ছাল ছাড়ানো মানুষগুলি...'। এই বহুদিন বেঁচে থাকা অকথ্য পৃথিবীর যাবতীয় বাড়িগুলিতে আমাদের সঙ্গে খাদ্যবস্তুসমেত যাদের সম্পর্ক হয়েছিল, তারা গলগল করে বেরিয়ে আসতে থাকে...'বমির তোড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।'

বাসুদেব, আগেই বলেছি, সব স্বীকার করার অছিলায় সমস্ত কিছুকেই টকগন্ধী ঘৃণার বমিতে ভাসিয়ে দেন। অতিবড় আশাবাদীও তাঁর রচনার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে হারিয়ে যেতে বাধ্য, আর সেই মুহূর্তে বাসুদেব তাঁর হাতে তুলে দেবেন তাঁর 'দূরবীন', যেন দপ করে জ্বলে উঠবে আগুন। আমার মনে হয়, বাসুদেবের গোটা এই পৃথিবীটাই ওঁর ঐ দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখা। বাস্তবের চেয়েও বাস্তব এক জগৎ, অথবা হয়ত বলা ভালো, তিনি তাঁর সব গল্পকেই অদ্ভুত এক অতি-বাস্তব জগতে নিয়ে দাঁড় করান, যে জগতে আমরা বাস করি অথচ যে জগতের প্রতি ভীতি ও সন্ত্রাসে তাকে কখনো বুঝতে না চেয়ে গড়ে নিই নিজের নিজের বুদ্ধির মাপের পৃথিবী। বাসুদেব আমাদের সেই যৌক্তিক পৃথিবীর ওপরের যে পাতলা আবরণ তা উড়িয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই 'আমাদের'-ই দেখা করিয়ে দেন। আমাদের স্বীকার করতে আর বাধা থাকে না 'রন্ধনশালা'র বিষয়ে এই বক্তব্যকে যে, সত্যিই 'অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এই পুস্তকখানি লেখা হয়েছে—।'

ভূমিকাতেই লেখক জানিয়ে রাখছেন যে, "'রন্ধনশালা'র লেখাগুল্যে সম্পর্কে আমার এখন আর কোন মোহ নেই।" বোঝা কঠিন যে, ঠিক কোন জায়গা থেকে বাসুদেব কথাটা বলেছেন ; কারণ, কথাটা পুরো মানতে গেলে বইটি পুনর্বার মুদ্রিত করবার পিছনে তাঁর যেসব যুক্তি রয়েছে তা জানা দরকার। কেননা কেবলমাত্র একজন লেখকের হয়ে-ওঠার রাস্তাটা দেখাবার চেয়েও 'রন্ধনশালা' ধরনের বইয়ের অনেক কাজ রয়েছে। এছাড়া, মনে পড়ছে 'এখন এইরকম' (বর্ষ ৬, সংখ্যা ১) পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বাসুদেব একথাও বলেছিলেন যে, 'ভাষার স্মার্টনেস এবং সফিস্টিকেশন আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না।' অথচ, তাঁর 'রন্ধনশালা'র অধিকাংশ রচনার অবলম্বিত ভাষাই কি যথেষ্ট সফিস্টিকেশন-নির্ভর নয়? বরং, আমার মতে, ওঁর বইটা আর একবার চোখের সামনে তুলে ধরাটা তার চেয়ে বেশি দরকারি। □

কলেজ-পত্রিকার সীমা ছাড়িয়ে

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদক ঃ মীরা ভট্টাচার্য ও শান্তা সেন। বেথুন মহাবিদ্যায়তন প্রকাশন, কলকাতা।
বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৮৭৯-১৯৭৯। সম্পাদক ঃ ঐ। মার্চ ১৯৮০। ৪০ টাকা।
বেথুন কলেজ পত্রিকা/কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখী বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক ঃ ঐ। সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

সাধারনত আমরা কলেজ-ম্যাগাজিনের যে চেহারা দেখতে অভ্যস্ত, বেথুন কলেজের ম্যাগাজিনের এই তিনটি সংখ্যা তা থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। কলেজ-ম্যাগাজিন বলতে আমরা কী বুঝি? কলেজের ছাত্রছাত্রীদের গল্প কবিতা প্রবন্ধ, বড় জোর কলেজের কোনো প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী যিনি হয়ত পরে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর রচনা, কিংবা কখনো কখনো একজন দুজন অধ্যাপকের সারগর্ভ প্রবন্ধ। এমন নয় যে সেটা অসংগত বা এর কোনো প্রয়োজন নেই—কিন্তু বরাবরই মনে হত, ছাত্রছাত্রীদের লেখা নির্বাচিত কিছু গল্প-কবিতার পাশাপাশি কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, ইতিহাস এবং অন্যান্য তথ্য যদি থাকে, তবে কলেজ-পত্রিকা অন্য একটি প্রয়োজনও সাধিত করতে পারে। তখন আর তা শুধু কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তার বাইরেও একটা মূল্য তৈরি হয়

বেথুন কলেজ পত্রিকাও সাধারণভাবে আর পাঁচটা কলেজ পত্রিকার চেয়ে আলাদা এমন মনে করার কোনো কারণ নেই—না চেহারায়, না চরিত্রে। কিন্তু গত সাত-আট বছরে এই কলেজকে কেন্দ্র করে এমন কতকগুলি স্মরণীয় উপলক্ষ ঘটে গেছে, যাকে অবলম্বন করে কলেজ-পত্রিকার অন্তত তিনটি সংখ্যা ঐ প্রথাসিদ্ধ বাৎসরিক কর্মসূচির সীমা পার হয়ে বিদ্বজ্জনের প্রশংসা কুড়িয়েছে। উপলক্ষগুলি হল ঃ ১৯৭৬ সালে বেথুন বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুর ১২৫ বছর, ১৯৭৯ সালে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর এবং ১৯৮৩ সালে বেথুন কলেজের প্রথম দুই ছাত্রীর স্নাতক উপাধি পাওয়া। এই তিনটি ঘটনাকে স্মরণ করার জন্যেই বেথুন কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রীরা প্রকাশ করেছেন কলেজ পত্রিকার তিনটি অবিস্মরণীয় সংখ্যা।

'জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন স্মারক গ্রন্থ' সংখ্যায় বেথুন সাহেবের এক সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। বাংলা এবং ইংরেজি এই দুই ভাষায় বেশ কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ আছে। বাংলা সাহিত্য এবং ভাষায় তাঁর অবদান কোথায় অথবা উনবিংশ শতকের নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা কী ছিল সে বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তাঁর জীবন এবং কর্মপরিচিতি বা বেথুনের সহযোগী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাতও এঁরা করেছেন। বেথুন সম্পর্কে পুরোন রচনার পুনর্মুদ্রণও আছে। আবার ইংরেজি ভাষায় বেথুন সাহেবকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। আর বেথুনের লেখা কবিতা, চিঠিপত্র ও বক্তৃতা পুনর্মুদ্রিত করে এঁরা আমাদের জানার কাজে আরো সাহায্য করেছেন। সুকুমার সেন তাঁর প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন 'বেথুন নামটি বাঙালির সৃষ্টি। নামটির আসল উচ্চারণ বীটন। চোখের সাহায্যে বিদেশি ভাষায় জ্ঞান-সঞ্চয়ের ফলে হয়েছে "বেথুন"। এ নাম রূঢ় হয়ে গেছে, বদলানো সম্ভব নয়, উচিত নয়।' অর্থাৎ এ-থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়, বেথুন বাঙালির কতখানি আপন হতে পেরেছিলেন এবং ফলত প্রশ্ন জাগে কেন। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ বেথুন ১৮৪৮ সালে বড়লাটের আইনসচিব হিসেবে ভারতবর্ষে আসেন। ঐ একই সালে তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশন বা শিক্ষাপর্ষদের সভাপতি হন। আর তারই ফলে তাঁর নিজ আদর্শকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ হয়। তাঁর আদর্শ ছিল ইংরেজি-শিক্ষিতেরা অধীত বিদ্যা মাতৃভাষায় পরিবেশন করুক, যাতে জনসাধারণের উন্নতিবিধান হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, যা নিয়ে গত কয়েক বছর খুব বেশিরকম ভাবনাচিন্তা চলছে তার সূত্রপাত হয়েছে আজ থেকে দেড়শ বছর আগে।

আমরা যাকে উনিশ শতকের নবজাগরণ বলি, সেই জাগরণের একটা বড় দিকই ছিল নারীমুক্তির প্রশ্ন। আর সেই নারীমুক্তির ক্ষেত্রেই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ১৮৪৯ সালে বেথুন কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে এই প্রথম আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য প্রকাশ্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। বেথুন তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলের জন্য উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেই এ দেশে নারীশিক্ষার উদ্‌যোগপর্ব শুরু হয়েছিল, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানত খৃস্টান মিশনারী পাদ্রীরা। কিন্তু বেথুনের বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা এখানেই যে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নি এটি।

'বেথুন ও বাংলা সাহিত্য' এর উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যে বেথুন কলেজের ছাত্রীদের অবদানগুলি দেখানো

এক্ষেত্রে বেথুনের দানটি পরোক্ষ হলেও গুরুত্বপূর্ণ। এ-কলেজের ছাত্রী ছিলেন যে সব সাহিত্যিক তাঁরা হলেন: কামিনী রায়,সরলা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, পুণ্যলতা চক্রবর্তী। 'বেথুন ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, বেথুনের সেই কথা,' আমরা ইংরেজি ভাষার কাছে যাই প্রধানত তার সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্যই।...সাহিত্যের কথা যদি বলি, আমরা বাংলাকেই ভিত্তিরূপে গড়ে তুলব এবং ইংরেজির কাছে যাব কোনো সম্পূরক সুবিধার জন্য।' বিস্ময় এই যে, মাইকেল মধুসূদন 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখে উপহার পাঠিয়েছিলেন বেথুনকে। তিনি খুশি হলেও বলেছিলেন, ইংরেজি নয়, বাংলাভাষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার কাজেই তাঁর আত্মনিয়োগ করা উচিত এবং সেটিই হবে তাঁর স্থায়ী কীর্তি। বাংলাভাষা ক্রমশ স্বনির্ভর হোক, এটাই আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন বেথুন।

'বেথুন অ্যাণ্ড বেঙ্গল রেনেসাঁস' নামক ইংরেজি প্রবন্ধে বাংলার নবজাগরণে বেথুনের ভূমিকা, বিশেষত নারীশিক্ষায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দান আলোচিত হয়েছে। 'বেথুন প্রসঙ্গে নানা কথা' বিভাগটিতে বেথুনকে জড়িয়ে যে সব নানা প্রশ্ন ও অনুষঙ্গ আসে, তার ছোট ছোট আলোচনা আছে। শেষ বিষয়টির নাম ঃ 'বেথুন ও উত্তরাধিকার'।

'বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ'টি বিপুলকায়। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে এর অঙ্গসজ্জা, সুন্দর মলাট ও বিষয়-পরিকল্পনা।

ইংরেজিতে 'প্রথমেই একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে অরবিন্দ গুহ-র—'আর্লি হিস্ট্রি অফ বেথুন কলেজ'। ৯৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ—তাও শেষ হয়েছে ১৯০১ সালে। এরই পরিপূরক প্রবন্ধ ঃ ডঃ হেনা মুখার্জি-র 'হিস্ট্রি অফ দি বেথুন কলেজ ১৯৪৯-১৯৭৮'।

ইংরেজি ও বাংলায় অনেকগুলি প্রবন্ধই আছে। ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধগুলির বিষয়--বেথুন কলেজ, বেথুনের অবদান, শিক্ষা ও নারীমুক্তি স্বাধীনতাপূর্ব যুগের ভারতীয় নারী ইত্যাদি। সুকুমার সেন এখানেও লিখেছেন 'লিটেরারি এডুকেশন অফ দি বেঙ্গল ফিমেল ইন দি পাস্ট'--স্ত্রী শিক্ষায় ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাটিও জানা যায় এখান থেকে। এছাড়া আছে কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য--বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস ও বিবরণ, পূর্বাপর গভর্নিং বডি-র সদস্য ও শিক্ষকদের তালিকা ইত্যাদি। এর মধ্যে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-র লেখা একটি প্রবন্ধ—বাংলা সাহিত্যে শেক্সপিয়রের প্রভাব বিষয়ক—কী করে এখানে চলে এল বোঝা গেল না। সম্পূর্ণ বেমানান এই সংকলনে।

বাংলায় লেখা প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্য সংগীত নৃত্য অভিনয় খেলাধূলা বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেথুন কলেজের ছাত্রীদের অবদান আলোচিত হয়েছে। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরল-অবলা- শৈলবালা, কামিনী রায়, হিরণ্ময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, বিনয়কুমারী বসু, সুখলতা-পুণ্যলতা, শান্তা দেবী-সীতা দেবী, সাবিত্রী রায় প্রমুখদের সম্পর্কে এক-একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তথ্যনিষ্ঠা ও সাহিত্যিক গুণের সমন্বয়ে সেগুলি বেশ সুখপাঠ্য।

বিশেষ আকর্ষণীয় 'স্মৃতি' অংশটি। বেথুন কলেজের বিভিন্ন যুগের পুরনো ছাত্রী, যাঁরা নানা বিষয়ে আজ যশস্বিনী, তাঁদের বেথুন কলেজ বা হোস্টেলকে নিয়ে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে। শান্তা দেবী, সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়, কমলা দাশগুপ্ত, বীণব ভৌমিক, চামেলী বসু, অশোকা গুপ্ত, সতী ঘোষ, মুকুলিকা কোনার প্রমুখের প্রত্যেকের লেখাতেই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ আছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল বেথুন সাহেব বা নারীজাগরণ বা উনিশ শতকের রেনেসাঁস নিয়ে বাংলাভাষা বহু খ্যাতনামা কবির কবিতা একসঙ্গে। সবচেয়ে দীর্ঘ কবিতা সিংহের কবিতাটি, যার নাম 'আমি সেই মেয়েটি'।

শেষ সংখ্যাটিতে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুর মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৮৭৮ সালে যে মহিলা সর্বপ্রথম (বেথুন স্কুল থেকে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নাম হল কাদম্বিনী বসু, পরে গঙ্গোপাধ্যায়। এই একটি ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার জন্যই ১৮৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুলে কলেজ ক্লাসের পত্তন হয়েছিল। ১৮৮০ সালে কাদম্বিনী যখন ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দেন, তখন চন্দ্রমুখীও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই পরীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। ১৮৮৩ সালে দুজনেই বেথুন থেকে বি· এ· পরীক্ষা দিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম দুই মহিলা স্নাতক হওয়ার সম্মান অর্জন করেছিলেন। এঁদের উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর আনন্দে

বই-এর খবর

জগদীশচন্দ্র বসুর খ্যাতি বিশ্বজোড়া বিজ্ঞানী হিসেবে। তাঁর অনেক আবিষ্কার চমকে দিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। কিন্তু কিশোরদের জন্যেও যে তিনি কিছু লিখেছেন, সে খবর অনেকেরই অজানা। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ছাপলেন 'জগদীশচন্দ্র বসু-র কিশোর রচনা সমগ্র'। সংকলনে রয়েছে জগদীশচন্দ্রের লেখা গল্প 'পলাতক তুফান' আর 'অগ্নিপরীক্ষা'। 'পলাতক তুফান' 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' নামে লেখা হয়েছিল প্রথমে কুন্তলীন পুরস্কারের জন্যে লিখেছিলেন জগদীশচন্দ্র এই লেখা। প্রথম বছরের প্রথম পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি গল্প ছাড়াও সংকলনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিবিধ প্রসঙ্গ, ভ্রমণ বিষয়ক রচনা বিবিধ রচনা, বক্তৃতাবলী কিছু মূল্যবান ফটোগ্রাফ মর্যাদা বাড়িয়েছে সংকলনের

জীবজন্তু নিয়ে বহুদিন অনাধরনের লেখা লিখছেন অজয় হোম তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিচিত্র জীবজন্তু' ছাপলেন শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঘরের পাশে আর দূরে--জঙ্গলে, জলে, পাহাড়ে বাস করা অনেক দেশি-বিদেশি প্রাণীর অন্তরঙ্গ খবর এ-বইতে নারায়ণ সান্যালের 'না-মানুষের পাঁচালি' ছাপলেন দে'জ মনুষ্যেতর বুদ্ধিমান অনেক প্রাণীর বিচিত্র জীবনযাপনের তথ্য পাওয়া যাবে এ-বই পড়ে

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য ছেপেছেন ঋদ্ধি লেখক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন অধ্যায়ে রয়েছে আনন্দরাম বরুয়া সংস্কৃতচর্চায় আত্মমগ্ন ঋত্বিক, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিদ্যাচর্চায় বিশ্বপথিক, রবি দত্ত এক সিদ্ধকাম অনুবাদক 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান' বেরিয়েছে ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন থেকে এবইয়ের বিভিন্ন লেখকেরা হলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়--আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত--দ্বৈতপটভূমি রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম, সনজীদা খাতুন--কথা সুর কয়েকটি প্রেমের গান, পার্থ বসু--প্রেমের গান ঃ স্রষ্টা আর সম্পাদক, শঙ্খ ঘোষ—এ আমির আবরণ, ভি· ভি ওয়াঝলওয়রে--রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ নির্ণয়, কানাই সামন্ত--প্রেমের গান ঃ রবীন্দ্রনাথ।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সম্বন্ধে নতুন করে বোধহয় কোনো বিশেষণ দেয়ার নেই তাঁর 'শ্রেশষট গল্প' ছাপলেন প্রমা। সংকলনে রয়েছে ঃ আজীর, স্তনদায়িনী, জল, চম্পা, পরম আত্মীয়, পিণ্ডদান, বাঁয়েন, রংনাম্বার, উর্বশী ও জনি, ধীবর, শরীর, চিন্তা, ছায়াবাজী, সোনালী মাছ, দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবাটের কাহিনী ওঁরাই ছাপলেন 'কবিতা সিংহর শ্রেষ্ঠ গল্প' দিব্যেন্দু পালিতের হাসির গল্প সংকলন 'শুক্রে শনি' আর দীপংকর দাসের গল্প সংকলন 'সাঁকো' একদম অন্য ধরনের গদ্য লিখে খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই-ই কুড়িয়েছেন কমল চক্রবর্তী তাঁর গল্প সংকলনের প্রকাশক শহরতলি বইয়ের নাম 'প্রচ্ছদকাহিনী'

১৯৫৩ সালের বর্ষাকালে (শ্রাবণ, ১৩৬০) বেরিয়েছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। তরুণ কবি শিল্পী প্রবন্ধকারদের ঝাঁঝ মাখানো লেখা ছাপা হয়েছে কৃত্তিবাসে কিছু নতুন রীতির গল্পও প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিত এবং আবার অনিয়মিত হয়ে যায় কৃত্তিবাস। সম্পাদকও বদল হয়েছে বহুবার 'কৃত্তিবাস'-এ প্রকাশিত যাবতীয় লেখা দুখণ্ডে ছাপার পরিকল্পনা নিয়েছেন প্যাপিরাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভূমিকাও লেখা তাঁরই। শ্রাবণ ১৩৬০-এর প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে ১৩৬৯ পর্যন্ত ছাপা লেখা (কৃত্তিবাসের ষোড়শ সংকলন অব্দি) জায়গা পেয়েছে এই খণ্ডে

হঠাৎ হঠাৎ **বিদ্যুৎ** বিভ্রাটে ছাপার কাজ ক্রমশই বিশ বাঁও জলের তলায় যাচ্ছে, এ অভিযোগ কলেজ স্ট্রিট পাড়ার সমস্ত প্রকাশকের। □

শুভ্রা ভট্টাচার্য

যে কবিতাটি লিখেছেন বা বিদ্যাসাগর চন্দ্রমুখীকে আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন সে দুটি পুনর্মুদ্রিত [illegible] আমাদের তৎকালের প্রতি[illegible] জানতেও [illegible] করেছেন। 'সমসাময়িক' [illegible] সে সময়ের পত্রপত্রিকায় [illegible] হওয়ার ফলে কী প্রতি[illegible] [illegible] বা নারীর উচ্চশিক্ষা বিষয়ে [illegible] ছিল, সেই সংবাদগুলি সং[illegible] [illegible] সংকলক আমাদের ঔৎসুক্য [illegible] দিয়েছেন।

এই কলেজের অতীতের সঙ্গে যুক্ত ছ জন বিশিষ্ট শিক্ষক সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে, সেগুলি বেশ তথ্যসমৃদ্ধ। 'বিজ্ঞানচর্চা, বাঙালি মহিলা এবং বেথুন কলেজ' প্রবন্ধটি ইতিহাসকে অনুসরণ করে লেখা। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর লেখা 'একশো বছরে নারীশিক্ষা তার সামাজিক ফলশ্রুতি' প্রবন্ধটি বেশ বিশ্লেষণধর্মী। তিনি বেথুন থেকে শুরু করে '১৯৭৫ আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পর্যন্ত নারীদের সামাজিক ভূমিকাটি এবং শিক্ষা বেশ সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইংরেজি ভাষায়ও কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হই তাতে। ১৮৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন চন্দ্রমুখী বসু। এই কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা। এরপর তিনি বেথুন স্কুলে অ্যাসিস্টান্ট লেডি সুপারিনটেনডেন্ট হন ও পরে লেডি প্রিন্সিপ্যাল। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা। কাদম্বিনী আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বেথুন কলেজ পত্রিকা এই দুই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে গভীরভাবে—কৃতিত্ব এখানেই।

সবশেষে সাধুবাদ জানাই দুই সম্পাদিকাকে। তাঁরা ঐ কলেজেরই অধ্যাপিকা। যে-পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় তারা কলেজ-পত্রিকাগুলি তৈরি করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন পত্রিকাই ইতিহাসে থেকে যায়। ☐

তপস্যা ঘোষ

নাচ

হিন্দিতে 'চণ্ডালিকা'

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'। প্রযোজনা ঃ গীতাঞ্জলি, নয়া দিল্লি। পরিচালনা ঃ শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। কলামন্দির, কলকাতা। ২৯ এপ্রিল ১৯৮৪।

'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের হিন্দি পাঠে দিল্লির 'গীতাঞ্জলি' দল যখন 'শিঞ্জিনী'-র পৃষ্ঠপোষকতায় কলামন্দিরে তাঁদের অনুষ্ঠান করলেন, সেদিন নতুন করে বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের শব্দের তীব্র শক্তির টান কত প্রবল। 'যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা' এই চরণের প্রবল জোয়ারে মনেই থাকে না শব্দগুলো বাংলা নয়, হিন্দি। মনে থাকে না সুরের ঐ ওজস্বী ছন্দময় দোলা বহন করছে আমাদের দৈনন্দিনের বাইরে ভিনপ্রদেশী শব্দমালা। আসলে এই নৃত্যনাট্যের প্রতিটি শব্দ এমন অমোঘ, অন্তর্বর্তী শূন্যতায় এমন সুরের বিহ্বলতা, একটি সম্পূর্ণ বাক্যের এমন নিশ্চিত গড়ে ওঠা, যে মায়ের মন্ত্রের মতোই আমাদের মনকে, চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করে। সেদিন বোঝা গেল, 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের দর্শকই প্রকৃত অর্থে আনন্দ, শব্দের জালে স্রোতময় সুরের তোড়ে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না।

আসলে প্রতিটি কথাই 'এলিমেন্টাল' উপাদানে ভরা—'জল দাও আমায় জল দাও', 'শ্রাবণের কালো যে মেঘ/ তারে যদি নাম দাও চণ্ডাল/ তা বলে কি জাত ঘুচিবে তার,/ অশুচি হবে কি তার জল' বা 'নিজেরে নিন্দা কোরো না' অমোঘ এই শব্দগুলো সেদিন শুভ্রা মুখোপাধ্যায় (প্রকৃতি) বা মায়ের কথ্যভাষার সমৃদ্ধ সুরকাঠামোয় বা দীপা ব্যানার্জীর গলায় শুনে মনে হয়েছিল, হিন্দি অন্য ভাষা হতে পারে, অতিচেনা চরণকে অন্যরকম লাগতে পারে ব্যবচ্ছেদ করে দেখলে, কিন্তু সম্পূর্ণতায় সেই উচ্চারণকে নিশ্চিতই মনে হয়, গিলবার্ট মারের ভাষায়; যেন বহুদিনের চেনা। এক একটি শব্দের জঙ্গমতা জাগিয়ে তুলছে আমাদের মগ্নচেতন থেকে এক অব্যাখ্যাত স্পন্দন, আমাদের সামাজিক স্বপ্নে যা অঙ্গাঙ্গী, সুপ্ত অথচ বহুপরিচিত আবহ। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের এই নির্মাণ শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কলামন্দিরের অনুষ্ঠানে সেদিন বেশি করে বেজেছে। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, সমালোচনার ঝুঁকি নিয়েও, সাহস করে এই পরিচালনা না করলে রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন আবেদনের চরিত্র অননুভূত থেকে যেত। নাটকটির কথাগুলো এত জোরালো যে আলো (এন. কে. সুরি.) বা অন্য নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো বাহুল্য। শব্দের জোয়ার তো মনে, অনুভূতিতে—সেখানে পেছনে আলো ফেলে জল বোঝাবার কোনো প্রয়োজনই থাকে না বোধহয়। যদিও ছেলেদের গানের স্কেল একটু ওপরে উঠলে ভালো হত, তবুও মনি গুহ (আনন্দ), সুকৃতি চক্রবর্তী (দইওয়ালা), সুপ্রিয়া ঘোষ (চুড়িওয়ালা) নাটকের কাঠামোয় নিজেদের মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। নাচে রাবীন্দ্রিক ছোঁয়া তো ছিল, কিন্তু আধুনিকতার পরীক্ষা করা হয়েছে, যেমন 'জাগে নি, এখনো জাগে নি' গানটির নৃত্যপরিকল্পনায় ও

নৃত্যশিল্পীদের পোশাকে। আমাদের চেনা জগতের অশুভ শক্তির শারীরিক এক আবহ তৈরি করে বলে নৃত্যনাট্যটি অন্য এক মাত্রায় পৌঁছয়।

শর্মিষ্ঠা মুখার্জী 'প্রকৃতি'-র ভূমিকায় তার কিশোরী মনের অনুভূতি দিয়ে চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করায় কোনো ত্রুটি রাখে নি। মা-এর ভূমিকায় অনুরাধা রায় পরিণত।

ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় শুভ্রা মুখোপাধ্যায় 'গীতাঞ্জলি' দলের প্রধান অনুষ্ঠান হিসেবে যে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'-কে হিন্দি ভাষায় মঞ্চস্থ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা নিশ্চিতই তাঁর সাহস। প্রমাণিত হলো, রবীন্দ্রনাথ কত প্রাসঙ্গিক ও সর্বজনীন।

৩০ এপ্রিল, কালবৈশাখীর ঘনঘটাতেও, কলামন্দিরে দেখা গেল শিঞ্জিনী-র পৃষ্ঠপোষকতায় শর্মিষ্ঠার কথক আর অঞ্জনা ব্যানার্জীর ভরতনাট্যম। ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী হিসেবে শর্মিষ্ঠা যদি তাঁর বর্তমান নিষ্ঠা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে চর্চা করে যান কথকেরই মাধ্যমে, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁর নৃত্য আরও বাঙ্ময় হবে নিঃসন্দেহে। দুর্গালালের সুযোগ্য শিষ্যা হিসেবে তাঁর অভিব্যক্তি, পরিণত পায়ের কাজ ও সাবলীল দক্ষতায় মঞ্চকে দখলে রাখার দৃষ্টান্ত

শর্মিষ্ঠা মুখার্জী

নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর পায়ের কাজে যে অনায়াস ভঙ্গি তা আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তাঁর অনুশীলনে।

অঞ্জনা ব্যানার্জী তাঁর সাবলীল মুদ্রায় আর অভিনয়ে, ছন্দের নিশ্চিত রূপায়ণে স্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁর দীর্ঘ চর্চার প্রমাণ রাখলেন তিনি ভরতনাট্যমের বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গির মাধ্যমে। নবরসের বিস্তৃত নৃত্যে, তিলানায় বা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কীর্তনের সঙ্গে অঞ্জনার দৃঢ় ও নিশ্চিত নাচের ঠমকে বোঝা যায় থাঙ্কমনি কুট্টি এবং কে· এন· দক্ষিণমূর্তির উদার অবদান আছে এই ছাত্রীর প্রতি। অঞ্জনা ব্যানার্জীর নাচে সবচাইতে আকর্ষণীয় তাঁর নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস। অনুশীলনের অক্লান্ত স্তর পার না হলে এই অব্যর্থ আবেগময় নৃত্য সম্ভব না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর নাচের সঙ্গে বন্দনা বসুর গান ভুল কথায় ও ভুল সুরে গানটিকে তো মাটি করেইছে, ঐ নাচটি যোগ না করলেও অঞ্জনার দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকত না। যেমন শর্মিষ্ঠার নাচকে বারবার ক্ষুণ্ণ করছিল বোলতান গায়কের অপ্রাসঙ্গিক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি।

গীতাঞ্জলি-র বিচিত্রানুষ্ঠানটি খুবই মনোগ্রাহী ও সুচিন্তিত। দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে ঐ অনুষ্ঠানটি। □

অমল রায়

নাটক

বাংলাদেশের নাট্যজগতের খবরাখবর একটি সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের নাট্যসংস্থা 'নাগরিক' গত এপ্রিলে কলকাতায় এসেছিলেন 'নূরলদীনের সারাজীবন' নিয়ে। আলী যাকের ঐ নাটকের নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতা। আতাউর রহমান ও অভিনেতা এবং 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর একজন 'প্রতিক্ষণ'-এর পক্ষ থেকে ওঁদের দুজনের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেই সাক্ষাৎকারের প্রথমাংশ গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে--সেখানে নাগরিক-এর নূরলদীন এবং তার আগের প্রযোজনাগুলি সম্পর্কে তারা বিস্তারিতভাবে অনেক কথা বলেছিলেন। এই সংখ্যায় **সাক্ষাৎকারের বাকি অংশ ছাপা হল** এতে বাংলাদেশের নাট্যজগতের অনেক অজানা বা কম-জানা খবর পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এখানে প্র-প্রতিক্ষণ, আলী--আলী যাকের এবং আতা--আতাউর রহমান।

প্র যতদূর জানি, মহিলা সমিতির ছাড়া তো বাংলাদেশে আর কোনো স্থায়ী মঞ্চ নেই।

আলী : আরেকটি খুলেছে—'গাইড হাউস মিলনায়তন'। মহিলা সমিতির পাশেই। কিন্তু শব্দব্যবস্থা খুব ভালো নয় বলে আমরা ঠিক ওটা পছন্দ করি না।

প্র : কত জন দর্শক ধরে?

আলী দর্শক একই রকম—পাঁচশ, পাঁচশ। তবে আমরা, জানেন, ছোট ছোট হলই বেশি পছন্দ করি। কারণ, ধরুন, ঢাকায় নিয়মিত নাট্যদর্শক ৩০ থেকে ৪০ হাজার। আমাদের একটা প্রযোজনা করতে তো অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক খরচ, অনেকদিনের রিহার্শাল। কাজেই যদি ছোট হল হয় এবং হাউসফুল হতে থাকে সেটাই ভালো। অন্যদিকে, ধরুন, আমরা ৫ হাজার লোকের একটা অডিটোরিয়ামে করলাম, ৫টি অভিনয়েই শেষ। তখন আবার আরেকটা নাটক তৈরি করতে বিরাট ঝামেলা।

প্র : আপনাদের নিজস্ব কোনো পত্রিকা আছে?

আলী না নেই। তবে আমরা একটা পত্রিকা বের করছি 'নাট্যপত্র' নামে এবং সেটা ঠিক নিয়মিত বের হবে না—হয়তো বছরে একটা। কিন্তু খুব ভাবি পত্রিকা হবে, ওজনদার।

প্র ; বাংলাদেশের দর্শক কারা? সমাজের কোন শ্রেণী থেকে?

আলী যখন শুরু করেছিলাম তখন উচ্চবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত ছিল—এখন লুঙ্গিপরা দর্শকও আমাদের নাটকে ভিড় করে আসেন।

প্র টিকিটের দাম কেমন?

আলী টিকিটের ৪টি শ্রেণী—২০, ১৫, ১০, ৫। আমাদের ওখানে

এটাও মনে রাখতে হবে, সিনেমাহলে সবচেয়ে কম টিকিটের দাম সাড়ে ৪ টাকা। সাড়ে ৪ টাকায় সিনেমা দেখা আর ৫ টাকায় থিয়েটার দেখার মধ্যে তো কোনো ফারাক নেই।

প্র আপনাদের প্রত্যেকটি প্রযোজনায় গড়ে কত খরচ পড়ে? ধরুন 'নূরলদীন'-এ কত খরচ পড়েছে

আতা সব মিলিয়ে ৪০ হাজার টাকা—কস্টিউম্‌স্ট্রম নিয়ে।

প্র এই টাকাটা ওঠে কি আপনাদের

আলী ধরুন যদি ৪০টা শো হাউসফুল যায়...

আতা দেড় হাজার টাকা করে পার শো লাভ থাকে...

আলী তাহলে উঠে আসে। 'নূরলদীন'-এ উঠে আসবে নিশ্চয়ই।

আতা কথা হলো, হাউসফুল তো সবসময় যায় না।

আলী 'নূরলদীন'-এর ধরুন ৫০টা শো হয়েই গেছে প্রায়।

আতা বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন রকম খরচ। যেমন 'সাজাহান'-এ বেশি গেছে—ওটাতে পোশাকের ব্যাপার ছিল। গড়পড়তা খরচ যদি জানতে চান, যে কোনো নাটক নামাতে খরচ পড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা।

প্র: সরকার কিছু অনুদান দেন কি?

আলী এককালীন অনুদান মাঝে সাঝে দিয়ে থাকেন। নিয়মিত কিছু নয়। দশ হাজার অ্যাড হক। বছরে একবার দেয়—তবে সব গ্রুপকে প্রতি বছর নয়। নাটকটা এত গুরুত্বহীন ওদের কাছে, এ ব্যাপারে ঠিক কোনো নীতি থাকে না। ঢাকায় দিলে কিছু বাইরের গ্রুপকেও দেয়। আমি লক্ষ করেছি, এটা নির্ভর করে প্রধানত কালচারাল সেক্রেটারি কোন ব্যক্তি তার ওপর।

প্র আপনাদের যে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আছে, সেটা কেমন কাজ করছে?

আতা এটা খুব সক্রিয় হয়েছে এ বছর থেকে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির লোকজন, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, এঁরা যান—বিভিন্ন মফঃস্বলে—ওদেরকে অনুপ্রাণিত করতে, ওদের সমস্যা বুঝতে। যেমন, ওদের একটা সমস্যা

'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের একটি দৃশ্য

হয়—খুব বড় সমস্যা—যদিও এখানে সেন্সরড অনেকগুলি বই রয়েছে, সেন্সর কমিটি রয়েছে—বাংলাদেশে সেন্সর কমিটি শিল্পকলা অ্যাকাডেমি—তা সত্ত্বেও বেশ হয়রানি করে। যেমন, বিভিন্ন জেলাশহরে পুলিশ হয়রানি করে। সেন্সর করা আছে বললেও বলে, এটা মানব না! আমরা কালচারাল সেক্রেটারির মাধ্যমে একটা সার্কুলার আবার ইস্যু করিয়েছি যে, আমাদের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্য অথবা যারা শৌখিন নাটক করে, তাদের ক্ষেত্রে ট্যাক্স প্রযোজ্য নয় এবং পুলিশের কাছে সেন্সরের জন্য দিতে হয় না। এসব তদ্বির করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা যাচ্ছেন।

এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে একটা ওয়ার্কশপ করা হবে। এটা আমাদের কর্মসূচিতে আছে। একটি বুলেটিন নিয়মিত প্রচার করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩টে বেরিয়েছে। মাঝখানে কিছুদিন বাদ গেছে।

এই আন্দোলনটা এখন গড়ে উঠছে, সেন্সরশিপ একেবারে বাতিল করে দাও। যদিও এই শিথিল সেন্সরশিপ সমস্যা সৃষ্টি করছে না—কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন মনে করে যে, এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের হানি ঘটায়। কারণ একটি বই কিনতে গেলে সেন্সরশিপ লাগে না, একটি ছবি আঁকতে গেলে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তবে নাটক করতে গেলে কেন নিয়ন্ত্রণ লাগে? এই নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়েছে। আমরা ৩০ জুন শেষদিন দিয়েছি। এরপর বিনা সেন্সর-এ নাটক করা হবে, যদি সম্পূর্ণ বাতিল না হয়ে যায়।

প্র: আপনাদের দেশে যে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনো সহযোগিতা বা সংযোগ সম্ভব কিনা? আমাদের এখানে ওরকম ফেডারেশন নেই। কিন্তু বেসরকারীভাবে তো কিছু সংগঠন বা পত্রিকা তো আছে। তা আপনাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগের সম্ভাবনা যদি কখনও দেখা দেয়, নিশ্চয়ই আপনারা সাড়া দেবেন?

আতা নিশ্চয়ই, সানন্দে।

প্র আপনাদের যে নাট্যসংস্কৃতি তাতে কোন কোন প্রভাব কাজ করছে? দেশের, বিদেশের?

আতা আঙ্গিকের দিক থেকে?

প্র হ্যাঁ।

আতা দেশের তো করছেই। যাত্রার প্রভাব একেবারেই নেই বলব না। ব্রেশটের প্রভাব পড়েছে—যেহেতু আমরাই প্রথম ব্রেশটকে মঞ্চে এনেছি। এবং খুব সফল হয়েছি। ব্রেশটের প্রভাব এখন অনেক গ্রুপের নাটকে। ন্যারেশনধর্মী।

আলী মানে এমন অনেক মৌলিক নাটক অভিনীত হয় ঢাকার মঞ্চে, যা দেখলে আপনার মনে হবে ব্রেশটের নাটক দেখছি।

আতা ব্রেশট সাংঘাতিকভাবে বাংলাদেশের নাটককে প্রভাবিত করেছে বলে আমার মনে হয়।

প্র পশ্চিমবঙ্গের কিছু?

আতা পশ্চিমবঙ্গের তো করেছেই—

আলী আমাদের গোটা আন্দোলনটাই তো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি খুব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করতে চাই, পশ্চিমবঙ্গের নাটক, এই কলকাতার নাটক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করেছে এই নাটকে আসার ব্যাপারে।

আতা আমার কথা বলতে পারি—'তিন পয়সার পালা' আমি হাঁ হয়ে দেখছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এটা কি ম্যাজিক? ব্রেশটের একটি লেখাতেই পরে দেখলাম It's not magic, it's hard work ওভাবেই প্রভাবিত হয়ে ভেবেছি যে, আমরাও হয়ত এরকম করতে পারি।

কলকাতার নাটকের এই নামগুলি তো আমাদের মাথায় সবসময়ই কাজ করছে—শম্ভু মিত্র, অজিতেশ, উৎপল দত্ত—কথায় কথায় আমরা 'কোট' করি। তারপর অরুণ মুখার্জি, বিভাস...

আলী ওঃ অজিতেশ—ঐ এক বিরাট অভিনেতা। বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে কলকাতার—

প্র পরের প্রযোজনা নিয়ে কিছু ভাবছেন কিনা?

আলী এর পরেই ফিরে গিয়ে 'ওয়েটিং ফর গোডো' নামছে, এ মাসের শেষে। নাম দেওয়া হয়েছে 'গোডোর প্রতীক্ষায়'। কবীর চৌধুরীর অনুবাদ। □

ভিয়েৎনামের চলচ্চিত্র দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি

একেবারে সম্প্রতি ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়ার কলকাতা কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েৎনামের দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় হয়ে গেল একটি সংক্ষিপ্ত ফিল্ম প্রদর্শনীর সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান। দুটি নতুন ভিয়েৎনামী ছবি 'ডেসার্টেড ল্যাণ্ড' ও 'নট এ লোনলি ল্যাণ্ড' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা প্রেক্ষাগৃহে দেখান হল বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির সদস্য ও সেই সূত্রে আমন্ত্রিত বহু দর্শককে। চরিত্রগত বিচারে দুটি ফিল্মেরই বিষয় মুক্তিসংগ্রাম ও মানবিক সম্পর্কের কাহিনী। অধিকাংশ ভিয়েৎনামী সিনেমায় এই দুটি বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন, তার একটি ছোট আলোচনা সেজন্যই খুব প্রাসঙ্গিক।

বিদেশী আগ্রাসন ও শোষণ থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও মুক্তি ঘটে এপ্রিল, ১৯৭৫-এ, এবং সেই সঙ্গেই সম্পূর্ণত স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র ভিয়েৎনাম। কিন্তু ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যবর্তী পনের বছরে নতুন বিপ্লবী ভিয়েৎনাম—মার্কিন বোমার বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই গঠন করে যাচ্ছিল তার নিজস্ব সংগীত শিল্পসাহিত্যের নবজাগ্রত পৃথিবী। ভিয়েৎনামের মৌলিক বিজয় সেখানেই। এবং এই বিজয় বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবিকতারও। সুতরাং ভিয়েৎনামের সিনেমাতেও স্বাভাবিকভাবে গভীর অভিজ্ঞতার প্রভাব ফেলেছে ঐ দীর্ঘস্থায়ী (১৯৪৫ সালে যার আরম্ভ) যুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রাম এবং সর্বোপরি—বিপ্লব।

ষাটের দশক থেকেই বলা যায়, প্রধানত যুদ্ধকাহিনী ও আদর্শবাদী নাটকীয়তার জন্য ভিয়েৎনামী সিনেমা হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ফিল্ম দেখান হয়েছে এশীয় ফিল্ম উৎসব আর চীনদেশে। পরের দিকে ১৯৭৩-এ বিপ্লবকালীন ভিয়েৎনামী ফিল্মের একটি গুচ্ছ প্রদর্শনী কলকাতায় হয়েছিল। মূলত যুদ্ধ সম্পর্কিত দলিলধর্মী ছবি হওয়া সত্ত্বেও প্রকরণগত কলাকৌশল ও আঙ্গিক উৎকর্ষে সেসব ছবির বক্তব্যের বিশদ ও বাস্তব বর্ণনা যেন মর্মমূলে আজও বিঁধে আছে। এই হল ভিয়েৎনামের পূর্বাপর ফিল্মের পটভূমি। জানি না—১৯৫২-তে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ-বিপন্ন-করে-তোলা সেই চলচ্চিত্র-মালাটি আজ দেখতে কেমন লাগত, কেননা ক্যামেরা শত্রুপক্ষের হাতে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ায়, এখন তা আর জানার উপায় নেই।

১৯৭৮-এ (জুন-জুলাই) কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে একটি সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা আরেকটি কাহিনীমূলক ভিয়েৎনামী ফিল্ম 'উই শ্যাল মিট এগেন এ্যাস প্রমিসড়' দেখেছিলাম। সেটিতেও প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে দেখান হয়েছিল—ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের জয়লাভ ঘটলেই, প্রেমও পাবে তার সার্থক উত্তরণ।

কলকাতায় প্রদর্শিত ছবি দুটি ইংরাজিতে সাব-টাইটেল করা। ফলে, বহুদেশেই দেখান হয়েছে। মনে হয়, ভিয়েৎনামের বিশিষ্ট ফিল্ম হিসেবে এ-দুটি চিহ্নিত ও স্বীকৃত।

১

ডেসার্টেড ল্যাণ্ড। হ্যানয়-এ প্রস্তুত। ১০০ মিনিট (সাদাকালো)। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৮২-তে 'স্বর্ণপদক' বিজয়ী।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক কাহিনী। জলায় ভরা গ্রামাঞ্চলে শিশুপুত্র নিয়ে এক দম্পতির বসবাস। গ্রামের সীমান্তে অবস্থিত জলাভূমির ওপর তাদের ঘর থেকে তারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে নানধরনের মোকাবিলায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। গ্রামের অন্যান্য মেয়ে পুরুষকে গেরিলাযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয় তারা, এবং অবশেষে স্বামী (নায়ক) নিহত হয় মার্কিন হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে। স্ত্রী ও তার সঙ্গীরা ফিরতি প্রতিশোধ নেয় হেলিকপ্টারটাকে গুলি করে নামিয়ে। স্বদেশের জন্য প্রাণ দেয় অনেকেই। কিন্তু জয়ী হয় সেই গ্রাম্য গেরিলাবাহিনী। ভূপাতিত হেলিকপ্টারের মৃত পাইলটকেই দুরন্ত প্রতিশোধস্পৃহা বশত স্ত্রী (নায়িকা) আবার গুলি করতে গিয়ে, আবিষ্কার করে, নিহত পাইলটের পকেট থেকে ছড়িয়ে পড়া তার স্ত্রীর ছবিটিও আগুনে পুড়ছে—যা দেখে সে তার বন্দুকের নল নামিয়ে নেয় গভীর মানবিক অনুভূতিতে। সাদাকালোয় তোলা এই ছবিটি হয়ত রঙিন হলে আরো আকর্ষণীয় হত, কিন্তু, তা না হয়েও—শুধুমাত্র সাধারণ ক্যামেরার কাজে, জোরালো বক্তব্যের টানটান চেতনায় ও দলিলধর্মিতায় ছবিটি এক আশ্চর্য সরল মমতা ও কঠিন সৌন্দর্যের উদাহরণ হয়ে থাকল। নায়কের মৃত্যুর প্রায়-পাশাপাশি (পরপর লঙ, মিড্ ও ক্লোজে নেওয়া শটে) দূর মাঠের মধ্যে তৈরি করা লুকনো খাদের ভেতর হাসপাতালে—তারই শিশুপুত্রটির এলোমেলো হামাগুড়ি টেনে ধাপে ধাপে ওঠা, কিংবা গাছের জটলার আড়ালে জলের ওপর অনেক নৌকায় করে গ্রামবাসীদের একসঙ্গে গোপন মিটিঙে আসা—সবই ছবিটিকে এক অনায়াস সুস্থতায় ভরে দিয়েছে। কেবল প্রতিরোধ নয়, যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিরোধের জন্ম দেয়—এ তারই খোলা বৃত্তান্ত।

সোভিয়েত চিত্রকরের তুলিতে ভিয়েৎনামী বীরাঙ্গনা

২

নট এ লোনলি ল্যাণ্ড। হ্যানয়-এ প্রস্তুত। সাদাকালো। পরিচালক গুইয়েনখি লোই। সংগীত হুয়াং হুয়েপ। দিল্লী ও এশীয় উৎসব ১৯৮৩ এবং বহু বিদেশী উৎসবে প্রদর্শিত।

বিপ্লবোত্তর ভিয়েৎনামের

সংগঠনের কাহিনী। কমরেড কং-কে পরিচালক করে পাঠানো হল সমাজতন্ত্রে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী একদল সমাজবিরোধী মানুষ অধ্যুষিত একটি বিক্ষুব্ধ দ্বীপে—গোলমরিচের চাষসংক্রান্ত সংগঠন প্রস্তুতির কাজে। বিদ্রোহী মানুষগুলো কং-এর পৌছনোটাকে আদপেই সুনজরে দেখল না, ভেবে নিল এটা কমিউনিস্ট কার্যক্রমের একটা হৃদয়হীন ষড়যন্ত্র মাত্র। এই অপরাধী ও বেআইনি দলটির নেতৃত্বে ছিল বেপ্ ও ডিং নামে দুটি লোক এবং পতিতাশ্রেণীর এক রমণী—মিস হিউ। তাদের প্রচণ্ড আর সক্রিয় বাধাকে কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নজরে রেখে, মানবিক ভালোবাসা এবং গভীর সহমর্মিতায় কমরেড কং খুবই আস্তে সন্তর্পণে টেনে তুললেন তাদের ঘুমিয়ে থাকা সতেজ চেতনার জগৎটাকে। তিনি তাদের কুৎসিত মানসিকতার নিরাময় ঘটিয়ে পুনর্জন্ম দিলেন নতুন সমাজতন্ত্রের সহজ শিক্ষায় ও শ্রমে। তাদের মধ্যে এই প্রথম এনে দিলেন স্বাধীন শুদ্ধ মানুষের মুক্তির বিশ্বাস—যা ভিয়েৎনামের বিপ্লবে প্রধান অবদান।

ভিন্ন স্বাদের এই ছবিটি কিন্তু এমন বহুবর্ণ (রঙিন না হয়েও) প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের সহাবস্থান একই সঙ্গে দেখাতে পেরেছে যে, পরিচালকের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। যে দক্ষতায় তিনি অতিসাধারণ দৃশ্যপরম্পরার মাধ্যমে ক্যামেরার কাজ করিয়েছেন এবং লাগিয়ে দিয়েছেন যথাযথ সুর ও সংগীতের প্রয়োগ, তা বিস্ময়কর। বিশেষত, যখন ভাবা যায় বিপ্লবপূর্ব দিনগুলিসমেত ভিয়েৎনামের গোটা চলচ্চিত্রেরই বয়স মাত্র তিরিশ ছুঁইছুঁই! বিপ্লবের সাক্ষাৎ কোনো প্রচার-প্রদর্শনীর মধ্যে একেবারেই না গিয়েও, শুধু—সমুদ্র, হাওয়া, বিভিন্ন মুখের ক্লোজ আপ বা একাকিত্ব, টুকরো সংলাপ, জ্যোৎস্না ও বিষাদের মিলিত এবং মাদকতাময় সৌন্দর্য, ক্যামেরাকোণ্-এর আধুনিকতম ব্যবহার এবং সর্বোপরি, বয়স্ক প্রধানচরিত্র কং-এর বিচিত্র গম্ভীর অথচ শিশুর মতো মুখের নির্বাচনে—ছবিটিকে পরিচালক এক উদার দ্বন্দ্বমূলক সার্থকতায় উত্তীর্ণ করেছেন। শেষ দৃশ্যে কমরেড কং-কে বাঁচাতে—মাঠপাথার ডিঙিয়ে আলোছায়ার ভিতর ছুটন্ত ভেসে যাওয়া মিস হিউ-এর ব্যাকুলতা ও তার কোমল রমণীদেহের হিল্লোলের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া ভিয়েৎনামের বিপ্লবকালীন একটি নেপথ্যগান (যা অতি নাটকীয়তা হতে পারত)—এতই যৌক্তিক এক মনোমুগ্ধকর আবহ তৈরি করে, যে তার অনুরণন ফিল্ম শেষ হবার পরও থেকে যায় দর্শকদের ভাবনায়, কোনো মহৎ ভাষ্যের মতো। সম্পাদনার পারদর্শিতা সে কারণেই সর্বত্র লক্ষণীয়।

আমরা ভিয়েৎনামের আরো ছবি দেখার আগ্রহে উৎসুক থাকলাম। ওঁদের সদ্যোজাত এই সবল চলচ্চিত্র যখন সত্যিই যৌবনে পা দেবে, পৃথিবীর চলচ্চিত্রে তখন যুক্ত হবে নতুন রক্তিম এবং অভিনব আরেক মাত্রা। □

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

এ পক্ষে কলকাতায়

২ থেকে ১৭ জুন

২ জুন : রবীন্দ্র সদনে ত্রিবেণী সাংস্কৃতিক সংস্থার নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ'। অ্যাকাডেমিতে পি· এল· টি-র নাটক। শিশির মঞ্চে গান্ধার সাংস্কৃতিক সংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক নাট্যসংস্থার নাটক। বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিট-এর 'বিলকিস বেগম'।

৩ জুন রবীন্দ্র সদনে সকালে রবীন্দ্র সংগীতের আসর এবং সন্ধ্যায় রক্তকরবী সাংস্কৃতিক সংস্থার নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। অ্যাকাডেমিতে বহুরূপী নাট্যসংস্থার নাটক। শিশির মঞ্চে চতুরানন সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠান। মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক নাট্যসংস্থার নাটক।

৪ জুন : রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র সংগীতের আসর। অ্যাকাডেমিতে চার্বাক নাট্যসংস্থার নাটক। শিশির মঞ্চে সূচনা সাংস্কৃতিক সংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে নটসেনা নাট্যসংস্থার নাটক 'বুলবুলি'। বিজন থিয়েটারে মাঙ্গলিক নাট্যসংস্থার নাটক 'তৃণিদান'।

৫ জুন রবীন্দ্র সদনে চেনা-অচেনা নাট্যসংস্থার রবীন্দ্র-নাটক 'মুক্তধারা'। অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ-এর রবীন্দ্র-নাটক। বিজন থিয়েটারে শক্তি সংঘ-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৬ জুন : রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র সংগীতের আসর। অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ওয়ার্কসপ-এর নাটক। শিশির মঞ্চে ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভ অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। মুক্তাঙ্গনে আনন্দ থিয়েটার-এর নাটক। বিজন থিয়েটারে অঙ্কুর অ্যাথেলেটিক ক্লাব-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৭ জুন রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র ভারতী প্রাক্তনিকা আয়োজিত 'বর্ষার গান'। অ্যাকাডেমিতে থিয়েট্রন নাট্যসংস্থার নাটক। শিশির মঞ্চে ইন্দ্র নাট্য নাট্যসংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে নাট্যায়ন নাট্যসংস্থার নাটক।

৮ জুন রবীন্দ্র সদনে মন্মথ দে স্মৃতি পাঠাগার আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার কমিউন-এর নাটক। শিশির মঞ্চে আবৃত্তিলোক-এর আবৃত্তির আসর। মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার ক্যালকাটা-র নাটক।

৯ জুন রবীন্দ্র সদনে দিনহাটা মদন মোহন বারি শিশুসংস্থা আয়োজিত সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান। অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ-এর রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক নাট্যসংস্থার নাটক।

১০ জুন রবীন্দ্র সদনে সারথি সাংস্কৃতিক সংস্থা নিবেদিত সুচিত্রা মিত্র ও শান্তিদেব ঘোষ-এর রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠান। অ্যাকাডেমিতে বহুরূপী-র নাটক। শিশির মঞ্চে প্রয়াস নাট্যসংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক নাট্যসংস্থার নাটক। বিজন থিয়েটারে সকালে অ্যাকটরস ইউনিয়ন-এর নাটক 'কুকুর'।

১১ জুন রবীন্দ্র সদনে পি· এল· টি-র নাটক 'দাঁড়াও পথিকবর'। অ্যাকাডেমিতে শূদ্রক নাট্যসংস্থার নাটক। শিশির মঞ্চে সংস্কৃতি সংগম-এর নাটক। মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার জুডেনিস-এর নাটক।

১২ জুন অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ-এর রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। শিশির মঞ্চে কোরাস সাংস্কৃতিক সংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে একটি দল নাট্যসংস্থার নাটক। বিজন থিয়েটারে পূর্বাভাষ সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠান।

১৩ জুন রবীন্দ্র সদনে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়-এর নাটক 'রক্তকরবী'। অ্যাকাডেমিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ-এর রবীন্দ্র-নাটক। শিশির মঞ্চে ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভ অব ইণ্ডিয়া-র সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। মুক্তাঙ্গনে ক্যালকাটা থিয়েটার-এর নাটক 'অভাব'।

১৪ জুন : রবীন্দ্র সদনে আরাধনা সাংস্কৃতিক সংস্থার নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'। অ্যাকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক। শিশির মঞ্চে বাগেশ্বরী সাংস্কৃতিক সংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে নিউ থিয়েটার গ্রুপ-এর নাটক 'গাব্বু খেলা'।

১৫ জুন রবীন্দ্র সদনে সুর ও ঝঙ্কার সাংস্কৃতিক সংস্থার নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান। অ্যাকাডেমিতে নান্দীমুখ-এর নাটক। শিশির মঞ্চে রঙ্গসভা নাট্যসংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে সায়ক নাট্যসংস্থার নাটক। বিজন থিয়েটারে পঞ্চস্বর সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠান।

১৬ জুন শিশির মঞ্চে সমীক্ষণ সাংস্কৃতিক সংস্থার নাটক। মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক নাট্যসংস্থার নাটক। বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিট-এর নাটক 'বিলকিস বেগম'।

১৭ জুন রবীন্দ্র সদনে সুরলোক সাংস্কৃতিক সংস্থার রবীন্দ্র গীতিআলেখ্য। শিশির মঞ্চে কালচারাল এন্টারপ্রাইজ-এর নাটক। মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক নাট্যসংস্থার নাটক। বিজন থিয়েটারে থিয়েটার ইউনিট-এর নাটক 'বিলকিস বেগম'।

হেমেন ভট্টাচার্য

হেমেন ভট্টাচার্যের বয়েস এখন পঞ্চান্ন। সংস্কৃতে ছাপা বই আর অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য বইয়ের তিনি একটি খনি। ২ নম্বর রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে তাঁর বাড়ি এবং প্রকাশন সংস্থা। প্রকাশনা ভবনের নাম জীবানন্দ বিদ্যাসাগর। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ছিলেন ওঁর প্রপিতামহ। ১৮৪৫ সালে তিনিই সংস্কৃত বই ছাপা এবং বিক্রি শুরু করেন। তিনি নিজেও সংস্কৃত বইয়ের টীকা লিখতেন। তারই ধারাবাহিকতা চলে আসছে আজও। হেমেনবাবুর নেশা দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি আর বাংলা বই সংগ্রহ করা। তাঁর কথায়, 'কলকাতায় সংস্কৃত বইয়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আরও খারাপ হবে। বাজারও মন্দা।' এক সময়ে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশনীর ছাপা বইয়ের সংখ্যা ছিল ২৪৮। তার ভেতর এখন পাওয়া যায় ১২০টা। ওঁদের ছাপা সবচাইতে দামী সংস্কৃত গ্রন্থ 'বাচস্পত্যম'—সংস্কৃত এনসাইক্লোপিডিয়া। দীর্ঘদিন ছাপা না থাকার পর বেনারসে সরকারি টাকায় ছাপা হলো এ বই। বর্তমানে এর দাম দাঁড়িয়েছে তিন হাজার টাকা। 'বাচস্পত্যম'-এর লেখক তারানাথ তর্ক বাচস্পতি ছিলেন হেমেনবাবুর প্রপিতামহর বাবা। তারানাথ তর্ক বাচস্পতি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন। দুষ্প্রাপ্য বহু বইয়ের সংগ্রাহক হেমেনবাবু বিভিন্ন দরকারে প্রয়োজনমতো বই-পত্র দিয়ে সহায়তা করেন অনেককেই।

অর্চনা রায়

অর্চনা রায়-এর জন্ম ১৯৪৬ সালে। পড়াশোনা বেনারসে 'হিসট্রি অব আর্ট' নিয়ে। এম· এ· শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেন। বিষয় ছিল 'হিসট্রি অব প্রিন্টেড টেক্সটাইল'। এম· এ· পাশ করে এলাহাবাদ মিউজিয়মে চাকরি করেন বছর তিনেক। তারপর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল ফাণ্ড-এ তিন বছর। ১৯৭৬ সাল থেকে কলকাতার বিড়লা একাডেমিতে কিউরেটর। ভারতবর্ষে বেসরকারি সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে কলকাতার বিড়লা একাডেমির সংগ্রহশালাটির যথেষ্ট সুনাম। এর সংগ্রহের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলার কাজে অর্চনা রায়-এর পরিশ্রম অনেকটাই। 'তবে একজন মহিলা হিসেবে একাজে আমি চব্বিশ ঘণ্টা মাথা ঘামাই বলে অতিরিক্ত সম্মান দাবি করি না। কিন্তু আমাকে চাকরি, মিউজিয়ামের নিষ্প্রাণ বস্তুগুলিকে দর্শক সমক্ষে সাজিয়ে দিয়েও অনেকটা সময় তো দিতেই হয় স্বামী সন্তান ও পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যক্তিগত সংসারের সংগ্রহশালায়'—হাসতে হাসতেই বলেন অর্চনা রায়। এর পরে আছে' হঠাৎ করে কোন ভালো জিনিসের সন্ধান পেলে দৌড়াদৌড়ি, আগে ভাগে কিনে ফেলার প্রতিযোগিতা। অর্চনা রায় এখন ভাবছেন বিড়লা সংগ্রহশালার কিছু পাবলিকেশনের কাজ নিয়ে। দর্শকদের সঙ্গেও কথা বলার সুবিধে হয় কিছু সংক্ষিপ্ত আকারের বই ধরিয়ে হাতে দিতে পারলে।

নিরঞ্জন গোস্বামী

এদেশে 'মাস্টার' অবস্থায় একবার নাম করলে তার পক্ষে 'মিস্টার' হয়ে ওঠাটা খুব দুরূহ। নিরঞ্জন গোস্বামীর কথাই ধরা যাক। ৭১-৭৮-এ নিরঞ্জন কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের জাতীয় বৃত্তি পেলেন নাটকের ক্ষেত্রে· তরুণ-প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ। পরবর্তীকালে আরও বিস্তৃত হয়েছে ওঁর ক্ষেত্র। নাট্য-অভিনয় থেকে সরে এসেছেন মূকাভিনয়ের জগতে। শম্ভু মিত্র, যোগেশ দত্ত-র কাছে যা শিখেছিলেন, নিজস্ব সৃজনী শক্তিতে তা পাদপ্রদীপের আলোয় হয়ে উঠল উজ্জ্বল। তারই পরিণামে ৮০-৮২-তে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের গবেষণা ফেলোশিপ লাভ। বিষয়টি অভিনব। কুড়িআট্টম, কথাকলি প্রভৃতি ট্র্যাডিশনাল নৃত্যে মূকাভিনয়ের যে ভূমিকা রয়েছে তা আধুনিক মূকাভিনয়ের প্রেক্ষিতে কতটা বর্জনীয়, কতটাই বা গ্রহণযোগ্য। নিরঞ্জন গোস্বামী ইণ্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। মূকাভিনয় শেখানো ছাড়াও ওঁর নজর রয়েছে ভারতীয় দর্শন, নৃত্য, সংগীত ইত্যাদি বিষয়েও। ইউ· জি· সি-র আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে দেশে সমস্ত নাট্য-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সবকটি দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে একক মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়ার দুর্লভ সম্মানও পেয়েছেন উত্তর-ত্রিশের এই যুবক।

বিভূতি ভূষণ রায়

হুগলি জেলার হরাদিত্য গ্রামের বিভূতি রায় ১৯৪৫ সালে পাওয়া রেলের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন গ্রামে। গ্রাম গড়ার কাজে, হরিজন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন হুগলির ঐ অঞ্চলে। এখন একটি স্কুলের শিক্ষক। ছাত্রদরদী এই মানুষটি শুধু আদর্শের জন্য লড়াই করে চলেছেন প্রতিনিয়ত।

শিক্ষকতা ছাড়াও বিভূতিবাবু অনেকগুলি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বেশ কটি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ওঁর ভূমিকা অসামান্য। গ্রামের মানুষের নানা সমস্যায় উনি জড়িয়ে পড়েন। বাড়িতে অসংখ্য নিরক্ষর মানুষের আনাগোনা। কারুর চাষ আটকে গেছে, কারুর চাষের বলদ কেনার ঋণ, কারুর ফুল গাছের রোগ—রোজ এরকম কত না ঝামেলা পোয়াতে হয় বিভূতিবাবুকে।

একটি আম গাছ থেকে চার রকমের আম আর একই লেবু গাছ থেকে একাধিক রকমের লেবু নিজেও ফলিয়েছেন, অন্যদেরও শিখিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সরকারি সড়কের পাশে এ হেন পাগল লোকের পক্ষেই সম্ভব গাছ লাগানো। কত লোকের পড়ো ভিটেতে বিভূতিবাবু বাগান করে দিয়েছেন। এই বাগানের ব্যাপারে বিভূতিবাবু গুরু বলে মানেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দকে যাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি আছে, গোলাপ বিশেষজ্ঞ বলে'। আর বিভূতিবাবুর এহেন জীবনযাত্রার শিক্ষা পেয়েছিলেন ওনার শিক্ষক ক্ষিতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কাছে।

Regd No. R.N.41096/83 □ PRATIKSHAN □ VOL.I.No.21 □ 2 June 1984 □ Rs.3 □ FORTNIGHTLY □ Postal Regd No. WB/CC 404

নামীদামী নাটকের কথাগুলিকে প্রাণ দেওয়া ...
আহা সে তৃপ্তির তুলনা কই ?

Nº10
FILTER

যে স্বাদ দিন রাত মন ভরায়

Nº10 FILTER
Nº10 FILTER CIGARETTES
STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
MADE IN INDIA

OBM 8980B/1 NTF BEN

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ। সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH